মিঠুকে বাবা

অসময়

মোহিনী

কাল সকালের গাড়িতে সুহাস চলে যাবে। এসেছিল গত বুধবার। বাবার বার্ষিক গিয়েছে বৃহস্পতিতে। দেখতে-দেখতে পাঁচটা দিন কেটে গেল। সুহাস চলে গেলে এ-পুরীতে আমরা আবার সেই তিনটি মানুষ : জ্যাঠামশাই, আমি আর আয়না। সুহাস আমায় আড়ালে আজ বলছিল, 'এই ভূতের বাড়িতে তোরা আর কতদিন থাকবি, এবার তালা ঝুলিয়ে কলকাতায় চলে আয়।'

তালা ঝোলাবো বললেই ঝোলানো যায় না। এই বাড়ি আমাদের তিন পুরুষের। আমার ঠাকুরদা মহেশচন্দ্র মিত্র ছিলেন রেলের সেকেলে ডাক্তার। কলকাতার ক্যামবেল স্কুলের পাস করা ছেলে। দাদুর যে দুটো ছবি এ বাড়িতে আছে, তার একটা আমরা রোদে বের করে এককালে দেখতাম। সেটা দাদুর যৌবন বয়সের ছবি। অ্যালবার্ট করা চুল পুরু গোঁফ আর পকেট ঘড়ি ছাড়া সেই ছবিতে দাদুর আর কিছু তেমন চোখে পড়ত না। ছবিটা এতদিনে সাদা হয়ে গেছে, দেওয়াল থেকে নামিয়ে আর আমরা দেখি না। বাবার কাছে গল্প শুনেছি, এদিকে রেল লাইন পাতার সময় দাদুকে খোলা মালগাড়ির মাথায় তেরপল টাঙিয়ে বসে কুলী-লাইনের ডাক্তারী করতে হত। জ্যাঠামশাই নিজের বাবার কথা উঠলে গল্প করে বলেন, 'বাবার গোঁফজোড়ার মতন প্রেসক্রিপসান লেখার চেহারাটাও ছিল জাঁদরেল, অল্পেস্বল্পে কুলোতো না। সেই ওষুধে জ্বরজ্বালা পিলেপিত্ত সব শুধরে যেত।' রেলের সাহেবসুবোরা দাদুকে খাতির করত খুব; পরে ডি এম ও করেছিল।

সেই দাদুর হাতে এ-বাড়ির ভিত। মানুষটির চরিত্র আমাদের এই বাড়ি দেখলেই খানিকটা বোঝা যায়। সংসারের ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর হিসেব করে এ-বাড়ি তিনি তৈরী করেন নি। প্রয়োজনের অনেক বেশী ভবিষ্যতের একটা বড় ছবি মনে রেখে এই পুরী তিনি গড়ে তুলেছিলেন। ঘরগুলো হয়েছিল হাওদাখানার মতন, জানলাগুলো মানুষ-সমান, বারান্দা দিয়ে ঘোড়া ছুটতে পারত। দাদু যেন তাঁর ছেলেমেয়েদের দুতিন পুরুষের বাড়-বাড়ন্ত সংসারের কথা ভেবে বাড়িটা করেছিলেন। অথচ সেরকম লতায়পাতায় এ-সংসার বেড়ে ওঠে নি। জ্যাঠামশাই নিঃসন্তান থেকে গেলেন। জ্যাঠাইমা মারা গেল মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে। আমাদের তরফে আমরা তিনটি ভাইবোন : সুহাস, আমি আর আয়না।

দাদু মারা যাবার পরে এ-বাড়ির রদবদল বিশেষ কিছু হয় নি। পরে

আস্তে আস্তে বাড়িটা ফাঁকা হয়ে আসতে লাগল : জ্যাঠাইমা মারা গেল, মা চলে গেল, বাবাও আজ নেই, সুহাস কবে থেকে কলকাতায়। বাড়িটা যতই ফাঁকা হয়ে আসতে লাগল ততই তার ঘরের দরজা বন্ধ হতে লাগল। এখন আমরা মাত্র তিনজন : জ্যাঠামশাই, আমি আর আয়না।

তবু সুহাস যা বলছে তা হয় না; এ-বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে চলে যাওয়া যায় না। বাবা নেই, কিন্তু জ্যাঠামশাই আছেন। উনি বর্তমান থাকতে এখানকার পাট চুকোবার কথাই ওঠে না। আমারও কলকাতা যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। কলকাতার আশে-পাশে সেই মানুষটা জ্বলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে—এই ভয়ে আমি যাচ্ছি না, এটা সত্যি নয়। হোমের আগুন রাঙা চেলী, মালাবদল এ-সব আমি ভুলে গেছি। আমায় নিয়ে কয়েকটা মাস যে-রকম পুতুল খেলা হয়েছিল তেমন খেলা আমাদের বাঙালী সংসারে অনেক মেয়েরই ভাগ্যে ঘটে। বেশির ভাগই সে-খেলায় নিজেকে মানিয়ে নেয়। আমি নিই নি।

কলকাতায় যাবার মধ্যে আয়না। সে মাঝে-মাঝে কলকাতায় যাবার কথা বলে। তার অল্প বয়সের মন, এখানকার একঘেয়েমি থেকে দু-দণ্ড ছাড়া পাবার ইচ্ছে তার হতেই পারে। শহরের হই-চইয়ের মধ্যে সে কতটা মানাতে পারবে তা আমি জানি না।

এবারে বাড়ি এসে সুহাস একটি ছেলের কথা বলল; আয়নার সঙ্গে বেশ মানাবে। ছেলেটি আমাদের স্বজাতি। কলকাতায় নিজেদের বাড়ি, মাথার ওপর মা আর দাদা। চাকরি-বাকরি ভালই করে; আরও উন্নতি রয়েছে সামনে।

জ্যাঠামশাই সুহাসের কাছ থেকে ঠিকানাটা চেয়ে নিলেন; চিঠি লিখবে ছেলের বাড়িতে।

আমি সুহাসকে বলেছিলাম, "তুই এবার ছেলেটাকে নিয়ে এলি না কে বেড়াতে, দেখতাম। আয়নাও দেখত।"

সুহাস বলল, "অত ভাবি নি। কথাটা জ্যাঠামশাই পাড়ুক, পরে একব নিয়ে আসব।" বলে সামান্য থেমে হাসিমুখে আবার বলল, "পাত্র হিসে নয়, বন্ধু হিসেবে এবার যাকে এনেছি সে কেমন রে, দিদি?"

চট করে জবাব দিতে পারলাম না। পরে বললাম, "বড্ড বেয়াড়া।"

সুহাস হাসতে লাগল।

বাড়ি আসার সময় দু-একজন বন্ধু-বান্ধবকে জুটিয়ে আনা সুহা স্বভাব! কাউকে জল-বাতাসের কথা শুনিয়ে, কাউকে শিকারের লোভ দেখি কাউকে আবার গরম জলের কুণ্ড দেখাবার নাম করে টেনে আনে। আস ছেলেটা কলকাতার হই-হট্টগোলের মধ্যে থেকে থেকে এখানকার চুপচ নিঃঝুম বাড়িতে থাকতে পারে না।

এবারেও আসার সময় সুহাস তার এক বন্ধুকে জুটিয়ে এনেছে। ব সে সুহাসের চেয়ে দু-এক বছরের বড়ই হবে, নাম অবন্তী, ছোট করে ব অবিন। চেহারার মতন ছেলেটির কথাবার্তাও কাটাকাটা। প্রথমদিন আমি ব

রের ছেলেকে পড়াচ্ছে আর রোজ রুটি ঘি খাচ্ছে। শুয়ে বসে অরুচি ধরে গেল যখন, তখন জঙ্গলে গিয়ে জীবজন্তুর চামড়া ছাড়াতে বসল। মানে একটা সেরকম মোনাস্টিক নেশা নিয়ে পড়ল। তাতে বোধ হয় জুত হচ্ছিল না, তার ওপর একদিন ওর চামড়ার মজুতে আগুন লেগে গেল, খাপরার বাড়ি পুড়ল, অবিন সেই ছাই মেখে বাবা ভোলানাথ হয়ে ঘুরেফিরে কাটাল কিছুদিন। হঠাৎ একদিন আবার কলকাতায় এসে হাজির। এসে বলল, শুনলাম আমার বাবা মারা গেছে—চলো গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি। আশ্চর্য ছেলে। আমরা ওকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে চুবিয়ে আনলুম ন্যাড়া মাথা করে।"

আমি শুধোলাম, "অদ্ভুত হয় হলো! কিন্তু ওর ঘরবাড়ি কোথায়? সংসারে কে কে আছে?"

সুহাস বলল, "সে তুমি ওকে জিজ্ঞেস করো। পুরোপুরি আমরা কিছুই জানি না। আদি বাড়ি শুনেছি সিলেট-টিলেট। ওর বাবা সরকারী চাকরিতে পেনসন পেতেন বলে শুনেছি, তাতে মনে হয় কাজ-টাজ বড় গোছেরই করতেন। ওর মা পদ্য লিখতেন মাসিক কাগজে; আর এক মামা সবরমতী আশ্রমে গিয়ে ঢুকেছিল। কলকাতায় ও হোস্টেলে থাকত, কোনো আত্মীয়স্বজনকে আমরা দেখি নি।"

সামান্য চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এখন ওই পাগল কী করে?"

[illegible] একটা [illegible] সুহাস বলল, "আমরা ধরেকয়ে একটা চাকরি [illegible] দিয়েছি [illegible]। সেখানে ওর গেলেও হয়, না গেলেও চলে। ওকে ভেসে।"

আরও কত কী জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হল। শেষে বললাম, "তোর পুরনো বন্ধু বলছিস, কিন্তু তোর মুখে ওর কথা আগে কই শুনি নি! এত বন্ধু তোর এল গেল এ [illegible] ওকে আনিস নি তো?"

সুহাস হেসে বলল, "অবিন থাকল কোথায় যে আনব! ওর কথা একেবারে শোনো নি এমন নয়, শুনেছ নিশ্চয়, ভুলে গেছ। এবারও কী আমি অবিনকে এনেছি? ও নিজেই এল। আসার আগের দিন দেখা, আমি বাড়ি আসছি শুনে বলল, চলো আমিও ঘুরে আসি, একটু বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে। ও বলছি দিদি, হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে আমি ওকে আশাই করি নি, কোথাও যাব বলে আমাদের বসিয়ে রেখে ও শেষ পর্যন্ত আসে না। এবার দেখলাম ও সত্যিই এসেছে।"

বাইরে বৈশাখের আগুন জ্বলছিল। মাথার ওপর সূর্যটা যে ফেটে পড়ছে ঘরের মধ্যে বসেও তা অনুভব করা যাচ্ছিল। গরমে আমার কপালটা জ্বালা করছিল। হাতপাখার বাতাস আর ভাল লাগছিল না।

সুহাস হাই তুলল। হাত বড় করে। বলল, "অবিন কী বলে না-বলে তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। ওর কথা ওকেই মানায়।...তবে ছেলেটা চমৎকার

কোথাও মেকী জিনিস নেই।”

সুহাস চলে গেল। তার হাই ওঠার বহর দেখে বুঝছিলাম, ঘুম পাচ্ছে ওর।

দুপুরে গা গড়িয়ে নেওয়া আমার বরাবরের অভ্যেস। আজ আর ঘুম পাচ্ছিল না। গরমটা বড় বেশী করে যেন গায়ে জড়িয়ে ধরেছে। দুপুরের হলকা আর লুয়ের ভয়ে জানলা খোলা যায় না এখন। অথচ ঘরের বাতাস গুমট হয়ে উঠেছে। আজও কি আবার কালবৈশাখী উঠবে?

কালকের ঝড়ে আমার ঘরের সামনে জামগাছের মস্ত একটা ডাল ভেঙে পড়ায় রোদ যেন সরাসরি ওদিকের জানলায় এসে লাগছে। নয়ত এমন অস্বস্তি হবে কেন?

আরও খানিকটা দুপুর কাটলে জানলার পাট খুলে দিলাম। গরম বাতাস বয়ে গেল, তবু মনে হল, গুমটের চেয়ে এটা ভাল। জামগাছের ভাঙা ডাল সামনে পড়ে আছে, পাতাগুলো এখনও সবুজ, পাতার তলা দিয়ে কাঠবেড়ালী ছুটে বেড়াচ্ছে। ওপাশে খাঁ-খাঁ মাঠ, ঘাসের ডগা শুকিয়ে খড়ের রঙ ধরেছে, রোদ যেন মাঠঘাটের বুক নিঙড়ে নিয়েছে, তৃষ্ণায় জিব বের করে শ্বাস টানার মতন দেখাচ্ছিল। এদিকে চিতা জ্বললেও গাছের কোন ছায়ায় বসে কোকিলটা ডাকছে, সারা দুপুর ভরে সে ডেকেই যাচ্ছে।

সন্ধ্যের মুখে আমি বাগানে ছিলাম। জ্যাঠামশাই এইমাত্র বারান্দায় উঠে গেলেন। বাতাস এখন ঠান্ডা হয়ে এসেছে, এখানে এই রকমই হয়, যত রাত বাড়বে বাতাস ঠান্ডা হয়ে এসে মাঝরাত থেকে গায়ে সিরসিরে ভাব ধরাবে। আকাশ খুব পরিষ্কার, পূর্ণ চাঁদ উঠে আছে। বাগানে বেলঝাড়ের মধ্যে সিমেন্টের বাঁধানো গোল চাতালে আমি বসেছিলাম, দেখি অবিনরা বেড়িয়ে ফিরছে। ফটক খুলে সুহাস আর অবিন ভেতরে এল। বাগান দিয়ে যেতে যেতে আমায় দেখতে পেয়ে অবিনরা আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

চাতাল থেকে আমি উঠে দাঁড়ালাম। সুহাসকে জিজ্ঞেস করলাম, “কোথায় গিয়েছিলি বেড়াতে?”

সুহাস তার পায়ের দিকটা দেখিয়ে বলল, “নদীর দিকে। রাস্তায় আর হাঁটা যায় না রে এখানে, যা কাঁকর আর ধুলো, আমার পা জ্বালা করছে।”

পায়ের জ্বালা জুড়োতে সুহাস চলে গেল; এখন গিয়ে আবার স্নান করবে।

অবিন আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। একবার দেখলাম পিঠ নুইয়ে বেল-ঝাড়ের মাথায় নাক ঠেকিয়ে গন্ধ নিল। তারপর দেখি কয়েকটা ফুল ছিঁড়েছে।

ওর হাতের মুঠোয় ফুল দেখে আমার সারা শরীর শিউরে উঠল। ও যে কী করবে আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। তারপর বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে উঠল। মুখ উঠিয়ে দেখি, আকাশ জুড়ে জ্যোৎস্না ধারা বইছে। মনে হল, অত জ্যোৎস্নার আড়াল থেকে কে যেন আমায় দেখছে

কপালে আমার কোন্ সৎকর্মের ফল ছিল জানি না, সে-যাত্রায় রক্ষা পেলাম। আয়না এসে আমায় বাঁচাল। ও গিয়েছিল কনকমাসিমার বাড়ি, ফিরে এল। সঙ্গে তপু। ফটকের এপারে দাঁড়িয়ে দুজনে তখনও কথা বলছিল, আয়না হঠাৎ হেসে লুটিয়ে পড়ল, তপু যেন সেই হাসিটাকে ভেঙচে গলা মোটা করে হোহো শব্দ করল খানিক, তারপর ফটক থেকেই চলে গেল বাড়ির মধ্যে আর এল না।

আয়না নিজের মনেই হাসতে হাসতে ফিরছিল, আমাদের দেখতে পেয়েছে। এমন ধবধবে জ্যোৎস্নায় লুকোনো কিছু নজর এড়ানোর কথা নয়। বাড়ির দিকে আর এগুলো না আয়না, এখানে এল।

বুকের মধ্যে সেই দুরুদুরু ভাবটা কমে আসছিল। মনে-মনে বললাম : তুই আমায় বাঁচালি, আয়না।

আয়না কাছে এসে দাঁড়াতে তার হাসিভরা মুখ দেখতে দেখতে বললাম, "হল কী তোর, অমন করে হাসছিলি?"

হাসতে হাসতেই আয়না বলল, "তপুটা কী পাজী দিদি, আস্ত বাঁদর। ওর চাকরির ইণ্টারভিউয়ের গল্প বলছিল। ওকে নাকি ওরা জিজ্ঞেস করেছিল. তুমি যেসব ভাল বই পড়েছ তার দু চারটের নাম বলো। ও কী বলেছে জানিস?"

"কী?"

আয়না আর বলতে পারে না, হেসে মরে। শেষে কোনোরকমে বলল, "ও বলেছে প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্ট বুক আর যোগীন সরকারের হাসিখুশী।" বলে খিলখিল করে হেসে উঠল।

অখিলও দেখি গলা ছেড়ে হেসে উঠেছে। যেমন গলা, তেমন হাসি। মেঠো বাঁশির মোটা সুর যেন। মনে হল, বুকখানা ফেটে যায়। ওদের হাসি আমাকেও হাসাল।

হাসি থামলে অখিল বলল, "এ-ছেলের বুকে সোনার মেডেল ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত।"

আমি বললাম, "এইসব বাঁদরামি করলে আর ওর চাকরি হয়েছে।"

অখিল বলল, "চাকরির জন্যে তোষামোদটা যদি চলে বাঁদরামিটাও অচল [illegible] নেই।"

ওর কথায় আমি কান দিলাম না। আয়নার দিকে তাকিয়ে শুধোলাম, "কনক-মাসিমার পুজো [illegible]?"

আয়না বলল, "হচ্ছে। পুরুতমশাই আসতে বড্ড দেরি করেছেন। শেষ হতে রাত হবে।"

আমার আর ভয় করছিল না। সব আবার স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। যে-জ্যোৎস্না আমার কাছে হঠাৎ এক আতঙ্কের ঝাপটা এনেছিল, যে-বেলঝাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমার কিরণধারায় আমি বড় একা হয়ে গিয়েছিলাম, সে সবই আছে, অথচ তাদের মোহ কেটে গেছে। চোখে বুঝি আচমকা কোনো ঘোর লেগেছিল, মিলিয়ে গেছে। আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখলাম, কেউ আমায় দেখছে না।

বাগানে আর দাঁড়িয়ে থাকার দরকার ছিল না। আয়নাকে ডেকে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

ঘরে এসে মনে হল, আমি বড় ছেলেমানুষি করেছি। ওই যে বাগানে দাঁড়িয়ে অমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, ওর কোনো কারণ ছিল না। লোকে শুনলে হেসে মরবে। মেয়েদের যেটা ভয়ের বয়েস সে বয়েস আর কী আমার আছে! আজ আমার বয়েস হল ছত্রিশ। এই চৈত্রে পঁয়ত্রিশ শেষ করেছি। ছত্রিশ বছরের মেয়ে—আমাদের এই বাঙালী সংসারে একরকম বুড়ি। অথচ কাণ্ডখানা যা হচ্ছিল তাতে আমার এগুনো বয়েস যেন পিছিয়ে পড়েছিল। অবিন বাগানে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, দুটো ফুল ছিঁড়ে মুঠোয় নিল, আর আমি ভয়ে তটস্থ হয়ে পড়লাম—এ যেন নিজেরই মনের বেহায়াপনা। অবিনকে ভয় পাবার আমার কী ছিল? সে বাঘ-ভাল্লুক নয়, দৈত্য-দানব নয়, মানুষ; সুহাসের বন্ধু। মানুষ দেখে এমন ভয় আমার কেন হল? এ আমার পুরনো গা ছমছম ভাব নয়, তারও বেশী কিছু। কই এমন ভয় তো আগে আমার হয় নি। সুহাসের অন্য বন্ধুদের সঙ্গে বাগানে বসে কত গল্প করেছি, কমলেশের সঙ্গে ছাতে শতরঞ্জি পেতে সংসারের কত সুখদুঃখের কথা হয়েছে —আমার মনের মধ্যে কখনো কোনো অস্বস্তি হতে দেখি নি। আজ আমি শিউরে উঠলাম, বুকের মধ্যে রক্ত যেন ছলাৎ করে উঠল, হাত-পার ডগায় কাঁপুনি ছুটে এসেছিল। কেন? আয়না এসে পড়ায় আমি এমন এক স্বস্তি পেলাম যেন মধুসূদন এসে দ্রৌপদীকে লজ্জা থেকে বাঁচাল। ভাবতেও এখন হেসে মরছি।

অবিনকে আমার বিশ্বাসই হয় নি বলেই কি এত? তার আচার-আচরণ কাণ্ড-কারখানা বেয়াড়া বলেই কি অত ভয়? আমার কি ভয় হয়েছিল, অবিন তার মুঠোর ফুল আমার খোঁপায় পরিয়ে দিতে হাত বাড়াবে? নাকি সে আমার কাঁপা হাতের মুঠোয় ফুলগুলো গুঁজে দিয়ে কিছু বলে বসবে? তার ওই কথাটা আমি ভুলতে পারছি না: 'আপনার নামটা পুরনো কিন্তু মিথ্যে নয়।'

অবিন কিন্তু কিছুই করে নি। সে যেমন ছেলে তাতে আয়নার সামনেও আমার মাথার খোঁপায় দুটো ফুল গুঁজে দিতে পারত। আমি লজ্জায় মরে যেতাম তাহলে। ভাগ্যিস অবিন তেমন কিছু করে নি।

সংসারের কাজকর্ম দেখে আবার ঘরে আসতে আয়না এসে বলল, "দাদা ডাকছে।"

"সুহাস কোথায়?"

"দক্ষিণের বারান্দায় বসে আছে ওরা।"

ওরা—, মানে অবিনও রয়েছে; শুনে মনে হল বলি : বল, আমার একটু কাজ রয়েছে পরে আসব। কথাটা বলা হল না।

"ওদের সরবৎ দিয়েছিস?"

"দিয়েছি।" আয়না মাথা হেলালো।

"তুই যা, আমি আসছি।"

আয়না চলে গেল, আমি ঘরের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম একটু, তারপর বিছানায় গিয়ে বসলাম। জানলা দিয়ে বাতাস আসছে, আমপাতার গন্ধ মেশানো। আমাদের আমবাগানে মুকুল ধরলে আমি ছেলেবেলায় তার তলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। এখনও আমার নাকে আমপাতার গন্ধটা ধরা পড়ে। ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্না আসে নি এখনও, মাঝরাতে জামগাছের আড়াল টপকে ঠিক চলে আসবে। একটা জানলা এখন তো একেবারে খোলামেলা, কী জানি তাই বোধ হয় আভা রয়েছে ঘরে, হালকা আলো আলো লাগছিল।

কয়েক দণ্ড বসে থেকে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। আমার সাধের বাতিটা কাল ঝড়ে ভেঙে যাবার পর আজ বাবার ঘরের বাতিটা এনে জেবলে দিয়েছি। নরম করে সেটা জবলছিল। আয়না বোধ হয় তার এস্রাজটা কোলে টেনে বাজাতে বসল। জ্যাঠামশাই এই বুড়ো বয়সেও আয়নাকে ডেকে এস্রাজ শুনতে বসেন। তাঁর হাতেই শিক্ষা আয়নার। আমি শিখতে গিয়েও পারি নি, আঙুলের ডগা কেটে যেত।

বাতির শিস আরও একটু কমিয়ে দিয়ে সুহাসের কাছে যাব ভাবলাম। কমাতে এসে দেখি বাড়িয়ে দিয়েছি। ও আমার হাতের ভুল, অনভ্যাসে হয়েছে. বাতিটায় কতকাল আমার হাত পড়ে নি। আচমকা তাপে মুখে-কপালে তাত লাগল।

শিস কমিয়ে মুখটা আঁচলে মুছতে গিয়ে কী যে খেয়াল হল, কাঠের আলমারির আয়নায় নিজেকে দেখলাম। মস্ত আয়না। আমার চোখমুখ মাথা দেখা যাচ্ছিল, পা পর্যন্ত; সর্বাঙ্গ। সেই আয়না আমাকে কী-যেন দেখাল। অবিনের কথাটা আবার দেখি কানের কাছে বেজে উঠল। ছিছি। ছেলেটা আমার মাথা খারাপ করল নাকি! লজ্জায় মরি।

সুহাসরা বসে ছিল। বেতের চেয়ারে আমি বসলাম।

সুহাস বলল, "দিদি, কাল খুব ভোরে তোকে একটা কাজ করতে হবে।"

"কাজটা কী?"

"খানকয়েক শুকনো রুটি আর গুড় একটা ন্যাকড়ায় বেঁধে অবিনকে দিয়ে

দিবি। বাড়িতে ফ্লাস্ক থাকলে চা দিতে পারিস, না হয় এক লোটা জল। কার্তিকের সাইকেল নিয়ে অবিনবাবু যাবে জঙ্গলে বেড়াতে।"

অবিনের দিকে আমি তাকালাম। ঘরে এসে স্নান করেছে, পরনে পাজামা, গায়ে বুক খোলা পাতলা জামা, গায়ে গেঞ্জি নেই, জামার বুকটা খোলা রয়েছে, হয়ত বোতাম নেই।

অবিন বলল, "আমি খুব ভোরে বেরুবো; কাক ডাকার আগেই হয়ত ডাকব।"

সুহাসের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, "তুই যাবি না?"

"পাগল! আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই...।"

"এই বোশেখ মাসের কাঠফাটা রোদে জঙ্গলে কেন?" সুহাসের দিকে চোখ রেখেই আমি শুধোলাম, যেন সুহাসই তার জবাব দেবে।

সুহাসই জবাব দিল, বলল, "জঙ্গলের সঙ্গে অবিনের সম্পর্কটা বোধ হয় নাড়ির। কী বলো, অবিন?" সুহাস তার বন্ধুকে ঠাট্টা করল; একটু থেমে বলল, "এখনও খানিকটা কাঁচা থেকে গেছে।"

অবিন বলল, "তোমাদের নাড়ি বড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছে।"

"তাতে কোনো ক্ষতি তো দেখছি না।"

"দেখতে চাইছ না। দেখলে বুঝতে পারতে, তোমরা মরছ।"

সুহাস হেসে উঠল। বলল, "অবিন, তুমি যদি আর-একটু সভ্য হতে তোমার ওই কাঁচা নাড়ির গন্ধটা তোমারই বরদাস্ত হত না।"

আমি ভাবলাম, এবার না অবিন দপ করে রেগে যায়। সুহাস যেন কী! তার কথা বলার কোনো মাপজোপ নেই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে যা বলল তাতে অবিন হয়ে দাঁড়াল জংলী, অসভ্য। এমন করে বলতে নেই, ছিছি।

অবিন কিন্তু রাগ করল না। মনে হল, ওদের বন্ধুতে বন্ধুতে এই রকমই হয়, কেউ বোধহয় গালমন্দটা কানে তোলে না। অবিন হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরালো। তারপর বলল, "মানুষকে সভ্য করার জন্যে তোমরা আদা-জল খেয়ে লেগেছ তো অনেককাল। তোমার কি মনে হয় সুহাস তাতে বিশেষ কোনো উপকার হয়েছে?"

"হয় নি?"

"আমার নাড়ি কাঁচা, তোমাদের শুকনো নাড়ি, তোমরাই বলো।"

সুহাস তার বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক, তারপর হতাশ হবার ভঙ্গি করে বলল, "তোমার সঙ্গে কথার লড়াই আমরা অনেক লড়েছি, অবিন। সেই পুরনো লড়াই আর লড়তে চাই না। তুমি গণ্ডারের মতন খড়্গ কপালে নিয়ে বসে আছ, তোমার নজরের দোষ রয়েছে। নিজের জেদ তুমি ছাড়বে না। মানুষের সভ্যতাটাকে তুমি যদি ধোপার বাড়ির কাচা কাপড়ের বেশী মনে না করো, কার সাধ্য তোমায় কিছু বোঝায়। আমায় মাপ করো ভাই, আমি গলা ফাটিয়ে তর্ক করতে পারব না।"

অবিন এক মুখ ধোঁয়া জল খাওয়ার মতন করে ঢোঁক গিলে খেয়ে ফেলল। তার মুখে সরল হাসি, চোখের মণি ভেজা-ভেজা তারার মতন, যেন স্নানের ভেজা ভাবটা এখনও মুখেচোখে মাখানো রয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে অবিন বলল, "সুহাসকে দেখে আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, ও এই সংসারে নির্ঝঞ্ঝাটে সওদা করতে এসেছে, দরদস্তুর ওর স্বভাবে সয় না, বাবু লোক ফিক্সড প্রাইস-এর দোকানে ঢুকে যা খুশি কিনে নিয়ে চলে যাবে।"

সুহাস হেসে বলল, "তাতে আমার কষ্ট বাঁচছে। তোমার মতন মুরগিহাটায় ছুটতে আমি রাজী নই।"

ওদের কথা যেন পাথর ঠুকে চকমকি জ্বালানো। আমার ভাল লাগছিল না। সুহাসকে বললাম, "জঙ্গলে বেড়াতে যেতে হলে সকালটা কি ভাল? বেলায় রোদ তেতে উঠবে। তা তুই লাটুকে বলে রাখলে পারতিস, তার টাঙা নিয়ে আসতে পারত।"

সুহাস হেসে বলল, "লাটুর টাঙার চেহারা দেখে অবিন বোধ হয় ঘাবড়ে গেছে।"

আমি বললাম, "কেন?" বলে অবিনের দিকে তাকালাম।

অবিন বলল, "ঘোড়াটাকে দেখে আমার মনে হল, বেচারী জাত খুইয়ে গাধা হয়ে গিয়েছে।" বলে আড় চোখে সুহাসের দিকে তাকাল, একটু বোধ হয় খোঁচা মারল বন্ধুকে, তারপর বলল, "ওর পিঠে আর মানুষ চাপে না; দেখলাম, যত গমের বস্তা, ছোলার বস্তা বয়ে বেড়াচ্ছে।"

লাটুর টাঙা যে মহাজন আর ব্যাপারীদের মালপত্র বয়ে বেড়ায়, বেড়াচ্ছে আজকাল, সেটা মিথ্যে নয়। এখানে টাঙা চড়ার লোক কোথায়, মানুষজন পায়ে হেঁটে ঘোরে, কাজের লোক সাইকেল চড়ে; দূরে যেতে হলে বাস। ইদানীং মতিলালের একটা জিপগাড়ি ভাড়া খাটতে শুরু করেছে।

অবিন নিজের থেকেই বলল, "বনে জঙ্গলে হাঁটাচলার অভ্যেস আমার খানিকটা আছে; দেখেছি সাইকেলটাই ভাল।"

বলার আর কিছু ছিল না; আমি চুপ করে থাকলাম।

সুহাস হঠাৎ হেসে বলল, "অবিন, দিদিকে তোমার ট্যানারীর বিজনেসের কথাটা বলেছি, শুনে দিদির কেমন ইমপ্রেসান হয়েছে একটু জেনে নাও না।"

হুট করে এমন একটা কথা বলল সুহাস যে আমি একেবারে অপ্রস্তুত। কী যে কাণ্ড করে ও! ভাইকে ছোট করে ধমক দিয়ে বললাম, "যাঃ, যত ফাজলামি তোর।"

অবিনকে আমি দেখছিলাম না; কিন্তু বুঝতে পারলাম, সে আমায় দেখছে। আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল।

অবিন কেমন এক মুখ করে বলল, "দেখুন, চামড়ার ব্যবসার সঙ্গে কসাই-খানার কোনো সম্পর্ক নেই। সুহাস যদি আমায় কসাই বানিয়ে থাকে তবে তার নামে মানহানির মামলা আনতে পারি।"

তাড়াতাড়ি আমি বললাম, "না না, সেসব কিছু নয়।"

"বাঁচলাম।...আমি যে দেশলাইয়ের কুটির শিল্প করতে গিয়েছিলাম—ও নিশ্চয় সেটা আপনাকে বলে নি।"

"বলেছি, অবিন বলেছি। চামড়া আর তোমার স্বদেশী দেশলাই মিলেই তো অগ্নিকাণ্ড ঘটল। জগতে এমন ঘটনা আর ক'টা ঘটেছে!" সুহাস গলা ছেড়ে হেসে উঠল। অবিনও হাসল।

আঁচলের ডগায় হাসি মুছে এবার আমি উঠে দাঁড়ালাম।

ঘরে আসতে আসতে শুনলাম, আয়না মন দিয়ে এস্রাজ বাজাচ্ছে। এত মন সচরাচর মেয়ের হয় না। বোধ হয় ওর ঘরে জ্যাঠামশাই এসে বসেছেন। তাঁর সামনে আয়না এলোমেলো করে বাজাতে সাহস করে না। ঠিক যে কী সুর বাজাচ্ছিল আয়না আমি বুঝতে পারলাম না, মনে হল বেহাগের সুর বাজছে।

নিজের ঘরে এসে দেখি মন আমার বেশ হালকা হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ আগেও মনের কোথাও করকর করছিল, সেটা আর তুলে ফেলতে পারছিলাম না। এখন দেখি সেটা নেই। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেয়ে দুটো এলাচদানা মুখে দিলাম। রান্নাঘরে যাওয়া দরকার একবার। জ্যাঠামশাইয়ের জন্যে ছানার ডালনা হচ্ছে। কমলাদিকে বলেছি, ছানার ডালনায় মিষ্টি একটু বেশী দিও। জ্যাঠামশাই নিরামিষ খান। তা আজ দশ বারো বছর হতে চলল। বাবাও শেষের দিকে নিরামিষের ভক্ত হয়ে পড়েছিল। দুই ভাই এক সঙ্গে খেতে বসে রান্নার গল্প উঠলে, জ্যাঠামশাই করতেন মার সুখ্যাতি; আর বাবা তার বউমণির। বাবা কোনোদিন জ্যাঠামশাইকে বউদি বলে ডাকে নি; বরাবর বলত বউমণি। জ্যাঠাইমার নাম ছিল মণি। বাবার চেয়ে বয়সে বেশ ছোট, অন্তত বছর সাতেকের। গল্প শুনেছি, জ্যাঠাইমা এ-বাড়িতে বউ হয়ে আসার পর বাবা সকলকে লুকিয়ে বিজয়ার দিনে জ্যাঠাইমাকে বুনো সিদ্ধির সরবৎ খাইয়ে দিয়েছিল। জ্যাঠাইমার তাতে যাই-যাই অবস্থা; দেড়দিন একটানা ঘুমিয়েছে। আমার মা বড় জায়ের ওপর খবরদারি করেছে বরাবর, অচেনা লোকে দেখলে ভাবত, মা যেন বড়, জ্যাঠাইমা ছোট। জ্যাঠাইমা এ-সংসারে আপন মনে ঢুকেছিল, চলে যাবার সময়ও মার কোলে মাথা রেখে আপন মনেই চলে গেল। যাবার আগে শুধু মার হাতটা প্রাণপণে নিজের কপালের ওপর চেপে ধরেছিল। বাবা কেবল হাউমাউ করে কেঁদেছে। জ্যাঠামশাই যেন আঘাতটা অনুভব করার আগেই দেখলেন শ্মশানে শুধু ছাই পড়ে আছে, মানুষটি আর নেই। আজও জ্যাঠাইমার কথা ভাবলে আমার মনে পড়ে, শিবমন্দির থেকে বেড়িয়ে নিয়ে ফেরার সময় জ্যাঠাইমা বলত: তোকে আমি শিবঠাকুরের মতন বর এনে দেব, সাত সকালে দুটো বেলপাতা খাইয়ে দিবি দেখবি সারাদিন তুই রানীর মতন পায়ে পা তুলে বসে আছিস। দুটো বেলপাতা তাতেই জামাই তুষ্ট। তখন আমার কত আর বয়েস, সাত আট বছর বড় জোর। অমন নিঃস্ব, নির্লোভ, নিশ্চিত বর

আমার পছন্দ হত না। আমি বলতাম, "ধ্যাৎ আমি বিয়েই করব না।"

মানুষের কী মন! এই আমার বুক ছিল হালকা, আবার দেখি ভারী হয়ে উঠেছে, চোখের তারা টনটন করছে।

রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে দেখি আয়না তার এস্রাজ তুলে রেখেছে। জ্যাঠামশাই একপাশে চুপ করে বসে আছেন।

আয়নাকে বললাম, "একটা ফ্লাস্ক ছিল; খুঁজে দেখ তো কোথায় রেখেছি।"

"ফ্লাস্ক!" আয়না যেন বুঝতেই পারল না।

"খাবার ঘরের ছোট দেরাজে দেখ। না হলে কাচের জিনিসের জায়গাটা দেখিস।"

"ফ্লাস্ক কী হবে?" আয়না জিজ্ঞেস করল।

ভাবলাম বলি, হবে আমার মাথা। "কাল সকালে সুহাসের বন্ধু জঙ্গলে যাবে বেড়াতে। খানিকটা চা দিয়ে দিতে হবে।"

আয়না বলল, "বারে, তাহলে দাদাদের সঙ্গে আমিও যাব।"

"সুহাস যাচ্ছে না।"

"অবিনদা একলা যাবে?"

"একলাই; কার্তিকের সাইকেলটা নিয়ে যাবে।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "রাস্তা চিনে একলা যেতে পারবে? টুঙরির দিকে বুনো কুকুরের খুব উৎপাত শুরু হয়েছে, অর্জুন বলছিল।"

বুনো কুকুরের কথায় আমার কেমন চিন্তা হল।

পরের দিন ভোর বেলায় আমার শোবার ঘরের দরজায় ঠকঠক শব্দ হতেই ধড়মড় করে উঠে বসলাম। অবিন এসে ডাকছে। তাকিয়ে দেখি জানলার বাইরে সবে যেন ফরসা ধরেছে, কাক-পাখিদেরও ঘুম ভাঙে নি এখনও। সাড়া দিয়ে জানালাম, আমি উঠেছি।

বাইরে বারান্দার দিকে অবিন দাঁড়িয়ে ছিল। দরজা খোলার শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। সে যেন যাবার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আসছি বলে তার চায়ের ব্যবস্থা করতে ছুটলাম।

বাসী কাপড়, চোখে মুখে কোনোরকমে একটু জল ছোঁওয়ানো; অবিনের জন্যে খাবার ঘরের কোণে চা করতে বসে আমার মনে পড়ল, কাল ঘুমের মধ্যে ওকে আমি দেখেছি। কী ভাবে দেখেছি আমার মনে পড়ছিল না। স্টোভের একটানা গোঁ-গোঁ শব্দ থেমে গিয়ে ঘর বাড়ি চুপ করে গেল, তবু আমার মনে পড়ল না।

চা খাবার নিয়ে অবিনের ঘরে গিয়ে দেখি সে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

আমি বললাম, "এত হুড়োহুড়ির কী আছে? জঙ্গল তো আর পালিয়ে যাবে না। সবে সকাল হল।"

অবিন হেসে বলল, "আমি যা দেখতে যাচ্ছি সেটা হয়ত পালিয়ে যাবে।"

ও যে কী দেখতে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারলাম না। "গাছপালা ছাড়া

জঙ্গলে আছে কী?"

অবিন তার পেয়ালার বাকি চাটুকু এক ঢোকে খেয়ে উঠে দাঁড়াল। যেন তার ঘোড়ায় জিন দেওয়া রয়েছে, তর সইছে না। অতটা গরম চা ওইভাবে খেয়ে জিব পুড়ল কিনা কে জানে। জলের বোতল কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে অবিন ঠাট্টা করে বলল, "সুহাসের সঙ্গে এইখানে আপনার বেখাপ্পা একটা মিল হয়ে গেল। আপনাকে বোঝাবো সে-সময় এখন আমার নেই। তবু একটা কথা না বলে পারছি না: এই যে ভোর বেলায় আপনি আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আমি যদি তাকে নিতান্ত চোখ দিয়ে বর্ণনা করি তাহলে আপনার বারো আনা মাটি হয়ে যাবে। অথচ আজকের সকালটা যে আপনাকে নিয়েই ষোলো আনা চমৎকার হয়ে উঠল তা কেমন করে বোঝাব!"

কথাগুলো যেন তার ঠোঁটের ডগায় ছিল, অক্লেশে বলে গেল, কোথাও একটু আটকাল না। সাত সকালে শখ করে কেউ বিপদ বাধাতে চায় না। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিলাম।

কার্তিকের সাইকেল নিয়ে ও বারান্দার নীচে নামতে আমি বললাম, "জ্যাঠামশাই বলছিল, জঙ্গলে বুনো কুকুরের উৎপাত বেড়েছে।"

অবিন আমার চোখের দিকে তাকাল।

ও যখন যাচ্ছে, আবার বললাম, "দুপুর করলে লু খেতে হবে।"

অবিন চলে গেল; আমি ক' দণ্ড বারান্দায় দাঁড়িয়ে সকালের ধবধবে ভাবটা দেখতে দেখতে শুনলাম, সেই পাখিটা চিকন সুরে শিস দেওয়ার মতন করে ডাকছে।

সকালে স্নান সারতে আমার খানিকটা বেলা হয়। আজ সকাল-সকাল স্নানে গেলাম। কলঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি রোদ উঠে গেছে।

বৈশাখের বেলা; রোদ চড়ে উঠল। বেলাও বেড়ে গেল কখন। সূর্য গনগন করছে। বাড়ির দরজা জানলা একে-একে বন্ধ করে দিল কার্তিক। জ্যাঠামশাইয়ের ঘরের জানলা থেকে খসের গন্ধ উঠল।

তারপর দেখি সব খাঁ-খাঁ; গাছপালা পুড়ছে, মাটি পুড়ছে, আকাশ তামার মতন হয়ে রয়েছে, গরম বাতাস লু হয়ে বইতে শুরু করেছে। অবিন আর ফেরে না। সুহাস খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল, তার যেন বন্ধুর জন্যে কোনো চিন্তা নেই। জ্যাঠামশাই, নিজের ঘরে, আয়না বই মুখে করে তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। আমি জানলা খুলে বসে আছি। এই টা-টা রোদে অবিন কোথায় ঘুরে মরছে কে জানে! ছেলেটা কি পাগল নাকি?

মাঝ দুপুরে দেখি জ্যাঠামশাইও ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁর ভয় বুনো কুকুরের। সুহাসও বার কয়েক ঘর-বারান্দা করল। এবার যেন খানিকটা রাগও হয়েছে তার। আয়না একবার ছাতা মাথায় দিয়ে ফটক পর্যন্ত ঘুরে এল।

আমার চোখ ঠায় ফটকের দিকে। মন যেন টুঙরির জঙ্গল পর্যন্ত অবিনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই সময়টায় পশুপাখিও ছায়া ছেড়ে নড়ে না। আকাশ দাউ-দাউ

করে জ্বলছে, রোদ সব ঝলসে দিচ্ছে। হুঁ-হু ডাক দিয়ে লু ছুটছে, ধুলো উড়ছে লাল হয়ে, বেঘোর জ্বর নিয়ে মাঠঘাট যেন পড়ে আছে।

বিকেল পড়ে আসার সময় দেখি ফটক খুলে মূর্তিমান আসছে। মাথায় শালপাতার ঠোঙা, খাবারের দোকানে যেমনটি দেখা যায়; কানে-কপালে রুমাল বাঁধা, চোখ মুখ পুড়ে ঝলসে গেছে, চোখ দুটো লাল টকটকে। সর্বাঙ্গে ধুলো।

আমার মনে হল, লুয়ের ঝড় লেগে অবিনের জ্বর এসেছে। ছেলেটা আজ নির্ঘাত মরবে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওকে দেখব কী, ওর গায়ের তাত যেন আমার গায়ে এসে লাগছিল। ও আমায় পোড়াবে নাকি শেষে!

সংসারে এক ধরনের মানুষ থাকে যারা ভাবে মাথা নেড়েই বুঝি সব কিছুকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়। অবিন হল সেই গোত্রের মানুষ। সারা দিন বৈশাখ মাসের রোদ লাগিয়েছে মাথায়, আগুনের হলকা খেয়েছে, লুয়ে পুড়েছে, তবু স্বীকার করবে না তার শরীর আর সইতে পারছে না। পশু-পাখিও যেখানে হার মানে সেখানে তার অত সহ্য হবে কেন? তার চোখ-মুখ বলছিল, ওর জ্বর হয়েছে, তাতের জ্বর। অবিন সেটা মানতে চাইল না। সন্ধ্যের দিকে দেখি তার আর মাথা নাড়ার অবস্থা নেই, গা পুড়ে যাচ্ছে। দেখতে-দেখতে বেহুঁশ জ্বর। জ্যাঠামশাই তাঁর হোমিওপ্যাথির বাক্স হাতড়ে আর কূল পাচ্ছিলেন না। সুহাস ছুটল প্রতাপ ডাক্তারকে ডাকতে। ভয়ে-ভাবনায় আমরা ছটফট করতে লাগলাম। কার্তিক গেল বাজার থেকে বরফ আনতে। কোথা থেকে এক সর্বনাশ এসে বাড়িটাকে তটস্থ করে তুলল। অবিনকে নিয়ে হুলস্থূল কাণ্ড।

রাত্রে জ্বর ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। অবিনের চোখের পাতা বন্ধ, মুখ থমথম করছে, নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত। তার জ্বরের তাতে বিছানাপত্র আগুন হয়ে উঠেছিল। আমরা তিন ভাইবোন অবিনের পাশে। জ্যাঠামশাই আসছিলেন-যাচ্ছিলেন। মাথা ধুইয়েও জ্বর নামছে না। ঠাণ্ডা জলে মুখ মুছিয়েছি কতবার তবু কপালের আগুন কমছে না। শেষে একটু কমল। বেশী রাতে আয়না উঠে গেল, সুহাস গেল আরও খানিকটা পরে। ভোরের দিকে জ্বর নামছে দেখে কপাল থেকে জলপটিটা সরিয়ে দিলাম। পাখার বাতাস করে করে হাত আমার ধরে এসেছিল, পাখা রেখে আরও খানিকটা বসে থাকলাম। তারপর দেখি, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে অবিন যেন অনেকটা শান্ত। তার মুখে কপালে হাত দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

একটু বেলায় আয়না আমার ঘরে এসে বলল, "দিদি, অবিনদা উঠেছে।"

"জ্বর দেখেছিস?"

"দাদা দেখেছে; একশোর নীচেই।"

মন বলল, আজ আরও খানিকটা বেলায়, কিংবা বিকেলের দিকে জ্বরটা ছেড়ে যাবে। প্রতাপডাক্তারকে কাল খুব সময়মতন পাওয়া গিয়েছিল, নয়ত অবিন আমাদের আরও বিপদ বাড়াত।

আয়না বলল, "অবিনদা এক পেয়ালা চা খেতে চাইছে; কী করি?"

সারা রাত আমাদের ঠায় বসিয়ে রেখে এখন চোখ মেলে অবিনবাবু চাইছেন চা। শুনলে মাথা গরম হয়ে ওঠে। "বল গে যা এখন চা হবে না।"

আয়না হেসে ফেলল।

"হাসছিস যে?"

"অবিনদার ঘরে গিয়ে একবার দেখ না, দাদা যাচ্ছেতাই করে বলে যাচ্ছে অবিনদাকে, আর অবিনদা আমসীর মতন মুখ করে শুয়ে আছে।"

"বেশ করছে সুহাস। বাড়িসুদ্ধ লোককে কম ভুগিয়েছে কাল। পরের বিপদ ঘাড়ে করে আমরা মরি!"

আয়না দাঁড়িয়ে থাকল। আমি এখন যাব কলঘরে। স্নানের গোছগাছ শেষ করেছি। চোখে ঘুম ছিল না রাতভর, সারা গা ভেঙে যাচ্ছে, হাই উঠছিল। কাল সারাটা দিন, সমস্ত রাত ওই অবিন আমার ভুগিয়েছে।

"আমি এখন কলঘরে যাচ্ছি", আমি বললাম, "আমার দেরি হবে। পাতলা করে এক পেয়ালা চা দিয়ে দিগে যা।"

আয়না আর দাঁড়িয়ে না থেকে অবিনের চায়ের ব্যবস্থা করতে গেল। যাবার সময় দেখলাম, তার মুখের হাসিটা মজা-পাবার মতন; যেন আমার বিরক্তিটুকু কিছু নয়। এ বড় মুশকিল, অবিনের ওপর যে আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছি এটা কি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোঝাতে হবে!

অবিন আমাকে সত্যিই বিরক্ত করে তুলেছে। তার ভাব-সাব আমি কিছু বুঝছি না। সুহাসের কম বন্ধু এ-বাড়িতে এল না, কত ছেলে এসেছে, কিন্তু এমন আর দেখি নি। এর সব কিছুই অন্যকে বিব্রত করার জন্যে। কালকের কথাই ধরি, যার মাথায় এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে সে কখনও শখ করে বৈশাখ মাসের এই কাঠফাটা রোদ লাগায় না সারা দিন, লাগিয়ে জ্বর বাধিয়ে অন্যদের বিপদে ফেলে না। এমন করে কেউ আমাদের বাড়িতে হুলস্থুল বাধায় নি আগে। কপাল ভাল, অবিনের জ্বর কমে গেছে, আজ হয়ত পুরোপুরি ছেড়ে যাবে; কিন্তু কাল যখন জ্বর একশো চার পর্যন্ত উঠে গেল, আমরা ভয়ে-ভাবনায় মরে যাচ্ছিলাম। গরমকালের এই লু বড় খারাপ। হুট করে কার কখন লেগে যায় বলা যায় না। লু লেগে মারাও যায় ফি-বছর। গত বছরেই অমন জোয়ান পোস্ট অফিসের পিওনটা মারা গেল। অবিনের যখন বেহুঁশ অবস্থা, জ্বরের ঘোরে তার মুখ থমথম করছে, কেমন লালচে হয়ে উঠেছে নাকের

ভগা, কান, ঠোঁটের পাশ—তখন আমার পিওনটার কথা মনে পড়েছিল। সুহাসও ভয়ে কেমন কালী হয়ে গিয়েছিল। জ্যাঠামশাই কেবল মাথা ঠাণ্ডা রেখে ওষুধপত্র দিচ্ছিলেন; তারপর বললেনঃ 'প্রতাপকে ডেকে আনো।' অবিনের কপাল ভাল, আমাদেরও ভাগ্যের জোর, অবিন শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিতে পারল। নয়ত আজ এতক্ষণে যে বাড়ির কী চেহারা হত, কে জানে!

কলঘর থেকে বেরিয়ে এসে শুনি প্রতাপডাক্তার এসেছে।

চুল আঁচড়ে মুখ মুছছি, সুহাস এল। এসে বলল, "অবিনটা এ-যাত্রায় বেঁচে গেল।"

সুহাসের গলার স্বর থেকে বুঝতে পারলাম, প্রতাপ-ডাক্তার তাকে নিশ্চিন্ত করে দিয়ে চলে গেছে।

আমি বললাম, "কী বন্ধুই সঙ্গে করে এনেছিলি!"

সুহাস একটু হেসে বলল, "যাই বলিস, অবিন বলেই ধাক্কাটা সামলে নিল; আমি হলে মরে যেতুম।"

"ও আবার সামলালো কোথায়, যত ধাক্কা আমাদেরই সামলাতে হল।"

সুহাস আমার ঘরের আয়নায় তার মুখ দেখতে দেখতে আঙুল দিয়ে মাথার চুল আঁচড়াল। "অবিনকে আমি খুব একচোট দিয়েছি। বেচারী বেশ লজ্জায় পড়ে গেছে। আজ আর ওর গলা উঠছে না।"

"গোঁয়ারতুমি করে কি সব হয়! ওর একটা শিক্ষা পাওয়া উচিত ছিল।"

হাসল সুহাস। তারপর বলল, "আমি একবার বাবলাদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। কাল বাবলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাস্তায়, মিষ্টি-মিষ্টি করে যা ঠুকলো রে—" সুহাস হাসল, "বাবলা কী লম্বা হয়ে যাচ্ছে দেখেছিস দিদি, যতবার ওকে দেখি আধ হাত করে মাথায় বেড়ে যাচ্ছে!"

"আশা-কাকিমার ধাত পেয়েছে। আশা-কাকিমা মাথায় খুব লম্বা ছিল।"

"বাবার বার্ষিকের দিন নাকি বুলা এসেছিল?"

"তুই দেখিস নি?"

"না, আমার চোখে পড়ে নি।" সুহাস অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

কলকাতায় থাকতে থাকতে সুহাসের চোখ গুটিয়ে আসছে। সে আজকাল এখানকার অনেক কিছুই আর দেখতে পায় না, দেখার ইচ্ছেও থাকে না। আমি দেখেছি, ও বাড়ি এসে যে দু-চার দিন থাকে তার মধ্যে বেশীর ভাগ সময়টাই তার বয়ে-আনা কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গেই গল্পগুজবে, আড্ডায় কাটিয়ে দেয়। এখানকার লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বড়-একটা করে না। ও চলে যাবার পর শুনি, সোনা-জ্যাঠাইমা বলছে: 'ওমা, কবে এসেছিল ছেলেটা? কই দেখা করল না তো?' অভয় বলছে: 'দেখেছেন দিদি, আমি দোকানে সারা দিন বসে থাকি, ও বাজারে গেল, আমার দোকানে গেল না একবার! কলকাত্তার বাবু হয়ে গেছে।'

এখানকার মায়া সত্যিসত্যিই ও কাটিয়ে ফেলেছে। মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে

ভাবি, এখানে তোর জন্ম, এখানে তুই বেড়ে উঠলি, তোর খেলার সঙ্গী, পড়ার সঙ্গী, তোর ছেলেবেলার সুখদুঃখ কত তো এখানে, অথচ তুই সব কেমন ভুলে গেলি। আমাদের পরিবারের সঙ্গে এখানকার কার না সম্পর্ক! দাদুর আমল থেকে আমরা এই শহরের সবচেয়ে নামী পরিবার : লোকের খাতির-ভালবাসা কম পাই নি, অথচ তুই তোর ব্যবহারে এদের ক্ষুণ্ণ করছিস, দুঃখ দিচ্ছিস।

বাবার বার্ষিকের দিন বুলা এসেছিল এটা তুই দেখেছিস, সুহাস। অকারণ মিথ্যে বলছিস আমাকে।

সুহাস যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। "যাই, ঘুরে আসি।"

"ছাতা নিয়ে যা, মাথায় রোদ লাগাস নি।"

যেতে যেতে সুহাস বলল, "অবিনকে মিক্সচারটা খাইয়ে দিস।"

সংসারের তদারকি সেরে অবিনের ঘরে গিয়ে দেখি শুয়ে-শুয়ে কড়িকাঠ দেখছে। পায়ের শব্দে চোখ নামিয়ে আমায় দেখল, তার পরই হেসে বলল, "মনে-মনে আপনাকে খুঁজছিলাম, চেয়ে দেখি আপনি।"

অবিনের বিছানাপত্র ঘরদোর পরিষ্কার করে দিয়েছে আয়না। খোলা জানলা দিয়ে বাতাস আসছে, এখনও গরম হয়ে ওঠে নি; পেয়ারা পাতার ছায়া পড়ে আছে জানলার দিকে।

ওষুধের শিশি-টিশি দেওয়াল ঘেঁষে ছোট দেরাজের মাথায়। এক দাগ ওষুধ এখন খাওয়াতে হবে। অবিনের কথাটা আমার কানে বেয়াড়া শুনিয়েছিল। তার কথাবার্তার ধরন আমার জানা হয়ে গেছে। জবাব দিলাম না কিছু।

শিশি ঝাঁকিয়ে আমি ওষুধ ঢালছি দেখে অবিন বলল, "ওই ওষুধটা পেটে পড়লে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। পুরো মাত্রাটা কমানো যায় না?"

"আমি ডাক্তার নই।"

"ডাক্তারের চেয়ে কম্পাউন্ডাররা সদয় হয়", অবিন হাসল, "মার চেয়ে মাসির মতন আর কি!"

ওষুধটা হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিলাম। অবিন মুখচোখের এক ভঙ্গি করল, তারপর মস্ত করে দম নিয়ে নাক কুঁচকে ওষুধটা নিল। ঢক্ করে মিক্সচারটা খেয়ে কেমন বিচিত্র এক শব্দ করল, যেন জলে ডুব দিয়ে মাথা তুলে দম নিচ্ছে।

জলের গ্লাসটা ওর হাত থেকে নিয়ে রেখে দিচ্ছি, অবিন বলল, "আপনাদের প্রতাপ-ডাক্তার আমায় নির্ঘাৎ কুইনিন গেলাচ্ছে।"

"না," আমি বললাম, "জ্বরে মুখ তেতো হয়ে আছে।"

অবিনকে ভোর-রাতে মোটামুটি স্বাভাবিক, শান্ত দেখে আমি তার ঘর থেকে উঠে গিয়েছিলাম; ও তখন ঘুমোচ্ছিল। সকালে এই প্রথম তাকে দেখছি। এক রাত্রের বেঘোর জ্বরে তার চোখমুখ শুকিয়ে গেছে, অতটা জ্বর চলে

যাওয়ার পর এখন তাকে আঁচ-নেবা উনুনের মতন পোড়া-পোড়া বাসী দেখাচ্ছিল। অনেকটা নির্জীব। চোখের কোল কালচে, ঠোঁট শুকনো। চোখ তখনও চকচক করছিল। জ্বরটা এখনও রয়েছে।

অবিন বলল, "এ-বাড়ি নাকি আপনার হুকুমে চলে! আমার কিছু অভিযোগ আছে।" বলে অবিন তার মাথার দিকের বালিশ সরিয়ে পিঠে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসল, "সকাল থেকে আমার ওপর অকথ্য অত্যাচার চলছে।"

ওর বিছানার কাছাকাছি আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম।

অবিন বলল, "আপনার ভাই আমায় যা পারল একনাগাড়ে বলে গেল, সে চিড়িয়াখানায় দেখেছে, যে-জন্তুটা সেখানে দেখে নি—এখানে যেটা অঢেল—তার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা স্থির করে দিল; আমি চুপ করে শুনলাম; আপনার বোনকে অনেক সাধ্য-সাধনার পর এক পেয়ালা চা আর এক টুকরো বিস্কুট পেয়েছি খেতে। ব্যাপারটা কী?"

হাসি চেপে আমি বললাম, "ভোগ!"

"ভোজ্যের বাহুল্য না থাকলে ভোগ হয় না। সেটা দুর্ভোগ।"

"তবে তাই।"

"আজ সারা দিন কি এটা সহ্য করতে হবে?"

"তা এখন জ্বরজ্বালা থাকলে কী করা যাবে!"

"জ্বর এখন প্রায় নেই; নিরানব্বুই হতে পারে। আপনি বরং দেখুন—" অবিন তার হাতটা সটান আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

আমি বললাম, "গায়ে হাত দিয়ে আমি কী বুঝব!"

"তা হলে বুকে হাত দিয়ে দেখুন..." বলে অবিন তার ঢিলে জামার তলায় বুকটা দেখাল।

স্নানের সবটুকু ঠাণ্ডা যেন আমার চোখ-মুখ থেকে কেউ নিমেষে শুষে নিল: অবিনের দিকে আর তাকাতে পারি না।

অবিন কী বুঝল কে জানে, হঠাৎ নীচু গলায় বলল, "থার্মোমিটারটা দিন, আমি নিজেই দেখে নিচ্ছি।"

দরকার ছিল না কিছু; বারবার এত গা দেখার কী-ই বা ছিল, তবু অস্বস্তিটা এড়াবার জন্যে দেরাজের মাথা থেকে থার্মোমিটারটা তুলে নিয়ে অবিনের বিছানায় ফেলে দিলাম।

অবিন জ্বর দেখল কি দেখল না তা দেখার জন্যে আমি আর দাঁড়িয়ে থাকলাম না।

দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে দেখি, চারপাশে বেশ গুমট হয়েছে। গায়ে গলায় ঘাম জমেছে, বালিশের কোনা যেন ভিজে ভিজে। কী জানি, কেমন করে এটুকু ভিজলো। কুঁজোর জলে আজ বোধ হয় বেশী কর্পূর পড়ে গেছে,

গন্ধটা ভাল লাগল না, জানলার বাইরে জলটুকু ফেলে দিলাম। বাইরে রোদ বেশ চাপা পড়ে গেছে, জামগাছের ভাঙা ডাল শুকিয়ে এল, অজস্র পাতা রোদে পুড়ে হলুদ হয়ে গেছে, শুকিয়ে খসে গিয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে যাচ্ছিল। কুয়াতলায় কেউ জল তুলছিল, শব্দ আসছে। এক ঝাঁক চড়ুই ঘূর্ণির মতন উড়ে গেল।

কলঘর থেকে ফিরে এসে খানিকটা আরাম লাগল, চোখমুখের জলটুকু থাক, বেশ ঠান্ডা লাগছে।

বেলা ফুরিয়ে আসছে। আজও আবার কালবৈশাখী উঠতে পারে। আয়নার গলা শোনা যাচ্ছে। কমলাদির সঙ্গে বকবক করছে।

কী করি, কী করি করে বিছানায় বসে আর-একটু সময় কাটল। শোবার সময় একটা পুরনো বই নিয়েছিলাম, ওই নেওয়াই সার, পাতা পর্যন্ত ওলটানো হয় নি, বইটা এখনও বিছানায় পড়ে আছে। বইটা তুলে রাখতে গিয়ে দেখি : 'ইন্দিরা'।

আয়না তার ঘর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী বলছিল, শুনতে পাচ্ছিলাম না। শেষে কমলাদি এসে বলল, ধোপা এসে বসে আছে।

"ছোড়দিকে বলো কাপড় মিলিয়ে নিতে।"

কমলাদি বলল, আয়না যাচ্ছে গা ধুতে। সুহাসের সঙ্গে কোথায় যেন যাবে!

আয়না কোথায় যাবে আমি জানি না। যেখানেই যাক, ধোপার বাড়ির কাপড় মিলিয়ে যেতে পারে। সংসারের সব কাজ আমায় করতে হবে নাকি? এই সামান্য কাজটুকুর জন্যেও দিদিকে দরকার। এদের কাণ্ডকারখানা দেখলে মাঝে-মাঝে সত্যিই রাগ হয়। দিদি যেন তোদের সংসারের চৌকিদার।

বলব কাকে, কমলাদিকে পাঠালাম তো আয়না এসে হাজির। তার চুল বাঁধা শেষ, খুব শখ করে মোটা বিনুনি পাকিয়ে খোঁপা বেঁধেছে।

আয়না বলল, "দিদি, আমি একটু হরকুণ্ডা বেড়াতে যাব। দাদা যাচ্ছে।"

আয়না ওই রকমই। ধোপার বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে সে চলে গেল গা ধুয়ে জামা-কাপড় বদলাতে। সংসারে বড় হয়ে জন্মানোর এই হল জ্বালা. রাগ বিরক্তি নিয়ে বসে থাকলে তোমার চলবে না। ধোপার খাতা নিয়ে আমাকেই বসতে হল। কাপড়-চোপড় লেখা যখন শেষ করেছি, মিশির তার গাঁটরি বাঁধছে, দেখি কার্তিক হাট সেরে ফিরছে। আজ হাটের দিন ছিল, মোটামুটি সবই আমাকে বলে বুঝিয়ে দিতে হয়—আজ কিছুই বলি নি, শুধু টাকাটা তার হাতে তুলে দিয়েছি, ঘুমে তখন মাথা টলে যাচ্ছে।

বিকেল পড়ে যাচ্ছে, চা খেয়ে সুহাস আর আয়না চলে গেল। চারদিক আগের মতনই ঘোলাটে হয়ে রয়েছে। গুমট সেই রকমই। সুহাসরা যাবে মতিলালের জিপ গাড়িতে, হাটবারের দিন ওটা হরদম ছোটাছুটি করে। আয়নার পেছনে-পেছনে তার 'টোপর' ফটক পর্যন্ত চেঁচাতে-চেঁচাতে ছুটে গেল, তারপর

বাগানের চারদিকে তার দৌড়ঝাঁপ শুরু হল।

ঘরে বসে চুল বাঁধতে ইচ্ছে করছিল না। বাতাস নেই, বড্ড গুমট; ঘরের মধ্যেটাও ঝাপসা হয়ে এসেছে। চিরুনি ফিতে কাঁটা নিয়ে বারান্দায় সিঁড়িতে গিয়ে বসলাম।

হাট ফুরিয়ে এসেছে। পাঁচিলের ওপারে রাস্তা দিয়ে হাট-ফেরত লোকজন ফিরছে, দেখতে পাচ্ছি না, গলা শুনতে পাচ্ছি; গরুর গাড়ি চলেছে ককিয়ে-ককিয়ে; আকাশটা গুম ধরে আছে, ঝাঁক বেঁধে পাখি নামছে গাছের মাথায়, তিলকাঞ্চন ফুলের ঝোপ ছাড়িয়ে ছায়াটা আমাদের বাড়ির দেওয়াল ধরে উঠে যাচ্ছে।

এই দৃশ্য নিত্যকার। কোন ছেলেবেলা থেকে দেখতে শুরু করেছি, আজও দেখে যাচ্ছি। কখনও-কখনও মনে হয়, আমার মন বুঝি এখানে পোঁতা আছে, এই বাড়ির এই সব গাছপালার মতন, ইহজন্মে তার আর নড়ার উপায় নেই। আমাদের তিন পুরুষের যত মায়া সব যেন এখন আমি পুঁটলি বেঁধে নিয়ে বসে আছি এখানে। জ্যাঠামশাই আর কতদিন, তারপর আমি শুধু একলা। আয়নার বিয়ে হয়ে যাবে, সে আর থাকবে না। সুহাস অনেকদিন থেকেই দূরে-দূরে সরে থাকছে, আর দু-চার বছর পর সেও আর আসবে না হয়ত। এখানে তার একটা টান ছিল এক সময়, সে-টান আর নেই। বুলা বেচারী নিজেও সেটা বুঝে নিয়েছে। মেয়েটার জন্যে আমারই দুঃখ হয়।

এক-একদিন হঠাৎ আমার রাগ হয়ে যায় ভীষণ। কেউ যদি না থাকে তবে আমি কেন যক্ষের মতন বসে থাকব এখানে? ছত্রিশটা বছর এখানে ঘরবাড়ি বারান্দা করে আমার কতটুকু বুক ভরেছে? কী পেয়েছি আমি? কোন্ সান্ত্বনায় আঁকড়ে আছি এই মাটি? কী হবে আমার? শুধু বেঁচে থাকব? এই বাড়ির মধ্যে একা আমি বেঁচে থেকে থেকে বুড়ি হয়ে মরে যাব?

কী জানি! এসব কথা ভাবতে পারি না ভাল করে, ভাবলেও কোনো কূল পাই না। আমি সাধারণ মেয়ে, নিজের জীবন নিয়ে অত ভাববার বুদ্ধিসুদ্ধি আমার নেই।

কাঁটা গুঁজতে-গুঁজতে দেখি জ্যাঠামশাই আসছেন।

কাছে এসে বললেন, "আমি একটু আশ্রমের দিকে যাচ্ছি। মহারাজ এসেছে। ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।"

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "কোন্ মহারাজ?"

"আনন্দ মহারাজ?"

"ঝড়টড় আসতে পারে।"

"তা পারে—" জ্যাঠামশাই একবার আকাশের দিকে তাকালেন। "সত্যটত্য থাকবে সঙ্গে, আমি ঠিক চলে আসব।"

"টর্চ নিয়েছ?"

জ্যাঠামশাই মাথা হেলিয়ে জানালেন, নিয়েছেন। হাতে বেতের লাঠি, পায়ে

ক্যাম্বিসের মোকাসিন জুতো। জ্যাঠামশাই চামড়ার জুতো পরতে পারেন না আর, পায়ে লাগে। সুহাস কলকাতা থেকে ওঁর জুতো কিনে আনে। জুতো, হোমিওপ্যাথি ওষুধ, আর বই।

যেতে গিয়ে জ্যাঠামশাই বললেন, "খোকার বন্ধুকে দেখে এলাম। জ্বরটর নেই, গা ঠাণ্ডা। বেশ ভাল আছে।"

আমি চুপচাপ।

"ওকে এবার কিছু খেতেটেতে দে। গরম সুজিটুজি। খিদে-খিদে করছে।"

জ্যাঠামশাই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। তারপর বাগান দিয়ে আস্তে-আস্তে হেঁটে ফটক খুলে বাইরে চলে গেলেন।

অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে আছি দেখি হুস করে বিকেলটা আকাশ থেকে খসে পড়ে কোথায় মিলিয়ে গেল।

অবিন তার ঘরের সামনে বারান্দায় এসে বসে ছিল। আমি গা ধুয়ে, শাড়ি জামা বদলে এসে দেখি তার চা-সুজি খাওয়া শেষ হয়েছে। ক্যাম্বিসের চেয়ারে আরাম করে শুয়ে-শুয়ে সন্ধ্যে দেখছে। এতক্ষণে একটু বাতাস দিচ্ছিল।

অবিন আমার দিকে তাকিয়ে থাকল সামান্য, তারপর অবাক হবার মতন চোখ করে বলল, "আপনি বাড়িতে আছেন?"

বুঝলাম আমায় ঠাট্টা করছে অবিন। সকাল বেলায় সেই যে তার ঘরে এসেছিলাম, তারপর আর আমি আসি নি। তার ঠাট্টা গায়ে মাখলে সে আরও পেয়ে বসবে ভেবে আমি বললাম, "সুহাসরা আমাদের এক আত্মীয়ের কাছে গেছে।"

"আমি ভেবেছিলাম আপনিও চলে গেছেন।" অবিন হাসল, ঢিলে চোখ করে আমায় দেখল। "বসবেন না?"

আমার বসার তাড়া ছিল না। রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

অবিনকে সকালের চেয়ে সুস্থ দেখাচ্ছিল। হয়ত আলোর অভাবে ওর চোখমুখের শুকনো ভাবটা চোখে পড়ছিল না বলেই। জ্বর পুরোপুরি ছেড়ে যাওয়ার জন্যেও হতে পারে।

মাথার ওপর হাত তুলে আঙুলে আঙুলে জড়িয়ে আলস্য ভাঙল ও, হাই তুলল। তারপর বলল, "আমার জিবটা খুব তেতো হয়ে গেছে।"

হঠাৎ জিবের কথা কেন? এটা কি সকালের অনুশোচনা? মনে হল বলি, ওটা তোমার জিবেরই দোষ। বললাম, "ও রকম হয়, কেটে যাবে।"

"কবে নাগাদ—?"

"আমি হাত গুনতে জানি না।"

অবিন হেসে ফেলল। "আমার ওপর আপনার আজ আগুন দৃষ্টি, প্রসন্ন নন।"

কথা শুনে রাগ হল। তুমি কে? তোমার কেমন করে এ ধারণা হল, আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হব!

"সুহাসদের সঙ্গে আমার বনে না," অবিন বলল, "সোজা কথাটা ওরা হয় বেঁকা করে বলে; না হয় বলে না। আমি সোজাসুজি বলি। আপনি বিশ্বাস করুন, জ্বরজ্বালা সর্দিকাশি অনেকের মাদুলি করে বাঁধা থাকে হাতে। আমার ওটা কোনোকালেই নেই তবে মানবজন্মের একটা বড় দুঃখ, তার অ-দৃষ্ট বলে একটা জিনিস আছে। কার্তিকের সাইকেলের চাকা চুপসে যাবে, শেকলটা কেটে যাবে—এ আমার হিসেবের বাইরে ছিল, দুটো ঘটনাই ঘটল মাঝ রাস্তায়—যখন মাথার ওপর দুপুরটা রাগে ফেটে পড়ছে। ওই রোদটাই হল কাল...। নয়ত আপনাকে ঠায় রাত জেগে বসে ভাবতে হত না, অবিনটা যদি হুট করে মরে যায়—তা হলে আমি করব কী?"

অবিন কি তামাশা করছে! বললাম, "অত আমি ভাবি নি।"

"আপনার ভাবনাটুকু আমি না হয় ভেবে নিলাম।"

"নিজের ভাবনাটুকু কে ভাববে?"

"সেখানেও অবিন নিজে।"

"তা হলে নিজেরটাই থাক, পরেরটায় দরকার নেই।"

অবিন জোরে হাসল। "আপনি অবিনকে চেনেন না।"

"শুনেছি।"

"সুহাস বলেছে? সুহাস আমায় নিয়ে গল্প তৈরি করে।"

"বেশ তো, জেনে রাখলাম।"

অবিন চুপ করে গেল। এক ঝলক বাতাস এসে চলে গেছে। আবার সব গুমট হয়ে যাচ্ছিল। কার্তিক বাতি জেবলে দিয়েছে ঘরে ঘরে। লণ্ঠন হাতে সে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসছে।

অবিন আচমকা বলল, "আপনি শুধু অবিনের গল্পটা জানবেন? অবিনও যে আপনারটা জানে।"

আমি ভীষণভাবে চমকে উঠে বললাম, "কার?"

অবিন বলল, "আপনার।"

অবিন বলল, 'আমার গল্প সে জানে।'

কথাটা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। এ-বাড়িতে এসে পর্যন্ত ও আমায় কম অবাক করে নি, অনেক চমকই দিয়েছে; তার কথায় আমি ভয়ে অস্বস্তিতে মরেছি; কিন্তু এমন আর কখনো হয় নি। অবিন যেন আমায় হতবিহ্বল করে ফেলল, না পারি তার চোখের দিকে তাকাতে, না পারি কথা বলতে। আমার সাহসে কুলোলো না তাকে কিছু জিজ্ঞেস করি। অবিনকে বসিয়ে রেখে

আমি যেন পড়িমড়ি করে পালিয়ে এলাম।

ঘরে এসে একটু তবু বাঁচি। অবিন কেমন করে আমার কথা জানল আমি ভেবে পেলাম না। সুহাসের মুখে শুনেছে? কী জানি! ঘরের কথা বাইরে বলার স্বভাব সুহাসের নয়। আমায় নিয়ে এ-বাড়িতে যে দুঃখ-অনুশোচনার ইতিহাসটুকু রয়ে গেছে তা বড় চাপা। আমরা তা নিয়ে কথা বলি না। সেটা এমন এক পারিবারিক আঘাত যা আমরা বরাবরই আড়াল করে রেখেছি। মা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন তবু আচমকা কখনো-কখনো মার মুখে কথাটা শোনা যেত। মা চলে যাবার পর ভুল করেও কেউ ও-প্রসঙ্গ তোলে না। বাবা তুলত না; জ্যাঠামশাই নয়, সুহাস নয়, আয়না তো নয়ই।

এ-বাড়িতে সুহাসের অনেক বন্ধু এসেছে। তারা আমায় নিয়ে কী ভেবেছে আড়ালে আমি জানি না। কিন্তু সামনাসামনি কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে নি। কমলেশ ছেলেটির সঙ্গে আমাদের পারিবারিক মেলামেশা সবার বেশি, সেই কমলেশও কোনোদিন জানতে চায় নি, আমার কোনো গল্প আছে কী না!

কে তবে অবিনকে আমার গল্প শোনাল? সুহাস যদি না হয়, তবে অন্য আর কে? আমার মাথায় কিছু এল না, অনুমান করতে পারলাম না। একবার মনে হল, তা হলে কি সেই লোকটার সঙ্গে অবিনের চেনাশোনা আছে? অবিন কি তার কেউ? যদি তাই হত তবে সুহাস তো ওকে এ-বাড়িতে আনত না। সে-ছেলে সুহাস নয়।

আমি যেন হন্যে হয়ে অনেক ভাবলাম, কোনো কূল-কিনারা পেলাম না। অবিনের ওপর অসহ্য রাগ হল। বিরক্ত হলাম ভীষণ। মনে হল, অবিন যেন কোনো রকমে আমার জীবনের একটা চোরা চাবি যোগাড় করে নিয়েছে; আমার অজান্তে সে আমার গোপনতাটুকু দেখে ফেলেছে। মানুষটা বড় ছোট, অভদ্র, অসভ্য। আমার গল্প তোমার জানার দরকার ছিল না।

ঘরে বিছানায় বসে থাকতে পারছিলাম না। বড় অস্থির লাগছে। আবার সেই গুমট জমছে ঘরে, বাতাস নেই, পিঠ গলা ঘামে ভিজছিল, হাতপাখার বাতাস করতে গিয়ে হাত থেমে যাচ্ছে।

বাইরে এসে সোজা জ্যাঠামশাইয়ের ঘর পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছাতে উঠে গেলাম।

আমাদের বাড়ির ছাতটা ছোটখাটো মাঠের মতন, তার চারপাশে নীচু আলসে গাছগাছালির ডালপালা ছাত ছুঁয়ে রয়েছে অনেক জায়গায়। এক কোণে এসে দাঁড়ালাম। ক'দিন আর ছাতে আসা হয় নি। সারাদিনের ঝড়ঝাপটায় ধুলো জমেছে বেশ। গাছগাছালির শুকনো পাতা ছড়িয়ে আছে কোথাও-কোথাও। আলসের গায়ে শ্যাওলাজমা কালোর ছোপ পুরু হয়ে উঠেছে। মাথার ওপর তাকিয়ে দেখি অনেক তারা ফুটে রয়েছে। আকাশটা একেবারে নিরিবিলি। জ্যাঠাইমা বলত, সন্ধ্যে হয়ে গেলে নিশিময়ী তারার ফোঁড় দিয়ে আকাশে কাঁথা

বুনতে বসে। ছেলেবেলায় আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি ফোঁড় তোলা দেখতে। দেখতে পেতাম না, তারাগুলো শুধু জ্বল-জ্বল করত। আজও ছাতে এসে বসে আকাশের দিকে তাকালে আমার সেই কথাটা মনে পড়ে প্রথমে। আজ কী তিথি? হিসেব করে দেখি চাঁদ উঠতে এখনও এক দণ্ড দেরী। ও-পাশের আকাশে চাঁদ ওঠার রঙ ধরেছে। সামনে যতদূর চাই আঁধার-ঝাপসা গাছপালা, উঁচু নীচু মাঠ গা জুড়িয়ে নিচ্ছে শুয়ে শুয়ে। বাইরে ঠাণ্ডা ভাব ছড়িয়ে পড়ছে, বাতাস দিচ্ছিল। কুমুদকাকাদের বাড়িতে গ্রামোফোন বাজছে বোধ হয়, টিমটিম আলো জ্বলছে স্টেশনের রাস্তার দিকে।

ঘরের গুমটটুকু ধীরে ধীরে কাটল। বুক ভরে নিশ্বাস নিলাম বার বার। বাতাসে ধুলোর গন্ধ আর নেই, গাছপালার গন্ধ ঘন হয়ে উঠছে। আজ বোধ হয় ঝড়টড় আর উঠল না; হঠাৎ যদি জঙ্গল থেকে এক পশলা বৃষ্টি এসে যায়। যেতেও পারে।

সিঁড়ির দিকে খস-খস শব্দ শুনে চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে দেখি, না কিছু নয়—বাতাসে আমের ডালপালা আলসের গায়ে ঘষে শব্দ হচ্ছে।

আলসে ঘেঁষে বসলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি তো আছি, হঠাৎ মনে হল, আমার ছত্রিশ বছরের জীবনটা যেন বাতাসে ওড়া শাড়ির মতন আকাশের তলায় উড়তে-উড়তে কোথায় চলে যাচ্ছে। বোধ হয় মতিচ্ছন্ন হয়েছিল আমার, ধড়মড় করে কাপড়টা ধরতে গিয়ে দেখি গায়ের আঁচলটা মুঠো করে চেপে ধরেছি, আলগা হয়ে সেটা বাতাসে উড়ছিল।

অবিন বলল, আমার গল্প সে জানে। সে সত্যি বলল কি মিথ্যে বলল আমি জানি না। সে আমার কতটুকু জানে তাও আমি জানি না। আমার জীবনটা যতখানি গল্পটা তার চেয়ে অনেক ছোট। অবিন আমার জীবন তো জানে না, জানে শুধু কয়েকটা মাসের কথা।

আমার বিয়ের প্রথম সম্বন্ধ হয়েছিল উনিশ বছর বয়সে। ছেলে এই দিককার, নামটা আমার মনে নেই, বোধ হয় ক্ষিতীশ-টিতীশ হবে। খুব বড় পরিবার, দু-পুরুষ ধরে অভ্রর ব্যবসা করে বিস্তর পয়সা করেছে, বাড়ির মধ্যে মেয়ে আনার আগে ওরা সোনার মতন পানমরা বাদ দিয়ে ওজন করে নেয়। উনিশ-বিশ খুঁত কোন মেয়ের না থাকে। ওদের বাড়িতে তেমন খুঁতঅলা বউ নিশ্চয় ছিল। কিন্তু আমার বেলায় তাদের আর পানমরা বাদ দেওয়ার সুযোগ হল না, ছেলে কোথায় শিকার করতে গিয়েছিল, বাঁ হাতটা রেখে এল।

সম্বন্ধটা ভেঙে গেল। আমার খুব দুঃখ হয়েছিল ছেলেটার জন্যে। নাই বা হল বিয়ে, তবু পুরুষমানুষের একটা হাত গেল, আহা।

তারপর যে এল সে একেবারে সাধারণ। সরকারী চাকরি। সাতঘাটে জল খেয়ে বেড়াতে হয়। তাদের তরফে দাবি ছিল বড়সড়। দাবির জন্যে নয়, জ্যাঠা-মশাইয়ের একেবারে পছন্দ হল না। ছেলে মাথায় বেঁটে, গায়ের রঙ কালো,

একটা চোখ বেশ ট্যারা।

এই করে করে আমার বয়েস গিয়ে দাঁড়ালো একুশে। হিন্দু ঘরের আইবুড়ো মেয়ে, সম্বন্ধ তো আসবে যাবে। আমার বেলায়ও এল গেল। আমার এক সখি ছিল, রমা, সে হেসে বলত : 'দেখ মনু, ষোলো পেরুলেই মেয়েরা হয় চাতক পাখি; মেঘ দেখলেই ভাবে বৃষ্টি আসবে। কত মেঘ ভেসে যায়, তারপর আসে জলের মেঘ। তখন যত বৃষ্টি চাস তত বৃষ্টি; আহা রে তখন কী সুখ—।'

রমার কপালে আগে-ভাগে বৃষ্টি নামল, বিয়ে হয়ে চলে গেল জব্বলপুর।

পরের বছর বাবার কাছে কলকাতা থেকে আমার জন্যে সম্বন্ধ এল। জ্যাঠা-মশাই মত করলেন। মা বলল, আর দেরি করো না, চার হাত এক করে দাও।

দাদু বেঁচে থাকতে এ-বাড়িতে বিয়ের উৎসব হয়েছিল দু-বার। দাদু মারা যাবার পর, অনেকদিন পরে আর-একবার বাড়ি সাজিয়ে, সামিয়ানা বেঁধে, এ-বাড়িতে বিয়ের উৎসব বসল। আমায় ঘিরে সেই উৎসব।

এত বড় বাড়িতে চুনকাম হল নতুন করে, দরজা জানলায় রঙ চড়ল, বাগান-টাগান পরিষ্কার করে, ভাঙা কেয়ারি সারিয়ে সমস্ত বাড়িটাকে আবার যেন ঝকঝকে করে ফেলা হল। বাগানের একপাশে সামিয়ানা বাঁধা হল, রাঁচি থেকে ডায়নামো এনে বাতি জ্বালানো হল অঢেল, দেবদারু পাতা দুলল, কলা গাছ পোঁতা হল ফটকে, সিঁড়িতে, শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে খই ছড়িয়ে দাদুর মোহিনীর মোহন-পুরুষ এল।

আমার বিয়ে হয়েছিল ফাল্গুনের গোড়ায়। তখনও এখানে শীতের ছোঁয়া রয়েছে মাঝারি রকম। বিয়ের সময় ছাদনাতলায় আমি আমার স্বামীকে প্রথম দেখলাম। স্পষ্ট করে নয়, অস্পষ্ট করে, আড় চোখে। তারপর সমস্ত লজ্জা ভেঙে পলকের জন্যে দেখলাম শুভদৃষ্টির সময়। মনে-মনে বললাম: ভগবান আমায় এতখানি দেবেন বলেই এতদিন বসিয়ে রেখেছিলেন। আমার দু-চোখ আজ জুড়িয়ে গেল।

বিয়ের লগ্ন ছিল সন্ধ্যে রাতে, শেষ হতে হতে রাত হল। তারপর বাসর। বাসরঘরে বসে আমার জীবনের প্রথম পুরুষটিকে আমি চোখ ভরে দেখলাম। আমার দুঃখ আপসোসের কিছু ছিল না। পুরুষমানুষের পক্ষে আমার স্বামীর রূপ হয়ত একটু বাড়াবাড়ি রকমের। তাতে আমার অহঙ্কার আরও একটু বাড়ল। চোখের মণি কালো দেখতেই আমার ভাল লাগে, আমার স্বামীর দেখলাম, কটা-রঙের মণি। তাও বড় ভাল লাগল। এমন কি আমার গায়ের রঙ ওর রঙের কাছে হার মেনে যেতে পারে—এমন ভয়ও আমার হল।

আমাদের বাড়িতে বিয়ের সামিয়ানা বাসী হয়ে এল, একশ বছরের বাড়ি ফেলে চোখের জল মুছতে-মুছতে এলাম শ্বশুরবাড়ি। এসে দেখি, আমার জানাশোনা জগতের বাইরে কোথায় যেন এসে পড়েছি, কোথাও আর তল পাচ্ছি না।

আমার স্বামীর নাম ছিল রাজেশ্বর। তাদের বাড়িটা রাজবাড়ি না হলেও মহলের অভাব ছিল না। গঙ্গায় গা লাগিয়ে তিন পুরুষের ভিটে। এক সময় প্রতিপত্তি ছিল প্রবল। তার বেশিটা গিয়েছে, বাকিটা রয়ে গেছে। সেই বাকি-টুকুও আমার কাছে একেবারে অজানা অচেনা লাগল।

ভাশুর, দেওর, জা, ননদ করে যত মানুষ, আসা-যাওয়ার মানুষ তার চেয়ে কম নয়। দাস-দাসী তো আছেই।

স্বামীর বাড়িতে এসে পর্যন্ত দেখলাম, পায়ে পায়ে হোঁচট খাচ্ছি। এদের কথা বলার ঢঙ আলাদা, সাজগোজের রূপ আলাদা, আচার-ব্যবহার আমার অজানা।

ফুলশয্যার দিনে আমার স্বামী এল আতরে চান করে যেন, চোখের কোলে বুঝি সুর্মা দিয়েছে, মুখ ভরতি সুগন্ধী পান। তার বউদিরা তাকে হাত ধরে টেনে-টেনে নিয়ে এল। আমার বড়-জা, মেজ-জা খানিকটা সময় রঙ্গ-তামাশা করে চলে গেল, থাকল সেজ-জা। সেজ-জার স্বামী, আমার সেজ ভাশুরঠাকুর এ-বাড়ির কর্তাদের খুড়তুতো ভাই। তিনি শুনেছি আজ দু-বছরের ওপর ঘর ছাড়া; তন্ত্রমন্ত্র, ধ্যানজ্ঞান করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেজ-জা আমার ফুলশয্যার বিছানায় আমার স্বামীকে নিয়ে বসে শুয়ে কত যে হাসি তামাশা করল, অমন আমি শুনি নি জীবনে। দেখলাম, আমার স্বামী তার সেজ বউদির খুব ন্যাওটা। আমি থাকলাম এক পাশে দাঁড়িয়ে, আর ফুলশয্যার ফুল চটকে, ঘরে দোরে ছড়িয়ে, বিছানা বালিশ এলোমেলো করে আমার সেজ-জা যখন চলে গেল তখন মাঝরাত। আমার স্বামীর তখন চোখ চেয়ে থাকার অবস্থা নেই। আমায় শুধু দরজা বন্ধ করে বাতিটা নিবিয়ে দিতে বলল। এতকাল আমি বাতি নিবিয়েছি আঙুল ঘুরিয়ে কিংবা ফুঁ দিয়ে। আজ নেবালাম সুইচ টিপে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখলাম গঙ্গার বুকে কালো আকাশটা ভেঙে পড়েছে, ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, আমার সারা গা কেমন শিউরে উঠছিল। আমার স্বামী আমায় ডাকল, জড়ানো গলায়। যে-স্বরে ডাকল, যে-ভাষা দিয়ে ডাকল সেই স্বর সেই ভাষা আমার একুশ বছরের জীবনে প্রথম শোনা। দু-চোখ ভরে জল এল।

আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। হঠাৎ মনে হল, দরজার বাইরে আমার সেজ-জা খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা প্রথম দিনেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবু আমি বুঝি নি। একেবারে নতুন মানুষ, জলের মাছ ডাঙায় পড়ে ছটফট করেছি। কাউকে কিছু বলার সাহস আমার হয় নি। সকাল থেকে ঘটার অন্ত ছিল না; ননদ এসে শাড়ি জামা বেছে দিত সকালের, ঝি নিয়ে যেত কলঘরে স্নান করাতে, চুল খুলে তেল মাখিয়ে দিত, স্নান সারা হলে শায়া-শাড়ি-জামা পরে পট হয়ে বসে থাকতে হত জায়েদের ঘরে। সেজ জায়ের ঘরে আমায় সে ডাকত না। বিকেলে আবার আর-এক প্রস্থ সাজগোজ; গা ধুয়ে চুল বেঁধে,

খোঁপায় বাহারী কাঁটা গুঁজে, আলতা পরে আমি—মোহিনী—ছাতে উঠে গঙ্গার জল দেখতাম, ননদরা কত কিসের গল্প করত, মেজ-জা এসে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সেজ-জায়ের নানা কাহিনী শোনাত। সে-সব শুনলে গা ঘিনঘিন করে। মেজ-জা আমায় বলেছিল, সেজ একদিন মরবে, হয় নিজেই গলায় দড়ি দেবে না হয় তাকে গুলি খেয়ে মরতে হবে।

আমাকে নতুন-নতুন [illegible]তে পট করে সাজিয়ে রাখলেও আমি যে পট নই মানুষ এটা আমার স্বামী বুঝতে পারল। গ্রাহ্য করল না।

ওদের পৈতৃক ব্যবসা কলকাতার জাহাজ ঘাটায়। আমার বড় ভাশুর সাত সকালে ম্যানেজারবাবুকে সঙ্গে করে গাড়ি চড়ে বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন সন্ধ্যে নাগাদ। মেজ ভাশুর যেতেন বেলায়, তাঁর শুনেছি সারাটা দিন কাটত উকিল ব্যারিস্টার করে। আর আমার স্বামী স্নান খাওয়াদাওয়া সেরে কলকাতায় নিজেদের অফিসে যেত হিসেবপত্তর কাজ করতে। দেওর ছিল একটি, কলেজে পড়ত। বাড়ির মধ্যে ওকেই দেখেছি খানিকটা মানুষের মতন। ওকে অন্য জায়েরা নাম ধরে ডাকত, আমি ডাকতাম ঠাকুরপো বলে।

স্বামীর সঙ্গে এই যে আমার অবনিবনা এটা সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ছিল, কিন্তু কেউ কিছু বলত না। বাড়িটার চাল-চলন ছিল ওই ধরনের। মেয়েরা স্নান করবে, খাবেদাবে, সাজবে, পান খাবে, বিন্তি খেলবে, পুজো আর্চাতে থালা ভরে মিষ্টি আর সিঁদুর পাঠাবে ঠাকুরবাড়িতে, গল্পগুজব করবে, স্বামী এলে মাথায় কাপড় দিয়ে ঘরে যাবে জুতো জামা এগিয়ে দিতে—ব্যস ওই পর্যন্ত। তার বেশী ঘরের মেয়েদের কাছে আর কিছু পুরুষরা চায় না। পুরুষরা ছিল নিজেদের মতন, তাদের মাথায় ব্যবসা, [illegible] চিন্তা, টাকার হিসেব। অবসরে যা করত তাকে ওরা ভাবত, আভিজাত্য।

আমার স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে ভেঙেচুরে যাচ্ছে এটা কেউ নজরে আনল না, আমলও দিল না। আমার জায়েরা ভেবেছিল ওটা আমার সয়ে যাবে। আমার কিন্তু সইলো না, একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল।

সবচেয়ে অসহ্য হল সেজ-জা। তার নাম ছিল রেবতী। ভগবান তাকে কতখানি রূপ দিয়েছিল জানি না, তবে তার নাক ছিল অসম্ভব টিকোলো, খাড়া, চোখ ছিল পালকের মতন টানা-টানা, তাকাতো যেন জাদু করে ফেলছে, ঘাড়মাথা তুলে হাঁটত যখন মনে হত সাপের ফণা দুলছে। আমার সেজ-জার বেশবাস দেখলে মনে হবে, তার বাপের বাড়ি থেকে রোজ বুঝি তত্ত্ব আসছে। আমার স্বামীর সঙ্গে নানান খেলা ছিল তার; একটা খেলা ছিল, দু-জনে পাশাপাশি বসে গায়ের রঙ মেলাত। হাতের রঙ, পায়ের রঙ, বুকের রঙ। মিথ্যে বলব না, আমার সেজ-জার গায়ের রঙ আমার চেয়েও ময়লা ছিল। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। সে ছিল আমার স্বামীর চোখে ঝোলো আনা।

একদিন দেখি তার ঘরে বসে আমার স্বামীকে দিয়ে কাঁধের ব্যথা সারাচ্ছে, গায়ে আঁচল নেই। গায়ের কাপড় বরাবরই সে আগোছালো করে রাখে, হাঁটতে

চলাতে লুটিয়ে যায়। আমার চোখে আচমকা আরও অনেক কিছু পড়েছে, কিন্তু সেদিন আর সহ্য হল না, রাত্রে স্বামীকে বললাম, 'আমি মার কাছে যাব।'

স্বামী বলল, 'হঠাৎ?'

বললাম, 'এখানে ভাল লাগছে না।'

'ওখানে এখন গরম। বৃষ্টি পড়লে যেও।'

'না।'

'না কিসের?'

'আমি যাব।'

'আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আমার স্বামী বলল, 'তোমার মরজি মতন চলার জন্যে আমি বিয়ে করি নি।'

রাগে আমার মাথা যেন জ্বলে উঠল দাউদাউ করে; বললাম, 'তোমার মরজি মতন চলবার জন্যে আমিও আসি নি।'

আমার স্বামী যেন কিছু একটা হিসেব করল, তারপর তার পায়ের চটিটা ঘরের চৌকাটের বাইরে পা দিয়ে ছুঁড়ে দিল। বলল, 'এ বাড়িতে মেয়েছেলেদের মরজি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না?' বাকিটা আর মুখে বলল না, চোখ দিয়ে চৌকাট দেখিয়ে ইশারা করল।

আর একদিন দেখি আমার সেজ-জা তার ন্যাওটা দেওরের মুখে দু-খিলি পান গুঁজে দিয়ে হেসে হেসে বলছে: 'তোমার দাঁতগুলো আমায় দেবে গো, আমারগুলো পানে-পানে কালো হয়ে গেল।'

আমার স্বামী উদার গলায় বলল, 'নিয়ে নাও।'

'তারপর?'

'তারপর কিসের কী?'

আড় চোখে আমায় দেখিয়ে সেজ-জা বলল, 'তোমার বউ ফোগলা বর নিয়ে করবে কী? গালে হাত চাপা দিয়ে শোবে?'

'আমার স্বামী ইতরের মতন হাসতে হাসতে বলল, 'ওর কথা তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি আগে, ও পরে।'

সেজ-জা তার আহ্লাদটা আমায় দেখাবার জন্যে তার দেওরের হাত টেনে নিয়ে দোলাতে লাগল, হেসে-হেসে গাইল: 'তুমি আমায় দেখি দাও না ফাঁকি, তুমি যে আমার পোষা পাখি...।' তার সমস্ত অঙ্গভঙ্গি এত নোংরা যে আমার গা ঘিনঘিন করে উঠল। ঘর ছেড়ে চলে এলাম। বাইরে এসে কী হল কে জানে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। মেজ-জার ঝি বুঝি দেখতে পেয়েছিল, ছুটে এল।

স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙেই গিয়েছিল, তবু টেনে-টেনে পুজো পর্যন্ত শ্বশুরবাড়িতে থাকতে হল। পুজোর সময় নিজের বাড়িতে ফিরে এসে আমি আর ও-বাড়ি ফিরে গেলাম না। ফিরে যাবার জন্যে আমার বড় ভাশুর যে-চিঠি লিখেছিলেন তার জবাব দিয়েছিলেন জ্যাঠামশাই। আমার স্বামী আমায় একটা চিঠি দিয়েছিল, তার জবাব দিয়েছিলাম আমি। দু-পক্ষের আদান-প্রদান

সেখানেই শেষ। তারপর আর কোনো যোগাযোগ হয় নি। আজ প্রায় পনেরো বছর এইভাবেই কেটে গেল। যা ঘটে গিয়েছিল তার কোনো চিহ্ন আমি রাখি নি। বরং ওই কয়েকটা মাসের স্মৃতিকে এমন জঞ্জালে ফেলে রাখতে চেয়েছি যেখান থেকে খুঁজে বের করাও যেন সম্ভব না হয়।

আমার জীবনের এই গল্পটুকু আমায় সে-সময় যতখানি নাড়া দিয়েছিল আজ আর তা দেয় না। বাবা, মা, জ্যাঠামশাই—কারও ওপর আমার রাগ নেই, দুঃখ নেই। আমার ভাগ্যে যা ছিল ঘটেছে।

আমার সেই একুশ বছর বয়সের স্বামী রাজেশ্বর হয়ত বেঁচে আছে। তার সেই সেজ বউদির কী হয়েছে তাও আমার জানতে ইচ্ছে হয় নি। আমার ছোট দেওর একটা চিঠি লিখেছিল একবার, সে আজ পাঁচ-সাত বছর হয়ে গেল, লিখেছিল বিলেত থেকে, ডাক্তারী পড়তে গিয়েছে বলে জানিয়েছিল। কোনো সম্পর্ক না থাক, তবু আমার ভাল লেগেছিল শুনে। একজন তবু বাড়িছাড়া হল।

একটা কথা ঠিকই, আমি যদি চাইতাম শ্বশুরবাড়িতে আমার অধিকারটুকু রাখতে পারতাম। কিন্তু সে-অধিকার রেখে লাভ কী? তাতে আমার খাট-পালঙ্ক, ঘরদোর, শাড়িজামা, অলঙ্কার, ঝি-দাসীর ওপর অধিকারটুকুই থাকত, তার বেশী কিছু নয়। আমার স্বামীকে আমি পেতাম না। সে তার সেজ-বউদির কাছে নিজেকে ষোলো আনাই বিকিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত নোংরামির মধ্যেও একটা জিনিস বোধহয় ছিল, ওরা পরস্পরকে ভালবাসত। মানুষের এও এক বিচিত্র মতিগতি।

আমার মার মনে-মনে একটা আপসোস ছিল। মা ভাবত: আমি যদি নিজের জায়গা না ছাড়তাম তবে শেষ পর্যন্ত আমি জিতে যেতাম।

মা ভাল করে ভাবলে বুঝতে পারত, আমি হারজিতের খেলা খেলতে শ্বশুরবাড়ি যাই নি। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে এ-খেলা আমায় খেলতে হবে কেন? পুরুষ-মানুষ ভোলাবার খেলাই যদি খেলব তবে হোম-যজ্ঞের পাট করে অচেনা-মানুষকে বিয়ে করেছিলাম কেন?

আমি যে-বাড়ির মেয়ে সে-বাড়িতে এমন খেলা খেলতে তোমরা শেখাও নি, মা। তোমরা যা নিয়েছ মন-প্রাণ দিয়ে নিয়েছ, যাঁরা তোমাদের নিয়েছেন—মান মর্যাদা মমতা কর্তব্য দিয়েই গ্রহণ করেছেন। আমার অমন জ্যাঠাইমা—যার কোনো কিছুতেই তেমন কোনো গা ছিল না—সেই জ্যাঠাইমাও দেখেছি, জ্যাঠা-মশাইয়ের খাওয়ার আসনটি নিজের হাতে পাট করে তুলে রাখত, জ্যাঠামশাইয়ের চশমাজোড়া নিজের আঁচল দিয়ে মুছে দিত, আদার রস দু-ফোঁটা মধু দিয়ে গরম করে আমায় দিত, বলত: 'যা, তোর জ্যাঠামণিকে দিয়ে আয়, গলাটা ধরা-ধরা লাগছিল সকালবেলায়।'

তোমরা আমায় যে-বাড়িতে পাঠিয়েছিলে মা, সে-বাড়ি বড় অদ্ভুত। সেখানের চালচলনের সঙ্গে আমাদের বাড়ির চালচলনের কোথাও কোনো মিল

নেই। ওদের হাবভাব, কথাবার্তা, ওঠাবসা একেবারে আলাদা। আমি জলের মাছ, ডাঙায় গিয়ে পড়েছিলাম। ওখানে আমায় মরতে হত। আমার স্বামী আমাকে আঙুল দিয়ে গঙ্গা দেখিয়ে দিয়েছিল। গঙ্গার জলে আমার ভক্তি হয় নি। না মরে আমি আমার জায়গায় ফিরে এসে বেঁচেছি।

আমি যা করেছি তার জন্যে আমার দুঃখ নেই, অনুশোচনা নেই। যা ঘটে গেছে সেটা আমার ভাগ্য।

জ্যাঠাইমা ছেলেবেলায় আমায় বলত, আমাকে শিবের মতন বর এনে দেবে। অমন নিঃস্ব, নির্লোভ, নিশ্চিন্ত পুরুষ আমার তখন পছন্দ হত না। আজ ভাবি; তেমন পুরুষ আমার সামনে এসে দাঁড়ালে আমি তার গলায় মালা দিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে বাঁচতাম।

বাড়ির ফটকে আলো পড়ল আচমকা, গাড়ির শব্দ হল। বেহুঁশ ভাবটা কাটল আমার। তাকিয়ে দেখি, আয়নারা আসছে। আয়না, সুহাস, জ্যাঠামশাই। জ্যাঠামশাইকে হয়ত পথ থেকে তুলে নিয়েছে ওরা। কিন্তু ও কে?

এখন জ্যোৎস্না উঠে গেছে। চেনা বলে মনে হল মানুষটিকে। কিন্তু এতদূর থেকে স্পষ্ট করে বুঝতে পারছিলাম না।

ওরা বাগান দিয়ে বাড়ির দিকে আসছিল। গল্প করতে করতে। ওদের সঙ্গের মানুষটিকে দেখার জন্যে আমি অপলকে চেয়ে থাকলাম।

নীচে নেমে দেখি, শচিদা এসেছে। অনেক দিন পরে শচিদাকে দেখলাম। চেনাই দায় এখন, কদম ফুলের মতন চুল করেছে মাথার, চোখমুখ ফ্যাকাশে, রোগা হয়ে গেছে বেশ। দেখলেই বোঝা যায়, বড় রকমের অসুখ-বিসুখ থেকে ভুগে উঠেছে সবে। অবাক হয়ে বললাম, "এ কী চেহারা করেছ তুমি শচিদা?"

জ্যাঠামশাই কাছে ছিলেন না; সুহাস হেসে বলল, "শচিদা এবার স্বামী শচিদানন্দ হবে।"

মাথা নেড়ে শচিদা বলল, "দূর! আমি এখন শচূপাতিজী।"

আয়না খিলখিল করে হেসে উঠল। আমরাও হাসলাম।

শুনলাম, জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আশ্রমে দেখা হয়ে গিয়েছিল শচিদার। জ্যাঠামশাইকে বাড়ি পৌঁছে দিতে আসছিল ও, পথে রেল-ফটকের সামনে সুহাসদের সঙ্গে দেখা। এইটুকু পথ গাড়ি করে ফিরেছে।

আমি ঠাট্টা করে শুধোলাম, "তুমি কি আশ্রমে এসে উঠেছ?"

হাসিমুখে শচিদা বলল, "না। আমার একটা কাজ ছিল আশ্রমে।"

বেশীক্ষণ বসল না শচিদা। তিন জায়গায় বাস বদল করে সত্তর-আশি মাইল পথ ঝাঁকুনি খেতে-খেতে এসেছে আজই দুপুরে, শরীরটাও ভাল না; আয়না সরবত করে এনে দিয়েছিল, সেটুকু খেয়ে উঠে পড়ল। সুহাস শচিদাকে টেনে নিয়ে গেল তার বন্ধু অবিনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। আলাপ সেরে শচিদা যখন ফিরছে, আমি তখন বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে।

ফটক পর্যন্ত শচিদাকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "তুমি এখন কিছুদিন এখানে আছ তো?"

"এখন থাকব। কতগুলো কাজ রয়েছে।"

"কাল পরশু আসছ এদিকে?"

"আসব কাল। সুহাস পরশু কলকাতা ফিরে যাচ্ছে শুনলাম। ওর সঙ্গে ক'টা কথা বলব।"

শচিদা চলে গেল। ফটক বন্ধ করে আমি ফিরলাম।

সকালে আজকাল কার মুখ দেখে উঠছি কে জানে, দিনগুলো বড় খারাপ যাচ্ছে। ওদিকে অবিন আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে, এদিকে আবার শচিদা এসে মনটা কেমন দুঃখ দিয়ে ভরিয়ে দিল।

জ্যাঠামশাই আর সুহাস আজ একসঙ্গে খেতে বসল। আয়নাকে পাঠালাম অবিনকে হালকা কিছু খাইয়ে আসতে। জ্যাঠামশাই সংসারের পাঁচ রকম কথা-বার্তা বলছিলেন সুহাসকে। সে তেমন কিছু বোঝে না; বুঝতেও চায় না। মাথার ওপর যে-ক'দিন জ্যাঠামশাই আছেন তার কোনো চিন্তা নেই; তারপর তো দিদি রয়েছে—, সুহাসের মাথা ঘামাবার যেন কোনো দায় নেই: সে বেশ নিশ্চিন্ত। তার কথাবার্তা শুনলে সেই রকম মনে হয়। আয়নার বিয়ের কথাটাও উঠল আবার। জ্যাঠামশাই চিঠি লিখে দিয়েছেন। জবাবটা আসুক, তারপর অন্য কথা। সুহাস যেন কলকাতায় গিয়ে খবরাখবর করে। স্পষ্ট করে না বললেও বোঝা গেল, জ্যাঠামশাইয়ের কলকাতার ওপর ভক্তি তেমন একটা নেই; হুড়োহুড়ি করে বিয়ে দিতেও তিনি রাজী নন; সব রকম খোঁজখবর না করে তিনি আর এ-বাড়ির মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন না। আয়নার বয়স বেড়ে যাচ্ছে, পঁচিশে পড়বে এবার, তা পড়ুক; এখনও হাতে আছে, হাত থেকে একবার পড়ে গেলে আর তো তোলা যাবে না। জ্যাঠামশাইয়ের ভয়টা বোঝা যায়। আমিও বুঝি। আমরা হলাম ঘরপোড়া গরু; সিঁদুরে মেঘে আমাদের বড় ভয়।

সংসারের পাট চুকলো একে-একে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেছে সকলের। কমলাদি হেঁসেল তুলে ঘরদোর বন্ধ করে দিল। ফটকে তালা দিয়ে এসে কার্তিক বসার ঘরটা বন্ধ করে শুতে চলে গেল। জ্যাঠামশাই শুয়ে পড়েছেন। আয়না তার ঘরে গুনগুন করে গান গাইছিল, আর তার গলা শোনা যাচ্ছে না; দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল বোধ হয়। একটু আগে সুহাসকে দেখেছি সিগারেট খেতে-

খেতে বারান্দায় পায়চারি করছিল, আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না। শুতে চলে গেছে। আমার ইচ্ছে হয়েছিল, সুহাসকে ডেকে জিজ্ঞেস করি, নিজেদের বাড়ির কথা সে বাইরে বলতে গেল কেন? কিন্তু কেমন করে কথাটা তুলব ভেবে পেলাম না। সুহাস যদি বলেও থাকে, আমার কানে সে-কথাটা উঠেছে শুনলে ভীষণ লজ্জা পাবে ও; যদি না বলে থাকে অবাক হবে, দুঃখ পাবে, বন্ধুর ওপর মনঃক্ষুন্ন হবে। তা ছাড়া সুহাস হয়ত ভাবতে পারে, আমার সঙ্গে অবিনের এমন কি ভাব-সাব হল, যাতে এ-কথাটা উঠতে পারে! ও যে কী মনে করবে—কী ভাববে—বুঝতে না পেরে আমি আর ওকে ডেকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেলাম না।

এ-বাড়ির আর কোথাও সাড়া নেই। শেষ সাড়া দিয়েছিল টোপর। বার কয়েক ডেকে সেও ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়িটা স্তব্ধ। অন্ধকার। আমার ঘরে আমি একলা জেগে জেগে রাত সোয়া এগারোর মেল গাড়িটার গুমগুম শব্দ শুনলাম। রেল লাইন থেকে টিলা পেরিয়ে, গাছপালা মাঠ-ময়দান ছাড়িয়ে শব্দটা বাতাসে ভেসে ভেসে আমার কানে এল, তারপর মিলিয়ে গেল। আবার সেই নিঃসাড় নিঃঝুম ভাব চারপাশে থমথম করে উঠল।

কাল আমার সারাটা রাত চোখে ঘুম ছিল না। অবিনের মাথার পাশে কত যে উদ্বেগ নিয়ে বসে ছিলাম! আজও আমার ঘুম পালিয়েছে। বাইরে পরিষ্কার জ্যোৎস্না ফুটে চারপাশে থিতিয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে আলোটা চোখে পড়ে। আমার ঘরের জানালায় পা দিতে মাঝরাত।

অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে যতই মনে করি, দূর ছাই—নিজেকে নিয়ে আর কত ভাবব, ভাবনাটুকু এবার শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ি, ততই দেখি আমি আমার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি। ভালও তো লাগে না আর। এ বড় জ্বালা হল।

আমার যে আজ কী হল কে জানে, আমি ছত্রিশ বছরের মোহিনী নিজের জীবনের নানা বয়সের নানা রকমের মোহিনীকে দেখতে লাগলাম। এক-এক সময় মনে হচ্ছিল, আমি আলাদা মানুষ যেন, আর মনের মধ্যে যে-মেয়েটা কত রকম ভাবে আসছে-যাচ্ছে সেও আলাদা। আমরা দুজনে এক হয়েও এক নই, সে দেখাচ্ছে—, আমি দেখছি।

ওই তো দেখতে পাচ্ছি, ন-দশ বছর বয়সের সেই মোহিনীকে; সকাল বেলায় গরম কাপড়ের পুরো হাতা ফ্রক পরে, বাইরে রোদে পড়তে বসেছে, কিঙ্করবাবু এসেছেন পড়াতে, বইয়ের পাতায় তার আঙুল নেই, চোখ বাগানে, তার খরগোস দুটো গাঁদা ঝোপের পাশ দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল, আর ফিরে আসে না। কোথায় গেল দুটোতে? চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দেখছি, খুঁজছি, কিঙ্করবাবু হেসে বললেন, 'তোকে আমি পারব না, মনু; কাল থেকে পড়ার সময় তোর খরগোসের বাক্সটা এখানে এনে রাখবি। আমি পাহারা দেব।' খরগোশ দুটো মাঠ চরে আবার ফিরল তো চক্ষের পলকে ঘরের মধ্যে উধাও। সুহাসটা গরম জামা কাপড় পরে তার ট্রাই সাইকেল চালিয়ে বেড়াচ্ছে, ঘণ্টি

বাজাচ্ছে; আমার যেন কত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে পড়ায়, চট্ করে উঠে গিয়ে তাকে চোখ রাঙিয়ে কান টেনে দিয়ে পালিয়ে এলাম। সুহাস হয় বিকট করে চেঁচিয়ে উঠল, না হয় তার সাইকেলটা এনে আমার চেয়ারে গোঁতাতে লাগল।

আমার তখন গোলগাল ফুটফুটে চেহারা শুনেছি! মাথায় তেমন বাড় হয় নি। জ্যাঠামশাই এক-একদিন আমায় ভোর বেলায় তিন প্রস্থ জামা পরিয়ে মাথা ঢাকিয়ে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন, হাসপাতালের মাঠে বস্তার জামা পরানো গরু থাকত দাঁড়িয়ে, কাঠকুটোর আগুন জ্বলত, দুধ দুইতে বসত গরুঅলারা। আকাশটা পাখিতে-পাখিতে ভরে যেত, হিমেশিশিরে সব ভেজা। গঙ্গার দোকান থেকে গরম জিলিপি কিনে জ্যাঠামশাই আমায় খাওয়াতেন, তারপর স্টেশন হয়ে আমরা ফিরে আসতাম।

সেই ছোট্ট মোহিনীকে আমি আজ দেখতে পাচ্ছি। তার চারদিকে আদর, সুখ, নির্ভাবনা ছড়ানো। দিদির কর্তৃত্ব ফলাবার জন্যে রয়েছে সুহাস। তারপর এল আয়না। আমার বড় পুতুলের চেয়ে খানিকটা বড়সড়, চৌকাটে দাঁড়িয়ে ওকে দেখে আমার সে কী ঘেন্না। ও আবার মানুষ নাকি?

একদিন আমি আয়নার নাক টিপে দিয়েছিলাম। আমার কোলে শুয়ে বমি করেছিল। মা, জ্যাঠাইমার সে কী বকুনি। মা বলল, 'কী রাক্ষুসী মেয়ে তুই, হিংসেয় মরে যাচ্ছিস।' জ্যাঠাইমা বলল, 'দাঁড়া, এবার থেকে ওর কাঁথা তোকে দিয়ে কাচাবো রোজ, ছোট বোনকে অত ঘেন্না কিসের রে পোড়ারমুখী!'

বয়সটা দেখতে-দেখতে তেরো চোদ্দয় পৌঁছে গেল। তখন কিন্তু আমার মাথায় বেশ বাড় হয়েছে। জ্ঞানগম্যি হয়েছে অনেকটা। আয়নায় নিজের মুখ দেখে খুশী হতে শিখেছি। জ্যাঠাইমা টেনে-টেনে চুল আঁচড়ে বিনুনি করে দিত, বলত, মাথার চুল লম্বা হবে। আমি ঘিনঘিন করতাম, কপালের গোড়া জ্বালা করত। জ্যাঠাইমা বলত : 'করুক জ্বালা। মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, কপালে কত জ্বালা জমা হয়ে আছে রে মুখপুড়ী; বর জ্বালাবে, ছেলে-মেয়ে জ্বালাবে —তখন কী করবি?' মনে মনে ভাবতাম, জ্যাঠাইমা যদি শিবঠাকুরের মতন একটা সিদ্ধি খাওয়া জটাপটা ঝোলানো বর এনে দেয় তবে আমি তার মজাখানা দেখাব। ভাবলেই হাসি পেত।

আমার সুখ, হাসি, নিশ্চিন্ত জীবনের মধ্যে প্রথম দুঃখ এল সেই কিশোরী বয়সে। জ্যাঠাইমা মারা গেল। মণি-মা চলে যাবার পর দেখলাম, আমাদের বাড়িতে এমন একটা দুঃখের ঢেউ আছড়ে পড়েছে, যার হাত থেকে আমরা কেউ নিষ্কৃতি পাচ্ছি না। তার আগে আমি দুঃখ জানি নি, মৃত্যু বুঝি নি। দাদু মারা গিয়েছিল আমার তিন বছর বয়সে। ঠাকুমাও গিয়েছে আরও আগে, মা তখন এ-সংসারে আসে নি; জ্যাঠাইমা বুঝি সবে এসেছে। দাদু চলে যাবার দুঃখটা আমার জানার কথা নয়, বোঝার কথাও নয়। জ্যাঠাইমা আচমকা চলে যাবার পর মনের কোথায় যেন চিড় ধরে থাকল।

তারপর দেখি, আমি হুহু করে বেড়ে উঠেছি, যেন বর্ষার জলে দেখতে-

দেখতে বাড় হয়ে যাওয়া কলাগাছ। মা আমার বিয়ের জন্যে তাগাদা শুরু করল, বাবাকে। বাবা বোধ হয় আমাকে নজর করে দেখল, ভাবল : তার এমন মোহিনী মেয়েকে কোথায় মানাবে।

বাবার ভুল হয়েছিল কিনা আমি জানি না। আমার জন্যে বাবা বনেদী, বড় পরিবার খুঁজেছিল; সুন্দর সুশ্রী জামাই খুঁজেছিল; সুখ সৌভাগ্য খুঁজেছিল। হয়ত আমিও তাই চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার ভেতরে-ভেতরে যে-মোহিনী বেড়ে উঠেছিল সে হয়ত আমার বাইরের মোহিনী নয়, সে বোধ হয় কোনো যোগিনী। আমার জ্যাঠাইমার মতন সে শান্ত, কেমন যেন উদাসীন, আহ্লাদে গলে পড়া পুতুল নয়, তার মায়া আছে, মমতা আছে, ভালবাসা আছে। আবার সে আমার মার মতন, ঘরসংসারের মানুষ, মার মতন কর্তৃত্ব চায়, প্রেম ভক্তি নিষ্ঠা দিয়ে সকলের আপন হতে চায়।

আমার বিয়ে হল। দেখলাম, বাবা আমার বাইরের জন্যে যা এনেছে, কড়ায়-গণ্ডায় মিলিয়ে এনেছে। কিন্তু ভেতরের জন্যে এক কণাও আনে নি। আমার স্বভাব চরিত্র শিক্ষা যা কিছু সবই আমার বাড়ির মধ্যে গড়ে উঠেছে। আমি সেই পরিবারের মেয়ে, যারা দু-পুরুষ ধরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, যারা মানুষের কাছে নিজেদের গুণে শ্রদ্ধা ভালবাসা পেয়েছে। আমাদের আভিজাত্য ছিল হৃদয়ের, মানুষের আর কোনো আভিজাত্য আমার দাদু স্বীকার করে নি। জ্যাঠামশাই তো নয়ই।

শ্বশুড়বাড়িতে যে-ক'মাস থেকেছি, আমার গা শুধু রিরি করেছে। ঘৃণা, বিরক্তি আর রোষ। অসহায়ের মতন সহ্য করেছি, অবস্থাটা, কখনো মনে হয় নি : ওই স্বামী আমার। তার সঙ্গে আমার একঘরে থাকতে হয়েছে, একই বিছানায় শুতে হয়েছে—এই সব বাধ্যবাধকতা ছাড়া আমার সঙ্গে তার কোনো বন্ধন ছিল না। আমার কলঙ্ক সেইটুকু, তার বেশি কিছু নয়।

নিজের ফেলে যাওয়া জায়গায় আবার ফিরে এসে আমি গ্লানির হাত থেকে বাঁচলাম। তারপর এই বাড়িতে আমার জন্যে ধীরে ধীরে যে-জায়গাটি পাকা হয়ে গেল তার দায়-দায়িত্ব কম নয়। মা আমার হাতে আস্তে-আস্তে সব কর্তৃত্ব ছেড়ে দিল সংসারের, বাবা আমায় সব দায়-দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইল, জ্যাঠামশাই আমার ওপর ভরসা করে বেঁচে থাকল। আমার মার বুকের অসুখ হয়েছিল, ডাক্তার বলল, সাবধান থাকতে। মাকে নিয়ে বাবা গেল রাজগীরে, সেখান থেকে সাসারামে। ফিরে এলে দেখলাম, মার আর কোনো পরিশ্রমই পোষায় না। মার বরাবরের ছুটি হয়ে গেল সংসার থেকে। আমি বসলাম মার জায়গায়। একদিন মাঝরাতে মা বুকের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে যেন নীল হয়ে গেল। চলে গেল ভোর রাতের দিকে। সুহাস তখন কলকাতায় পড়ে। বছর কুড়ি বয়েস। আয়না কিশোরী। আমাদের সংসারের ভাঙার পালা যে শুরু হয়ে গেছে এবার তা বোঝা যাচ্ছিল। জ্যাঠাইমাকে দিয়ে শুরু হয়েছিল, আমি ছিলাম মাঝে, তারপর গেল মা। শেষে বাবা। গত বছর।

জ্যাঠামশাইও যে আর বেশি দিন আছেন এমন মনে হয় না। ছোট ভাই চোখের সামনে থেকে চলে যাবার পর তাঁর বুক ভেঙে গেছে। এখন যাবার দিন গুনছেন। আয়নার বিয়েটা দিয়ে যেতে পারলে যেন তাঁর শান্তি হয়। সুহাসের জন্যে আমায় তিনি রেখে যাচ্ছেন।

নিজের জীবনের ছত্রিশটা বছর যখন পুরোপুরি তাকিয়ে দেখি, তখন মনে হয়, আমার গল্পটা সমস্ত জীবন জুড়ে, তার এখনও শেষ হয় নি। কবে আমি রাঙা চেলি পরে বিয়ের কনে সেজে ছাদনাতলায় বসে ছিলাম, সিঁদুর শাঁখা পরে জোড়ের গিঁট নিয়ে শ্বশুড়বাড়ি গিয়েছি, তারপর ফিরে এসে সিঁথি পরিষ্কার করে নিয়েছি—এটাই শুধু আমার গল্প নয়। আমার গল্প আমার দাদুকে জড়িয়ে, এই বাড়ি জড়িয়ে, আমার মা, জ্যাঠাইমা, বাবা, জ্যাঠামশাই, ভাই-বোন সকলকে জড়িয়ে। আমি আমার আত্মীয়-জনের সঙ্গে, আমাদের সুখদুঃখ, আনন্দ বেদনার সঙ্গে মিশে আছি। সেই মিশে থাকার মধ্যে আমার জীবন। অবিন কি তা জানে? জানে না। সে শুধু আমার এক আনা জানে, বাকি পনেরো আনার খোঁজ রাখে না।

মনে হল, অবিনের চোখের সামনে থেকে পালিয়ে এসে, তাকে এড়িয়ে গিয়ে আমি ভুল করেছি। সে যত বড় অবিনই হোক, আমি মোহিনী—আমার ভয়টুকু সে শুধু দেখেছে, সাহসটুকু দেখে নি; জানেও না। যদি অবিন আমায় বিরক্ত করে আবার, সে আমায় আমার মতন করে জানতে পারবে।

পরে দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি বেলা হয়ে গেছে। শরীরে অবসাদ ছিল। ভাবলাম, একেবারে স্নান সেরে সংসারের কাজে হাত দেব।

স্নান সেরে বেরিয়ে দেখি বুলা এসেছে। আয়নার ঘরে বসে কথা বলছিল।

ডেকে বললাম, "কিরে, তুই হঠাৎ এখন?"

বুলা বলল, "জ্যাঠামশাইয়ের কাছে এসেছিলাম। মা পাঠিয়েছিল।"

"ওষুধ-টষুধ নিতে নাকি?"

"না; পোস্ট অফিসে কিসের যেন গণ্ডগোল হয়েছে।" বলে বুলা তার হাতের ময়লা পাস বইটা দেখাল।

"দেখা করেছিস?"

মাথা হেলিয়ে বুলা বলল, "হ্যাঁ। জ্যাঠামশাই আমায় বসতে বললেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে পোস্ট অফিসে যাবেন।"

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললাম, "কাল সুহাস তোদের ওখানে যায়নি?"

মৃদু গলায় বুলা বলল, "গিয়েছিল।"

তারপর আমি চুপ। চুল আঁচড়ে চিরুনিটা রেখে বুলাকে দু মুহূর্ত দেখলাম। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। বুলার মুখটি আমার বড় ভাল লাগে। অমন মায়ামাখা মুখ এখানে আর বড় দেখি না কারও। ওর গায়ের রঙ শ্যামলা। আগে লাবণ্যের অভাব ছিল না; এখন যেন সেটা মরে আসছে। বয়সটাও বাড়ছে যে। তার ওপর অভাব-অনটন, আধিব্যাধি নিয়ে সংসারে ডুবে

যাচ্ছে। বাবা নেই, মা আর ওরা দুটি ভাইবোন। বুলা আর বাবলা। বাবলা আজকাল বাস অফিসে কাজ করছে।

সুহাসের ওপর আমার বড় রাগ হয় মাঝে-মাঝে। বুলাকে তুই একদিন যে-চোখে দেখেছিলি সেই চোখ তোর কেন নষ্ট হয়ে গেল? তুই বুঝি এই সাদামাটা মেয়েটার মধ্যে চোখ ভোলানোর মতন আর কিছু খুঁজে পেলি না। কে জানে! শহরে থাকতে-থাকতে তুই বড় শহুরে হয়ে গেলি সুহাস। তোর চোখ পালটে গেল।

"বুলি?"

"উঁ?"

"চা খাবি?"

"না, মনুদি। আমি বাড়ি থেকে চা খেয়ে বেরিয়েছি।"

"খেয়েছিস তো বেশ করেছিস।...চল, আমিও চা খাব।"

বুলাকে সঙ্গে নিয়ে খাবার ঘরে এলাম। কমলাদি চা আনছে। মুখোমুখি বসে কী যেন জিজ্ঞেস করব ভাবছি, হঠাৎ বুলা বলল, "শচিদা এসেছে জানো, মনুদি?"

"জানি, কাল সন্ধ্যেবেলা আমাদের এখানে এসেছিল।"

"আজ সকালে আমাদের ওদিকে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। মার সঙ্গে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গল্প করল অনেকক্ষণ। কেমন চেহারা হয়ে গেছে দেখেছ?"

"বড় কোনো অসুখবিসুখে ভুগেছে।"

"কী অসুখ জানো?"

"না; কিছু বলল না। আজ এখানে আসবে বলে গেছে।"

আর একটু বসে চা খেয়ে বুলা চলে গেল। জ্যাঠামশাই ডাকাডাকি করছিলেন। আজ সকাল থেকে রোদের তেজ নেই। আকাশে মেঘের ভাব আছে। সকাল থেকেই চাপা গুমট।

কিছুক্ষণ বসে-বসে শচিদার কথা ভাবলাম। আমাদের মতন শচিদারাও এখানকার তিন পুরুষের বাসিন্দে। এক সময় না ছিল কী, এখন কিছু নেই; শুধু শচিদা আর তিন পুরুষের ভিটেটুকু। সামান্য জমিটমি হয়ত এখনও আছে, কিন্তু সেসব আর হাতে পাওয়ার মতন নেই।

জানলা দিয়ে একটা চড়ুই ঢুকে পড়ে ছিল। ঢুকেই তার কী মনে হল—একটা পাক খেয়ে বেরিয়ে গেল আবার।

উঠলাম। বসে থাকার সময় এখন নয়। সংসারের তদারকিটুকু সেরে নিয়ে অন্য কাজ।

রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর ধুয়ে, কমলাদির সঙ্গে কৌটোবাটা নেড়ে একসময় গেলাম অবিনের খোঁজ করতে। মনে হল, ওটা আমার গার্হস্থ্য কর্তব্য।

ঘরে ঢুকে দেখি অবিন বসে-বসে বইয়ের পাতা উলটোচ্ছে। তার বিছানার ওপর গোটা দুই মোটা-মোটা বাঁধানো পত্রিকা। হাতে একটা অন্য বই। অবিন

চেয়ারে বসে, তার পা বিছানার ওপর তোলা।

আমায় দেখে অবিন পা নামিয়ে নিয়ে বলল, "সকালে বসে-বসে পরলোকের চিন্তা করছিলাম, হঠাৎ দেখছি আমার চোখের সামনে ইহলোক।" বলে বইটা দেখাল।

দেখলাম, বইটা পরলোকের কথাটথা হবে। আমাদের বসার ঘরে বইয়ের আলমারিতে বাবা জ্যাঠামশাইয়ের আমলের বইটই আছে, বাঁধানো পুরনো কাগজটাগজও রয়েছে এখনও। হয় অবিন নিজে ঘেঁটে-ঘুটে নিয়ে এসেছে, না হয় আয়না এনে দিয়েছে।

অবিনের হাতের বইটা আমার চেনা। মা মারা যাবার পর বাবার কেমন আত্মা-আত্মা বাতিক হয়েছিল। বইটা বাবা আনিয়েছিল কলকাতা থেকে। পড়ত আর মাঝে-মাঝে ঘর বন্ধ করে কী ভাবত কে জানে। জ্যাঠামশাইয়ের নানা কথায় বাবার সে-বাতিক কেটে যায়।

অবিনের কথাটা আমার কান এড়িয়ে গেল না। আমি কি তার ইহলোক? যেন শুনি নি এমন ভাব করে বললাম, "এসব টেনেটুনে কে বার করল?"

অবিন বলল, "আপনি বড় ফ্যাসাদে ফেললেন। পরলোক জিনিসটা এমনই যে তাকে টেনেটুনে বার করতে হয়।"

ভাবলাম বলি, তুমি তো ইহলোককেও টেনেটুনে বার কর। কে জানে তোমার স্বভাবটাই ওইরকম কিনা।

অবিনকে আজ মোটামুটি ভাল দেখাচ্ছে। কালকের শুকনো ভাবটা অনেক কমে এসেছে মনে হল।

অবিন হেসে বলল, "এই বইটা পড়তে-পড়তে আমার মনে হচ্ছিল, মানুষের আত্মাটা বেশ স্বার্থপর, শৌখিন। যে তাকে আগলে থাকে সেই বেচারা শরীরটাকে চিতায় পুড়তে দিয়ে মহাত্মাটি পালায়।"

আমার আত্মায় কাজ ছিল না। বললাম, "বইটা আমার বাবার।"

"নাম লেখা দেখলাম।"

দেরাজের মাথাটা দেখতে লাগলাম। ওষুধের শিশিতে এখনও দু-এক দাগ ওষুধ পড়ে আছে। কয়েকটা ফুল রয়েছে একপাশে, অবিন নিজে ছিঁড়ে এনেছে, না আয়না রেখে গেছে কে জানে।

আজ সকালে অবিনের ওষুধ খাওয়া হয়েছে কিনা বুঝতে পারলাম না। অবিন কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টি থেকে সেটা বুঝে নিল। ইঙ্গিতে বোঝাল, তার ওষুধ খাওয়া হয়ে গেছে।

কথা বলার কিছু না পেয়ে আমি বললাম, "সকাল থেকে সুহাসকে দেখতে পাচ্ছি না। গেল কোথায়?"

"স্টেশনের দিকে বোধ হয়।"

"ও।"

"শচিপতিবাবুর বাড়িও হতে পারে।"

অবিনের দিকে তাকালাম। "শচিদা আজ এ-বাড়িতে আসবে বলেছে।"
হাতের বইটা বিছানায় ফেলে দিল অবিন। "আপনি কোন সময়টায় বসেন?"
কথাটা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।
অবিন কেমন হাস্যকর চোখ করে আমায় দেখছিল। তারপর বলল, "কাল সন্ধ্যেবেলায় দেখলাম দাঁড়িয়ে থাকলেন, আজও দেখছি দাঁড়িয়ে।"
ঠাট্টাটা বুঝতে পারলাম। বললাম, "এখন কি আমার বসার সময়? কাজকর্ম ফেলে এসেছি। কাল আবার সাত সকালে সুহাসের যাওয়া। তার জিনিসপত্র কোথায় কি ছড়িয়ে রাখে! কেচেকুচে গুছিয়ে রাখতে হবে।"
অবিন হেসে বলল, "আপনি নিজেই শুধু দাঁড়িয়ে থাকলেন, ভাইকে এবার দাঁড়াতে দিন। সুহাসটা বরাবর আপনাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।"
"ও তো বাইরে থাকে।"
"তবু অভ্যেসটা ঘরের।"
"তাতে আর খারাপ কী!"
"ভালই বা কোথায়! ও নাবালক হয়ে থাকল।"
হেসে বললাম, "কত নাবালকই তো আছে, ওর একলায় দোষ কী!"

দুপুরের ঘুম ঘুমিয়ে হাই তুলতে-তুলতে সুহাস আমার ঘরে এসে বসল। জল খেল। বালিশ দুমড়ে মাথার তলায় রেখে এ-গল্প সে-গল্প। কাল সকালে চলে যাবে, আজ দিদির সঙ্গে খানিকটা আদুরেপনা না করলে তার চলে না। ভাবছিলাম, বুলার কথাটা একবার বলি।
হঠাৎ সুহাস বলল, "দিদি, অবিন এখনও তেমন জুত পায় নি মনে হচ্ছে।"
আজ অবিন ভাত-পথ্যি করেছে; কাল যাবে। অতখানি জ্বরের ধাক্কা একদিনে সামলানো সম্ভব নয় জানি কিন্তু কলকাতায় না গিয়ে করবে কী?
সুহাস নিজেই বলল, "ও আরও দু'চার দিন থেকে যাক।"
কথাটা শুনে আমি অবাক হয়ে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সুহাস বলছে কী? তার পরেই মনে হল কথাটা এমন কিছু অসম্ভব নয় যে, আমি হাঁ করে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি। সুহাসের অবর্তমানে তার বন্ধুদের কেউ কি এ-বাড়িতে থাকে নি দু-চারদিন? কমলেশ থেকেছে, বিভূতি বলে একজন এসেছিল, ছবি আঁকে, সেও ছিল।
ওদের থাকার সঙ্গে অবিনের থাকা যে এক নয় সেটাই বা আমি কেমন করে সুহাসকে বোঝাব?
কোনো রকমে বললাম, "ওর কাজকর্ম রয়েছে না?"
সুহাস হেসে বলল, "ওর আবার কাজ! অফিসে যাওয়া ছাড়া ওর আর কাজ কী! আমি ওর অফিসে একটা খবর দিয়ে দেব।"

আমার কপালটা কেমন ধরে গেল আচমকা। বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম। সুহাসের ওপর রাগ হচ্ছিল। অবিনের এখানে থেকে যাওয়া আমার কাছে যে কী তা আমি কেমন করে বলব ওকে? কোন মুখে ছোট ভাইকে বলি : 'তুই ওকে নিয়ে যা। ও বড় সর্বনেশে। ওর জন্যে আমার মনের স্বস্তি গেছে, শান্তি গেছে, ঘুম গেছে।'

আমার মুখে কথা ফুটল না।

অবিন

মানুষের দাঁত ওঠার দুটো পর্ব থাকে। আমি বলি, প্রথমটা অ-যোদ্ধা কাণ্ড, পরেরটা অরণ্য কাণ্ড। রামায়ণের অযোধ্যার সঙ্গে এর তফাত রয়েছে যে সেটা বোঝাই যায়। আমাদের দেহখানি যিনি গড়েছিলেন তাঁর একেবারে মুদির দোকানের হিসেব, পাই পয়সা ভুল হবার উপায় নেই। অমন হিসেবী ভদ্রলোকের এত বড় ভুলটা কেন হল? আমার তো কোনো কালেই মনে হয় নি, এটা ভুলের ব্যাপার। পায়ের রক্ত মাথায় উঠে আসার সময় মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্বটা যাঁকে মাথায় রাখতে হয়েছে, তিনি অনর্থক আমাদের মাড়িতে দু-দুবার দাঁত গজাবার ঝঞ্ঝাটটা বাঁধিয়ে রাখবেন এমন তো মনে হয় না। যে-চোখ নিয়ে জন্মাই সে-দুটো খসে গিয়ে আবার আমাদের চোখ গজায় না। যে-নাক দিয়ে প্রথম বাতাসটা নিই এ-জগতের, সেটা আজন্মকাল বহাল থাকে। এই সংসারে জন্মে যে-ধাক্কাটা খেয়ে হৃৎপিণ্ড চলতে শুরু করল সেটা যখন থামল আমিও থামলুম। যা নিয়ে এ-জগতে আসা যদি তার কোনোটাই আর অদল-বদলের দরকার না থাকে, স্বাভাবিক বৃদ্ধি ছাড়া তার রূপান্তর না হয়—তবে এই তিরিশ-বত্রিশটা দাঁত নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? আমার এক বন্ধু—যে রোজ গণ্ডা দুয়েক দাঁত তুলে তুলে বিখ্যাত হয়ে গেছে, সে বলেছিল : 'ওহে অবিন-বাবু, দাঁত নিয়ে কেউ জন্মায় না, ওটা পরে গজায়।' জবাবে আমি বলেছিলাম, 'তুমি শুধুই ডেণ্টাল, একেবারেই মেণ্টাল নও। মায়ের পেট থেকে পড়েই কারও চোখ ফোটে না, হাত পা খেলাতেও দু-দিন সবুর করতে হয়। তোমার যুক্তি কোন যুক্তি নয়।' আমার মনে হয় না, মানুষের শরীরেও ওই হতভাগ্যরা পরে এসেছে বলে তাদের উঠতে সময় দিয়ে আবার ফেলে দিতে হবে। নতুন করে একদলকে ডাকতে হবে। আমার বন্ধুদের আমি দাঁত ওঠার এই দুটো পর্বের তাৎপর্যটা বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কিছুতেই কেউ বুঝল না। তাদের হাজারবার করে বলেছি, তোমাদের ভগবানের মোটেই ইচ্ছে নয়, তোমরা দুধ ভাত, শাকসবজি, মাছের ঝোল খেয়ে চিরকাল বেঁচে থাকো। পরের দাঁতগুলো তাই হাড় চিবোবার জন্যে গজিয়ে ওঠে। মানুষ-মানুষ করে তোমরা যতই লাফাও, তুমি জীব, তোমার পশুত্ব কে খণ্ডাবে? তোমার মধ্যে হিংস্রতা থাক এটা তোমাদের বিধাতার অভিপ্রায়।

সুহাস দম ফাটিয়ে হাসে আর বলে : 'তা হলে, অবিন—তুমি এখন অরণ্য কাণ্ড নিয়ে আছ?' আমি বলি : 'আমি একলা কেন, আমি তুমি আমরা সকলে।'

আমার বন্ধুরা বরাবরই ধরে নেয়, আমি যা বলি সেটা আমার মুখের কথা। তার বাহার আছে, বাস্তবতা নেই। সুহাস আমায় খোঁচা মেরে বলে: 'দেখো অবিন, তোমার কথাবার্তা শুনে আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, এই যে কথাগুলো তুমি বলো, শুনলে মনে হয় তুমি যেন ফ্রেমে বাঁধিয়ে বলছ। কথা বাঁধাবার দোকান থাকলে ভাই, সত্যি বলছি, তোমায় বলতুম দোকান দাও, দু-দিনে কপাল ফিরে যাবে।'

কথাটা ঠিক নয়। সুহাসরা যতই ঠাট্টা করুক, আমি এখন পর্যন্ত না বাঁধিয়েছি দাঁত, না বাঁধিয়েছি কথা। দুটোই আমার মোটামুটি সোজা। দুটোই বেশ পরিষ্কার।

সুহাসদের আমি বলেছি: 'তোমরা কী ভাব, আমি ঝুটোর কারবার করছি? তা যদি করতাম তবে দেখতে আমার দোকানের নাম হত অবিন জুয়েলার্স।'

'জুয়েলার্স কেন?'

'ঝুটো বেচতে সুবিধে হত। তোমরা হলে সেই মনুষ্য-সমাজের বংশধর যাদের কাছে ঝুটো চলে। পাঁচসিকের কাচ, পাঁচশো টাকায় বেচে দেওয়া যায়।'

'যে বেচে সে আবার ধরাও পড়ে।'

'কদাচিৎ।'

মানুষের স্বভাব হল, সে যতটা মিথ্যে শেখে, সত্যটা তত শেখে না। আমি আমার বন্ধুদের আর শেখাতে যাই না। ওরা শিখবে না। ওদের মাথায় পনেরো আনা মিথ্যে রয়েছে, যেটা ওরা অভ্যাস করে ফেলেছে।

সেদিন মোহিনীকে বললাম, "আমি সুহাসের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে না গিয়ে আপনাকে মুশকিলে ফেলেছি।।"

মোহিনী বিব্রত বোধ করে মাথা নেড়ে বললেন, "না না, তা কেন হবে?"

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, উনি আসল ফেলে ঝুটো তুললেন। তুলে এমন ভাব করলেন যেন তিনি আসলটাই তুলেছেন।

আমি বললাম, "দেখুন, আমি অকপটে বলছি; কলকাতায় ফিরে যাবার মতন শরীর আমার পটু ছিল; কিন্তু মনটা ছিল না। কয়েকটা দিন আমি নিস্তার পাবার জন্যে থেকে গেলাম।"

মোহিনী ভাবলেন আমি বুঝি ভদ্রলোকের মতন একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করছি। উনি বললেন, "সে তো ভালই হল।"

ভাল যে হয় নি তা তো আমি বুঝতেই পারছি। সুহাস চলে যাবার পর দুটো দিন কেটে গেছে। আজ তৃতীয় দিন। আমি হয়ত কাল কিংবা পরশু সকালে কলকাতায় ফিরে যাব। মোহিনী আমার সঙ্গে এই দু-তিন দিন—সুহাস চলে যাবার পর থেকে—সাক্ষাৎ যোগাযোগ বড় একটা রাখেন নি। আমি তাঁর মনের ভয়টা অনুমান করতে পারি। তাঁর ধারণা হয়েছে, আমি—অবিন মানুষটি—বর্বর। আমার হিতাহিত জ্ঞান নেই।

তিনি আর অপেক্ষা করলেন না, চলে গেলেন।

আমার মনে হল, তিনি চান না আমি তাঁর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করি।

মোহিনী আমায় তাঁর তরফ থেকে যেটুকু বোঝার সেটুকুই বুঝতে পেরেছেন, বাকিটা নয়। আমি যখন বলি—এ-বাড়ির দুঃখটুকু আমি অনুভব করতে পারি তখন শুধু তাঁর কথা ভেবে বলি না। সুহাসদের পরিবারে তিনি একমাত্র মানুষ নন, জ্যাঠামশাই রয়েছেন, সুহাস আছে, আয়নাও। আমি গণৎকার নই, দৈবজ্ঞ নই; সুহাসদের পরিবারের ইতিবৃত্ত আমার ধ্যানে বসে জানা সম্ভব নয়। যেটুকু শুনেছি, সুহাসের মুখেই শুনেছি। এখানে এসে দেখলাম, এ-বাড়িতে এরা সবাই মশারির চালের খুঁটের মত চারদিক থেকে চালটাকে ঝুলিয়ে রাখলেও এদের দিক আলাদা, চার কোণের চারটি মানুষও আলাদা। যেমন, সুহাসকে ধরা যাক, সুহাস তার নিজের বাড়িতে যখনই আসে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নিয়ে আসে। আমার মনে হয়েছে সুহাস তার বন্ধুদের শুধুই বেড়াতে নিয়ে আসে না। এখানে এলে সে কোথাও যেন একটা অদ্ভুত শূন্যতা অনুভব করে। সে এই শূন্যতার মধ্যে ডুবে যাবে, এমন ভয় তার বিলক্ষণ। আমার তো মনে হয়, সুহাস সেই শূন্যতা থেকে পালিয়ে বেড়াবার জন্যে কলকাতার বন্ধুদের ধরে আনে। সে এখানে—এই বাড়ির দুঃখের মধ্যে—ধরা পড়তে চায় না। সুহাসের সঙ্গে আমার যতটুকু কথাবার্তা হয়েছে ওর পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে তাতে আমার এই রকমই ধারণা। জ্যাঠামশাইকে দেখে শুনে আমার মনে হয়েছে তিনি তাঁর মনের সবটুকু এ-বাড়ির মধ্যে দিতে চেয়েছেন অথচ দিতে পারেন নি। তাঁর আধখানা চোখে পড়ে, বাকি আধখানা চাঁদের উলটো পিঠের মতন চিরটা কালই এই সংসারের চোখের বাইরে থেকে গেল। সুহাসরা তাদের দেখা আধখানাকেই পুরো বলে জেনে নিল। আমি এ-বাড়ির ... পর্যন্ত এ-সবই খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। আমার যে ... তা কেন হবে?" না এমন কথা আমি বলি না, ভুল হতেও পারে, তবে ... টো তুললেন। তুলে আমার ধারণা।

কলকাতায় ফিরে যাবার

মোহিনী চলে গেলে আমি খানিকটা পরে বাইরে ... না। কয়েকটা দিন আমি এক পরমাশ্চর্য ঘটনা ঘটল। আমার কাছে এটি প্রায় পেয়ারাতলায় বসে সুহাসদের বাড়ির বাঁধানো ... মতন একটা কৈফিয়ৎ খাড়া খণ্ডের পাতা উল্টে দেখছিলাম। হঠাৎ দেখি ঠাকুরাণী শ্রীমতী পুণ্যবালা দাসী হিন্দুধর্মে ন... পারছি। সুহাস চলে যাবার পর হয়ে পা গুটিয়ে মাথায় কাপড় দিয়ে বসে আ... আমি হয়ত কাল কিংবা পরশু অর্জনটুকু আমার কাছে বেশ কৌতুককর লা... যাবার আগে এই দু-তিন দিন— ঠিক যে কতটা আমার জানা নেই, কিন্তু ...লো, বড় একটা রাখেন নি। আমি আড়ষ্ট বলে মনে হল। যার দু-একটি ... । তাঁর ধারণা হয়েছে, আমি—আমিন আছে। স্বচক্ষে তা দেখার সৌভাগ্য আমার নেই।

হয়ে দেখি আমার মার অতি ক্ষুদ্র একটি পদ্য হিন্দু ধর্মের সাতগজী প্রবন্ধের তলায় কৃপাবশে স্থান পেয়েছে। শ্রীমতী পুণ্যবালার পদ্যর নাম 'আমি থাকি নিজ মনে'।

আমার মার মনের কথাটি ভাববার চেষ্টা করছি এমন সময় আয়না এসে বলল, "অবিনদা, আপনার চিঠিপত্র কী আছে দিন, কার্তিকদা বাজারে যাচ্ছে পোস্ট অফিসে দিয়ে আসবে।" আয়নাকে আমি আমার মার লেখা পদ্যটা দেখালাম।

আয়না অবাক চোখ করে দেখল, বলল, "এ কে?"

বললুম, "আমার মা।"

আয়না যেন আকাশ থেকে মাটিতে পড়েছে, তার চোখের পাতা আর পড়ে না। তারপর হঠাৎ সে আমার হাত থেকে বইটা টেনে নিয়ে বলল, "কী কাণ্ড! দাঁড়ান দিদিকে দেখিয়ে আসি।"

আয়না তরতরিয়ে ছুটল। আমি পেয়ারাতলায় বসে থাকলাম। হঠাৎ মনে হল মোহিনী যদি কোন পদ্য লেখেন তারও কি নাম হবে 'আমি থাকি নিজ মনে!

আমার দুটো চিঠি ছিল। আয়না ঘরে এসে নিয়ে গেল। যাবার সময় হাসতে হাসতে বলল, "দিদি কী বলল জানেন?"

"কী?"

"বলল, তোর অবিনদার মা পদ্য লিখতেন বলে ছেলের কথাবার্তা বলার ধরনটা ওইরকম হয়েছে।"

আমি ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলাম, "আমার ধরনটা কেমন?"

আয়না বলল, "সে একটা আছে। দিদিই ভাল বলে। আমি বাপু বলছি না।"

"বলেই ফেলো। তোমার পেটে কথা থাকবে না।"

হেসে ফেলে আয়না বলল, "দাঁড়ান, আমি আসছি; কার্তিকদা দাঁড়িয়ে আছে, চিঠিগুলো দিয়ে আসি।"

আয়না চলে গেল।

অনেকের দেখেছি অতীত নিয়ে আতিশয্য থাকে; যা পুরনো তা নিয়ে তারা বড়-বড় নিশ্বাস ফেলে, হায়-হায় করে। ওরা হল, আমাদের বিজনের মতন। আমাদের বিজন তার ঠাকুরদার আমলের একটা শাল রেখেছে, শীতের

সময় এক-আধ দিন উৎসবে-ব্যসনে গায়ে চাপায়, আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে, শালের বয়সটা আশি বছর। আমি বলি, দেখ বিজন, তোর বয়েস প'য়ত্রিশ, তুই আশি বছরের শালটা ভাঁজে-ভাঁজে গায়ে চাপিয়ে প্রমাণ করছিস, বাকি প'য়তাল্লিশটা বছর তুই ধার করেছিস। তোর মাথায় তোর ঠাকুরদার টাকপড়া খুলি, তোর চোখের জায়গায় তোর ঠাকুরদার পিচুটিভরা চোখ দুটো লাগিয়ে দিলে কেমন মানাবে বল? বিজন খেপে গিয়ে আমায় গালাগাল দেয়। আমি হাসি। যা পুরনো আমি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে বলি না, কিন্তু পুরনোকে মাথায় তুলে কেত্তন গাইতে আমার ইচ্ছে করে না। আমার কাছে অতীতটা অন্যরকম। তার ওপর আমার কৌতূহল আছে, তা নিয়ে আতিশয্য নেই! ভাবলে দেখি, আমার নিজের অতীতটাই দামে কমে যাচ্ছে। নিশীথরা শেয়ার-বাজার করে বেড়ায়; তাদের মুখে শুনেছি—ওদের অনেক শেয়ার-টেয়ার বছরের পর বছর শুধু পড়তির মুখে যায়। আমারও সেই অবস্থা; যত দিন যাচ্ছে ততই দেখছি দাম পড়ে যাচ্ছে। মানুষ তার অতীত একেবারে ডাহা লোকসানে, এমন কি বিনিদামেও বেচতে পারে না। মুশকিল ওইখানে। ঝাঁকা মুটের মতন তাকে অতীতটা বইতে হয়, অথচ বয়ে বেড়ানোটা অনেক সময় একেবারেই অকারণ, অর্থহীন। এই যে আমার মা শ্রীমতী পুণ্যবালা দাসীর পদ্যটা আমি দেখলাম, এতে আমার বিস্ময় হল, কৌতূহল হল, খানিকটা কৌতুক বোধ করলাম। তা বলে অভিভূত হলাম না। মার পদ্য লেখার ব্যাপারটা আমি যেন সস্নেহে প্রশ্রয়ে একটিবার দেখে নিয়ে অন্যদিকে চোখ ফেরাতে চাইলাম। চোখ ফেরাতে গিয়ে মোহিনীর অবস্থাটি আমার মনে এল। দেখলাম, তিনিও 'নিজ মনে' এ-বাড়িতে বসে দিব্যি রয়েছেন।

মোহিনীর মধ্যেও বিজনদের মতন একটা আতিশয্য আছে অতীত নিয়ে। কথাবার্তা থেকে বুঝেছি, এ-বাড়ির ওপর তাঁর মায়া এবং মোহ প্রবল। তিনি এর বন্ধনে জড়িয়ে গেছেন। ময়রার দোকানের মাছির মতন তাঁর অবস্থা।

আয়না আবার ফিরে এল। এসে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। তার হাতে কাজকর্ম বিশেষ থাকে না। আমার কাছে এসে বসে প্রায়ই, গল্প করে। তার কাছ থেকে আমি নানারকম সংবাদ পাই, এ-বাড়ির, বাইরের, তার নিজের।

ও বলল, "দিদি কী বলে জানেন?"

"জানবার আশায় বসে আছি, বলো।"

আয়না গাল ভরতি করে হাসল প্রথমে; তারপর বলল, "দিদি বলে, আপনার কথাবার্তা বলার ঢঙটা হল, মেয়েদের সাজগোজ করে বিয়ে বাড়িতে যাবার মতন।" বলে আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

মনে-মনে মোহিনীকে প্রশংসা না করে পারলাম না। তুলনাটা ভাল। সুহাসরা যে বলে আমি ফ্রেমে বাঁধিয়ে কথা বলি তার চেয়ে এটা সজীব এবং সরস। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "তোমার দিদিকে বলো, আমি জব্দ হয়েছি।"

আয়না হাসল, আমিও হাসলাম।

হাসি থামলে আয়না তার পিঠের বিনুনি বুকের কাছে টেনে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগল। তারপর আচমকা বলল, "অবিনদা আপনার মা দেখতে কেমন ছিলেন?"

"আমার মতন নয়।"

"আহা! বলুন না।"

"আমার মা মোটামুটি দেখতে ছিল। ছোটখাটো মানুষ, গায়ের রঙ আমার চেয়ে পরিষ্কার। খুব নিরীহ। পান খেত খুব।"

"আপনার সঙ্গে কোনো মিল নেই?"

"না। বড় জোর নাকটা।" এই বলে হেসে নাকটি দেখালাম আমার।

আয়না হাসি-হাসি মুখ করল। বলল, "আপনি আপনার বাবার মতন দেখতে?"

মাথা নেড়ে হেসে বললাম, "না; আমি আমার মতন।"

"আমাদের—আমি আর দাদা অনেকটা মার আদলের; দিদি নাকি ঠাকুমার মতন। আমার ঠাকুমা খুব সুন্দরী ছিলেন।"

আয়না তার বিনুনিটা খুলে ফেলল। খুলে ফেলে আঙুল দিয়ে আঁচড়ে-আঁচড়ে গোছা করল। হঠাৎ বলল, "আপনার মা স্বর্গে যাবার সময় আপনার বয়েস কত?"

মারা যাবার বদলে আয়না বলল স্বর্গ। কথাটা আমার কান এড়াল না। এটা তার এ-বাড়ির শিক্ষা। দুঃখের কথা, অপ্রিয় কথা এরা কখনো সরাসরি বলে না। সুহাসকেও দেখেছি এখনও তার কথায় কোথাও যেন একটা সৌজন্য রয়েছে।

আমি হেসে বললাম, "আমার মা স্বর্গে গেছে কিনা তা তো জানি না। তবে নামটা যখন পুণ্যবালা তখন ওদিকের টিকিটই কাটা আছে।"

আয়না ভ্রূকুটি করে বলল, "আপনি যেন কী! মা নিয়ে কেউ ঠাট্টা করে না।"

"আমি আবার ঠাট্টা করলাম কোথায়?"

"যাক্ গে, যা জিজ্ঞেস করলুম, বলুন। আপনার তখন বয়েস কত?"

"মা মারা যাবার সময় আমার বয়েস বছর বারো তেরো হবে।"

"মাত্র!" আয়না সহানুভূতির চোখে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে।

আয়নাকে দেখেশুনে, ওর কথাবার্তা থেকে আমার মনে হয়েছে, বয়স হিসেবে ও পরিণত নয়। ওর যা বয়েস সেটা মেয়েদের পক্ষে বেশ পরিণত হয়ে যাবার মতন। অন্তত সাংসারিক দিক থেকে। আয়না তা নয়। এখনও তার মধ্যে ছেলেমানুষী থেকে গেছে অনেকটা। এ-বাড়িতে সে সবার ছোট, সকলের তত্ত্বাবধানে মানুষ। তাকে যেন এরা স্বাভাবিক বাড় বাড়তে দেয় নি। জ্যাঠামশাই, সুহাস আর মোহিনী মিলে আয়নাকে টবের ফুলগাছ করে রেখেছে,

মাটিতে বসতে দেয় নি। তার পরিণামে এই হয়েছে, আয়না তার চারপাশে হাত-পা ছড়িয়ে মেলতে পারছে না। এতে তার কতটুকু ভাল হয়েছে আমি জানি না।

আয়না বলল, "জানেন অবিনদা, আমার এখনও মাঝে-মাঝে মার জন্যে মন কেমন করে।" বলে সলজ্জ হাসল।

হেসে বললাম, "আমারও করে।"

"যাঃ!"

কথাটা ঠাট্টা করে বললেও এর মধ্যে একটা সত্য ছিল। এক সময়ে, আমার মনে হত, আমার মা সংসারে খুব নিঃসঙ্গ ও দুঃখের মধ্যে ছিল। এই নিঃসঙ্গ অবস্থাটাকে আমি নানাভাবে ভেবেছি। শেষ পর্যন্ত আমার মনে একটা ভাবনা এসেছিল। আমাদের দেশের মেয়েদের মনের ছাঁচটা আদ্যিকালে বুড়ো বাল্মীকির হাতে এমনভাবে গড়া হয়ে গিয়েছে যে, অন্য কোনো ছাঁচে ঢালা সম্ভব নয়। বাল্মীকি তবু বুঝি ভাল ছিল, অন্যরা আরও সর্বনাশ করেছে। ছাঁচটার সূক্ষ্ম মুখগুলো ভোঁতা করে ফেলেছে। সীতা-সীতা করে এ-দেশের মেয়েরা পাগল। নারীত্বের যা-কিছু মহিমা সব যেন সীতায় সার্থক। এক সময় আমি ঠাট্টা করে বন্ধুদের বলতাম, তোমাদের মহাকবির বংশধররা খুব বিচক্ষণ লোক; বেচারা রামকে যতই ভোগাক সীতাকে একেবারে জড়োয়া সেট করে ফেলেছে হে। যতরকম দামী পাথর পেয়েছে সব ঠেসে দিয়েছে ওই সেটে। আর আমাদের দেশের মেয়েরা বরাবরই অলঙ্কার-লোভী; তারা ওই অলঙ্কারটাই বেছে নিয়েছে। অথচ ওটা যে সর্বত্র সকলকে মানায় না তা জানল না।

পরিহাস যতই করি, একটা কথা আমি পরে ভেবেছি। নারীত্বের একটা শোকপর্ব আছে, যেখানে সে একা, নিঃসঙ্গ, নির্জনে বন্দী। বাল্মীকি সেটা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন। অশোকবনে সীতার অবস্থাটা একবার ভাবা যাক। এমন নিঃসঙ্গতা রামায়ণের আর কোথায় আছে? অন্য আর কে সয়েছে অমন একান্ত, নির্জন শোক? আমার বরাবরই ধারণা, কবি ইচ্ছে করলে সীতাকে অন্য কোথাও রাখতে পারতেন, রাবণের হর্ম্যটর্মের অভাব ছিল না। কিন্তু সীতাকে সেখানে মানাত না। কিংবা সীতাকে মানালেও তার সেই নিজস্ব শোকটুকু নয়। আরও একটু বাড়াবাড়ি করে ভাবলে দেখব, রাবনের অশোকবনে কোনো কিছুর অভাব ছিল না। সেখানে সর্বঋতুর ফুল একসঙ্গে ফুটত, সরোবর-টরোবর ছিল, হর্ম্যও ছিল বোধ হয়। তবু সীতাকে দেখি গাছতলায় পীতবসন পরে নির্জনে বসে-বসে অশ্রুপাত করতে। আমাদের সংসারে অশোক-বন নেই, তার বদলে মেয়েরা কাঁদে ঘরের কোণে বসে, ছাতে উঠে, না হয় নিরিবিলি অন্ধকার ঘরে বসে। স্বামী, পুত্র, গৃহ, অলঙ্কার থাকা সত্ত্বেও অনেক মেয়েরই কোথাও একটা শূন্যতা থাকে। সে যেন অতি বাঞ্ছিত কোনো কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। মাঝে-মাঝে এই বিচ্ছিন্নতা এমন করে চেপে ধরে যে, নিজের কোনো অজ্ঞাত বেদনায় তাকে কাঁদতে হয়। আমার মার অন্তত

তেমন দুঃখ ছিল। মার চারপাশে ছিল সংসার—সেখানে তার উগ্রতেজ স্বামী, মাথা-পাগলা ভাই, বেয়াদপ ছেলে, ঠাকুর-চাকর, ধোপা-নাপিত—আরও কত কী শোভা পেত; কিন্তু এই সংসারের মধ্যে মার নিজের একটি জগত ছিল, যা এ-সব থেকে বিচ্ছিন্ন, একান্ত। মা সেখানে নিঃসঙ্গ থাকত। কী যেন এক দুঃখ নিয়ে বাঁচত। আমি জানি, মা সেখানে নির্জনে বসে চোখের জল ফেলত। ওই যে মার লেখা পদ্য 'আমি থাকি নিজ মনে'—এ বোধহয় সেই নির্জন-বাসের কোনো কথা-টথা হবে।

এমন একটি দুঃখ মোহিনীরও আছে। আমি যদি কবি হতাম, তবে তাঁর একান্ত শোকপর্বটি নিয়ে একটি শোককাব্য রচনা করতাম।

আয়না আরও খানিকটা বসে থাকল। গল্প-টল্প করে চলে গেল। আমি বসলাম দাড়ি কামাতে।

শেষ দুপুরে শুয়ে-শুয়ে হাই তুলছি, দেখি মোহিনী আমার ঘরে এসেছেন। আমার ঘরে তিনি বড় একটা বসেন না, কিংবা বসলেও দেখি ওঠার জন্যে ছটফট করছেন। আজও ঠিক এসেই যে বসে পড়লেন তা নয়, কিন্তু বসার ভাব করলেন।

বললাম, "বসুন।"

মোহিনী বললেন, "বসছি। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম।"

আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

উনি যা বললেন তাতে মনে হল, আমি কলকাতায় ফেরার সময় একটা মোট বয়ে নিয়ে যেতে পারব কিনা, সেটা জানতে এসেছেন। অবশ্য মোটটা সূক্ষ্ম অর্থে জড় পদার্থ নয়। একজন বয়স্কা মহিলাকে আমি কলকাতায় বয়ে নিয়ে গিয়ে নীলমাধব শীল লেনে তাঁর বোনের বাড়ি পৌঁছে দিতে পারব কিনা?

বললাম, "পারব।"

উনি আমার যাবার সঠিক দিনক্ষণ জানতে চাইলেন।

"ভাবছি পরশু।"

"ভাবছি বললে কেমন করে হবে! পুষ্প কাকিমাকে বলতে হবে তো!"

"তাহলে বলুন, পরশু সকালে।"

"তাই বলে পাঠাব। তবে ওঁর খুব বিপদ, দিন পালটালে অসুবিধে হবে।"

"না, পরশুই যাব।"

মোহিনী এবার বসলেন। তাঁর গায়ের পাকা হলুদ রঙের শাড়ি আমার চোখে বেশ লাগছিল। আয়না সকালে বলছিল, তার দিদি ঠাকুমার মতন রূপ পেয়েছে। আমি সেই বৃদ্ধা মহিলাকে দেখিনি, কাজেই আমার কাছে ওটা বাহুল্য। যাঁকে দেখছি, তিনি চলিত অর্থে সুন্দরী নয়, বিশেষ অর্থেও।

আমি বললাম, "আপনি কোনো বিয়ে বাড়িতে যান না?"

উনি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। "কেন?"

"একবার দেখতাম।"

মোহিনীর চোখমুখ আরক্ত হয়ে উঠছিল। তার আগেই বললাম, "আয়না বলছিল, আমার কথাবার্তাকে আপনি মেয়েদের বিয়েবাড়ির নেমন্তন্নে যাবার মতন সাজগোজ করা বলেছেন। ভাবছিলাম, আপনার সাজটা যদি চোখে দেখতে পেতাম, আমার কিছু শিক্ষা হত।"

মোহিনী প্রথমটায় ঠিক ধরতে পারেন নি; পরে পারলেন। তাঁর চোখমুখের লালচে ভাবটা কেটে অপ্রস্তুত ভাব এল। বললেন, "আয়না যেন কী!"

"ও আমার গুপ্তচর।"

"তাই দেখছি।"

দুজনেই হাসলাম। মোহিনীর হাসি কখনও প্রবল হয় না। চড়াতেও ওঠে না।

আমি বললাম, "দেখুন, মানুষের কথা জিনিসটা তার বড় সম্পদ। পশুর সঙ্গে আমাদের পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু ওই কথার জায়গায় আমরা মেরে দিয়েছি। আমাদের সবচেয়ে বড় জিত হল, মুখে। মুখে আমরা জগত মারি।" বলে আমি হোহো করে হাসলাম।

মোহিনী পরিহাস করে বললেন, "সবাই আর পারে কই!"

"যারা পারে না তাদের জন্যে আমার দুঃখ হয়। অনেক সৌভাগ্যে যা পাওয়া গেছে, যা নিতান্ত আমার—তাকে আমি ভিখিরীর মতন থালা হাতে বাইরে বের করতে রাজী নই। ঘোড়ার পায়ে যদি খুরের শব্দ না বাজে তবে তার ছোটার অহঙ্কারটাই নষ্ট হয়ে যায়।"

মোহিনী হেসে বললেন, "লোককে দেখাবার জন্যে ঘোড়া ছোটে না।"

"না ছুটুক; তার ছোটা জানান দেয় সে ছুটছে।"

"তা হলে এই জানান দেওয়াটাই কাজ।"

"অবিন তো তাই মনে করে।"

মোহিনী কাঁধের কাপড় বাঁ হাতে গুছিয়ে নিলেন। তাঁকে এখন কিছুটা প্রসন্ন দেখাচ্ছে।

আমি বললাম, "জগতে বোবা হয়ে থাকাটা চরম দুঃখের। আপনি বোবা থাকুন এ যদি ভগবানের অভিপ্রায় হত তবে তিনি আপনার মুখে কথা দিতেন না।"

মোহিনী চুপ করে থাকলেন। তাঁর চোখ বলছিল, আমার কথার তিনি মূল্য দিচ্ছেন না আদৌ; শুধু কৌতুক অনুভব করছেন।

আমি হেসে বললাম, "আমি যদি বিধাতা হতুম, মানুষের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিতাম।"

"বেচারাদের দোষ?"

"তারা বাক্-শক্তির ব্যবহার জানে না। শতকরা নিরানব্বইটা লোক সংসারের

তুচ্ছ চাহিদা মেটাতে কথা বলে। এদের জন্যে বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ভাগের কথাগুলোই যথেষ্ট।"

মোহিনী মৃদু হাসলেন।

আমি বললাম, "আপনি যতটা নির্বাক, আর চেয়ে সবাক হলে আমি খুশী হতাম।"

উনি আমার দিকে চোখ তুলে বললেন, "অন্যকে খুশী করাই কি আমার কাজ?" মোহিনী যে বাঁকা করে কথাটা বললেন তা বোঝা গেল।

আমি বললাম, "আপনি হলেন সকলকে তুষ্ট করার জন্যে। আপনাদের এই সংসারে আপনার যে-চেহারাটি আমি দেখেছি তাতে মনে হয়, আপনি হলেন সর্বদেবের তুষ্টির জন্যে।"

মোহিনী বিরক্ত হলেন বোধ হয়। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে উঠে পড়তে পড়তে বললেন, "আমি তাহলে পুষ্প-কাকিমাকে খবর পাঠাই, পরশুদিন সকালে তিনি যেতে পারবেন।"

"হ্যাঁ, পাঠান।...আমার যাওয়াটা এখন একান্ত দরকার।" বলে আমি হাসি-মুখে মোহিনীর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

কী যেন ভাবলেন উনি; বললেন, "দরকারের কথা আমি জানি না। পুষ্প-কাকিমার জন্যে বলা। ওঁর বোনপো হাসপাতালে। বোনের কাছে যাওয়া দরকার। দেরী হলে উনি অন্য ব্যবস্থা করে নেবেন।"

"না না, আপনার কোনো দুশ্চিন্তা নেই; আমি যাব।"

মোহিনী ক'দণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাচ্ছিলেন এমন সময় শচিপতির গলা পাওয়া গেল।

শচিপতি আমার ঘরের দিকেই আসছেন।

মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় নতুন। ইতিমধ্যে বার দুই ঘোরতর সংঘর্ষ ঘটে গেছে। কিন্তু দেখেছি, শচিপতির ঢাল পুরু, তলোয়ারও একেবারে ভোঁতা নয়। কথা বলে তৃপ্তি আছে।

শচিপতি ডাকলেন, "অবিনবাবু।"

সাড়া দিয়ে বললাম, "আসুন।"

মোহিনী কেন যেন আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে একবার দেখলেন। তারপর চলে গেলেন।

ছেলেবেলায় আমার শিক্ষাগুরু ছিল রামদাস। বাবার অফিসের হেড পিয়ন। ওর মাথা ছিল খুব পরিষ্কার, জগতের যাবতীয় দুরূহ প্রশ্নের জবাব

তার ঠোঁটের গোড়ায় ঝুলত। রামদাস যা বলত, সবই প্রায় তার নিজস্ব আবাদ। খুব অরিজিন্যাল কথাবার্তা। স্মরণীয় চরিত্র। আমি তার গুণমুগ্ধ ছিলাম। আমার ভুগোল পড়ার বহর দেখে রামদাস আমায় দিন-রাত্রি হওয়ার রহস্যটা খুব সহজে বুঝিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, হনুমানজীর কাঁধে রামজীর ধনুকটা রয়েছে, তার সামনে ঝুলছে সূর্য আর পেছনে ঝুলছে চাঁদ। হনুমানজী আমাদের মাথার ওপর এলে দিন হয়, আর দূরে চলে গেলে অন্ধকার। যদি বলতাম, চাঁদ তো সব সময় ওঠে না; রামদাস জবাব দিত, কেমন করে উঠবে, চাঁদ হল চাঁদির জল, পূর্ণিমা হয়ে গেলেই সে দুধের মতন উছলে পড়ে, তখন তাকে চাপা দিতে হয়, উছলে পড়া ফোঁটাগুলো তারা হয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। আমার আর বলার কিছু থাকত না। সেই রামদাস আমায় একটা মহামূল্য উপদেশ দিয়েছিল; বলেছিল : কাকের রঙ কালো, হাঁসের পালক সাদা। চুন মাখিয়ে কাককে সাদা করতে যেও না, আর ভুষো মাখিয়ে হাঁসের পালককে কালো করার চেষ্টা করো না; কাক জলে ভিজবে, হাঁস পুকুরে নামবে, তাদের গায়ের রঙ আবার বেরিয়ে পড়বে। রামদাসের এই বাণীর মর্মার্থ তখন বুঝি নি, পরে বুঝেছি।

মানুষের মূর্খতার শেষ নেই। সে ভাবে, ভগবান তার হাতে সৃষ্টির চাবিকাঠি সঁপে দিয়ে বুড়ো বয়সে বিশ্রাম নিয়েছেন, এখন যা করার মানুষই করবে। লোকগুলো সরাইখানার কাছে হললা করে বলে, আরে ভগবান তো মরে ভূত। তার জায়গায় আমরা রয়েছি। মানুষ খোদার ওপর খোদকারি করতে বসেছে। কাকের রঙ পালটে দিচ্ছে, হাঁসের পালক কালো করছে। ভাবছে, জগতটা তারা পালটে দেবে। আমি বন্ধুদের বলি, তোমরা যতই কেন না হাঁক-ডাক করো, তোমাদের খোদকারি টেঁকসই হবে না। নির্বোধের মতন এখন নাচছ, পরে পস্তাবে।

শচিপতিকে আমি যতটুকু দেখেছি তাতে আমার ধারণা হয়েছে, উনিও খোদকারির দলে। সুহাসের মতন ঠিক নয়, তার চেয়েও আন্তরিক ভাবে। উনি হলেন আমার ঠিক বিপরীত। আমি মানুষকে পালটাতে চাই না, উনি সেটা চান। আমি বলি যে-ঘোড়ার মুখে লাগাম পোরা হয়নি—সে যথার্থ স্বাধীন ও মুক্ত। সে স্বাভাবিক। তার আনন্দ আছে। শচিপতি বলেন, বুনো ঘোড়া অবাধ্য, সংসারের কাজে তাকে খাটানো যায় না, লাগাম দিয়ে তাকে বাধ্য এবং বশীভূত করতে হয়।

আমি বুঝি না, এতে ঘোড়ার কোন্ মহৎ উপকার হল? মানুষের হয়ে বেগার খাটবার জন্যে তার জন্মানোর দরকার ছিল না। রেসের মাঠে যে-ঘোড়া ছোটে সে যতখানি তোয়াজ পায় তার চেয়ে বহুগুণ অর্থ কামায় মানুষ যারা তাকে ছোটায়।

শচিপতি আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারেন না; কিংবা গা করেন না। তাঁর কাছে মানুষ কাঁঠাল ফলের কোয়ার মতন, খোলার মধ্যে যখন জন্মেছে

তখন তার অদৃষ্টই হচ্ছে অন্যের ভোগ্য হওয়া।

কাল আমার সঙ্গে তাঁর ঘোরতর সংঘর্ষ হয়ে গেছে এইসব মতামত নিয়ে। আমি যত তীর ছুঁড়ি তিনি ততই ঢাল আড়াল করে পাশ কাটান। শেষে আমি বললাম, 'আপনি মশাই, ঢালের খেলাটা ভালই শিখেছেন।'

শচিপতি হেসে বললেন, 'আমি কিছু শিখি নি; আমার জ্ঞান-বুদ্ধি কম। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

বিকেল পড়ে গেল, শচিপতি আমায় নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। কথা ছিল, আজ তাঁর বাড়িটা দেখে আসব।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমি বললাম, "আপনার জমি-জায়গা বিক্রী হল?"

শচিপতি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার জমি-জায়গা বিশেষ কিছু নেই। অল্পস্বল্প যা ছিল অনেক দিন হল তা অন্যে ব্যবহার করছে।"

"আমি শুনেছিলাম আপনি আশ্রমের কাছে সস্তায় কিছু জমি বেচতে চান?"

"সুহাস বলেছে?"

"বলছিল।"

"আশ্রমের লাগোয়াই আমার বাড়ি। বিঘে দুই পোড়ো জমি আছে। ভাবছিলাম আশ্রমের কাজে লাগতে পারে। যদি ওরা কিনতে চায়, বেচে দিতে পারি। আমার কিছু টাকার দরকার।"

আমি হেসে বললাম, "ওরা যদি না কেনে আপনি মশাই তবু ওদেরই দান করে দেবেন। দান পেলে কেউ কেনে না। তা যদি দেন, আমাকেও দু-এক ছটাক দেবেন।"

শচিপতি মৃদু হেসে বললেন, "আপনি জমি নিয়ে কী করবেন এখানে?"

"পোলাট্রি করব। মুর্গী রাখব ভাল জাতের। আশ্রমের ভিটেয় মুর্গী ছেড়ে দেব।"

শচিপতি হাসলেন। আমিও হাসলাম গলা ছেড়ে।

খানিক পরে শচিপতি বললেন, "আমি এখানে মাস দু-চার থাকব। পুজো পর্যন্তও থাকতে পারি। কাজকর্ম আছে; শরীরটাও কাহিল হয়ে পড়েছে। আপনি যদি আবার কখনো আসেন আপনাকে আমি অনেকগুলো দেখার মতন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাব।"

হেসে বললাম, "বেশ তো, আসা যাবে।"

শচিপতির চেহারাটি চোখে পড়ার মতন নয়। এখন অবশ্য যে দশা হয়েছে তাতে রুগ্ণ মানুষ হিসেবে নজরে পড়ে। গায়ের রঙ ফ্যাকাসে, চোখ খানিকটা গর্তে ঢোকানো, কালশিরে পড়ার মতন কালচে দাগ রয়েছে চোখের তলায়। দৃষ্টি নম্র, শান্ত; খানিকটা যেন বিষণ্ণ। সুহাসদের মুখে শুনেছি শচিপতি একসময় সুদর্শন ছিলেন, আয়নাও বলেছে, শচিদা দেখতে সুন্দর ছিল। হয়ত

ছিলেন, আপাতত আর নেই। আমার ধারণা শচিপতির বয়েস বছর চল্লিশের সামান্য বেশি হতে পারে, আমাদের চেয়ে কিছুটা বড়, কিন্তু প্রথমে দেখলে আরও কিছু বেশি মনে হয়। মানুষটির মুখের কোথাও যেন দাগ লেগে গেছে, কিসের দাগ বোঝা যায় না। সাদা-মাটা মুখ, কপালটা চাপা। পিঠের দিকে সামান্য নোয়ানো। শচিপতির গলার স্বর, কথা বলার ধরনটি বড় ভাল। উনি কথা কম বলেন। শোনেন বেশী।

রাস্তা হাঁটতে-হাঁটতে শচিপতি বললেন, "আপনি কলকাতায় ফিরছেন কবে?"

"পরশু সকালে।"

"সুহাসের সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, আমি তার চিঠির অপেক্ষা করছি।"

চিঠির বিষয়টি আমার অজানা। তবু মনে হল, শচিপতি যেন কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন।

শচিপতির বাড়ি খুব কাছে নয়। পথ কমাবার জন্যে তিনি মাঠ, গোশালা, কবেকার এক পুরনো ভাঙা মন্দির, করাত কলের পাশ দিয়ে আবার সাবেকী রাস্তায় পড়লেন। আকাশের তলায় তখন গোধূলি জমেছে। অজস্র পাখি আসছিল টিলার মাথা ছাড়িয়ে।

শচিপতির বাড়ি পেঁৗছে দেখি, বারোয়ারী কুয়ায় জল তুলছে কারা, গণ্ডা খানেক কুকুর চেঁচাচ্ছে, একটা গরু যেন আস্তানা খুঁজছে রাত কাটাবার জন্যে। সামনের মাঠে নানা আগাছা, একটা কদমগাছ নিরিবিলি দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশনের দিক থেকে কয়লার ধোঁয়া আসছে ভেসে।

পুরনো বাড়িতে শচিপতি থাকেন না। থাকার মতন অবস্থাও বোধ হয় নেই। ভূতের বাড়ি হয়ে পড়ে আছে। জীর্ণ ভগ্ন। উত্তরের দিকে টালির চাল দেওয়া উঁচু ভিতের ছোট মতন একটা বাড়ি, সেখানেই থাকেন শচিপতি। কাঠ আর তারের বেড়া ছিল একসময়, তার গায়ে লতানো গাছ বাড়ছে, কোথাও-কোথাও ফাঁকা। কলকে ফুলের একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে একপাশে, মাটিতে অজস্র শুকনো ফুল। দেওয়াল বেয়ে অপরাজিতা উঠে গেছে চাল পর্যন্ত।

বারান্দায় কাঠের চেয়ার পেতে দিয়ে শচিপতি বললেন, "বসুন। আমার সংসারে একজন অভিভাবক থাকে, তার নাম মুরতি। তাকে আমি মান্য করি। একটা খবর দিয়ে আসি ওকে।"

শচিপতি চলে গেলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্কভাবে শচিপতির এই বাসভবনটি দেখছিলাম। মনে হল, এ-বাড়িটিরও ভেঙে পড়ার দিন এগিয়ে এসেছে। দেওয়াল ঝরছে, কাঠের গন্ধ উগ্র হয়ে উঠেছে, পায়ের তলায় সিমেণ্ট ফেটে গেছে চওড়া হয়ে।

শচিপতি ফিরে এসে বসলেন। তাঁর পৈতৃক আমলের বাড়ি, নিজের এই আস্তানা নিয়ে খানিকটা গল্প হল। শুনলাম, এই জায়গায় তাঁরা সুহাসদের চেয়েও খানিকটা প্রাচীন পরিবার। বাঙালী হিসেবে তাঁরাই প্রথমে ঘরবাড়ি

তুলে এখানে বসবাস করতে শুরু করেন, সুহাসের ঠাকুরদা বাড়ি তোলেন তারপর। শচিপতির বাবার আমল থেকেই সংসার ভেঙে যেতে শুরু করে। অদ্ভুত এক নিয়তির খেলা চলে এ-বাড়িতে। জলজ্যান্ত মানুষগুলো অপঘাতে মরতে শুরু করল। ছোটকাকা মারা গেল ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে; মেজকাকা ঝড়-বৃষ্টির দিন ফিরছিল সাইকেল করে, আমতলায় দাঁড়িয়ে বজ্রাঘাতে মারা গেল। বাবা প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। ছোটকাকি একদিন আগুনে পুড়ে মরতে গেল। প্রাণে বেঁচে গেল কাকি, কিন্তু তার মাথার দোষ কাটল না। তাকে দেওয়া হল রাঁচিতে। আজও কাকি বেঁচে আছে, তবে কাকির কাছে অতীত বলে কিছু নেই, শচিপতি একবার শেষ চেষ্টা করেছিল বছর খানে আগে, কাকি তাকে চিনতে বা মনে করতে পারে নি। এখন একেবারে জড়বুদ্ধি। বাবা শেষের দিকে আত্মহত্যা করল। সংসারে ছেলে বলতে শচিপতি একা, মেজকাকার একটি মেয়ে ছিল, বিয়ে-থার পর বাচ্চা হতে গিয়ে সে মারা যায়। মেজকাকিই অনেকদিন বেঁচে ছিল, বছর দুই কাশীবাসী হয়ে কাটিয়ে সেখানেই মারা গেল। শচিপতিই এ-বাড়ির শেষ জীবিত ব্যক্তি।

মুরতি দু-পেয়ালা চা এনে দিয়েছিল। পরে এসে একটা ছোট লণ্ঠন রেখে গেল। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

শচিপতি বললেন, "মেজকাকিমার কথা শুনে এই বাসাটা আমি করে-ছিলাম। কাকির ভয় হয়েছিল, আমাদের পুরনো ভিটেয় থাকলে আমি বাঁচব না। একমাত্র বংশধরকে কাকি বাঁচাতে চেয়েছিল। এখন পর্যন্ত আমি বেঁচে আছি।" শচিপতি যেন হাসলেন।

আমি বললাম, "আপনি তো এখানে থাকেন না?"

"খুব কম। বছরে দু-একবার আসি।"

ঠাট্টা করে বললাম, "এখানে থাকতে ভয় করে?"

"না, ভয় নয়। ইচ্ছে করে না তেমন। বাইরে বাইরে থাকলে তবু দিন কেটে যায়। কাজকর্মও জুটে যায় নানা রকমের।"

কিছুক্ষণ আমরা চুপ করে থাকলাম। শচিপতির পারিবারিক বিষাদ-চিত্রটি যেন আমার মনের মধ্যে ছায়ার মতন ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ শচিপতি জিজ্ঞেস করলেন, "অবিনবাবু, মৃত্যুটৃত্যু সম্পর্কে আপনি ভাবেন?"

প্রশ্নটা এমন আচমকা যে আমি বিভ্রমে পড়লাম। পরে হেসে বললাম, "না, ভাবি না। জীবন নিয়েই ভাবতে পারছি না তো মৃত্যু!"

শচিপতি আমার জবাবে তেমন কোনো গুরুত্ব দিলেন না, বললেন, "আপনি ঠাট্টা করছেন। ভাবনাটা মানুষের এমনিতেই এসে যায়।"

দু-মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, "দেখুন, যে-কাপড়টা পরে আছি তার ছেঁড়াগুলো রিপু করতেই সময় পাই না, পরে কী করব তা নিয়ে আমার চিন্তা নেই। আমার গুরু রামদাস হলে বলত, চিতায় চড়িয়ে দিলে আগুনে

পুড়ব, মাঠে ফেলে রাখলে শকুনিতে খাবে। আমার পক্ষে দুই-ই সমান।"

"রামদাস কে?"

"আমার আদিগুরু। বাবার অফিসের হেড পিয়ন।" আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, তারপর গলা ছেড়ে হেসে উঠলাম।

শচিপতিও হেসে ফেললেন। পরে বললেন, "আপনি বেশ বলেন, আপনার কথাবার্তা আমায় মাঝেমাঝে অবাক করে দেয়।"

আমি বললাম, "আমার বন্ধুরা বলে অবাক করে দেওয়াটাই আমার স্বভাব। ওরা আমায় বাকসিদ্ধ পুরুষ ভাবে। না মশাই, আমি বাকসিদ্ধ নই, অবাক জলপানের মতন অবাক পুরুষও নয়। আমার কাছে যেটা সত্যি শুধু সেইটা জবরদস্ত গলায় বলে ফেলি।"

শচিপতি মৃদু হেসে নিরুত্তর থাকলেন।

পরে আমার মনে হল, শচিপতি তাঁর পরিবারের মধ্যে মৃত্যু এবং শোকের এমন এক ভয়ঙ্কর চেহারা দেখেছেন যা তাঁর মনে শিলমোহর মেরে গেছে, তিনি সে-দাগ তুলতে পারছেন না।

আমি বললাম, "আপনি বুঝি মৃত্যু নিয়ে ভাবেন?"

"ভাবি।"

"কী ভাবেন?"

শচিপতি আমার দিকে তাকালেন, দু-পলক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন, লণ্ঠনের আলোয় তাঁর ফ্যাকাসে মুখ আরও নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছিল। সামান্য ইতস্তত করে হেসে বললেন, "ভাবি, আমার আশেপাশে কোথাও যেন একজন ছিপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে, তার বঁড়শি আমি গিলে ফেলেছি।"

শচিপতির মুখের দিকে তাকালে মানুষটিকে ভীত, উদ্বিগ্ন মনে হয় না; অথচ তাঁর কথা শুনে এখন মনে হতে পারে তিনি যেন মৃত্যুভয় নিয়ে বসে আছেন। আমি ঠাট্টা করে বললাম, "আপাতত আপনি তাহলে জলের তলায় মাছের মতন খেলুন, বুদ্ধিমানের মতন খেলতে পারলে ছিপঅলাই কুপোকাৎ হবে।"

শচিপতি নীরব থাকলেন।

"মানুষ যতক্ষণ বেঁচে আছে তার কাছে জীবনটাই সত্য। মৃত্যুর কথা ভেবে কিছু লাভ হয় কী?" আমি বললাম, "আপনি ডাঙায় বসে নদীর কথা ভাবলে নদী কাছে আসবে না, দূরেও যাবে না। তাহলে এ-ভাবনা ভেবে লাভ কী?"

শচিপতি সামান্য একটু মাথা দোলালেন, মনে হল লাভের ব্যাপারে তাঁর দ্বিধা রয়েছে। বললেন, "তা ঠিক। তবে ওই চিন্তাটা মাথায় এলে বাঁচার চিন্তাটাও এসে যায়। জীবন একটা জায়গায় শেষ হয় বলেই ভাবনাটা এখন, যতদিন বেঁচে আছি। পাপ না থাকলে কে আর পুণ্য নিয়ে মাথা ঘামাত, বলুন!...যাক্, এ-সব মরা-বাঁচার কথা যাক। আপনি কিছু বলুন।..."

প্রসঙ্গটা চাপা পড়তে আমার ভালই লাগল। শচিপতিকে ব্যক্তিগতভাবে যা ব্যাকুল করে তা নিয়ে কথা বলতে আমার ইচ্ছে ছিল না। আমি হেসে বললাম, "আপনি আবার আমাকে রামদাসের কথা মনে করিয়ে দিলেন। রামদাস যখন দেখত তার বলার বিশেষ কিছু নেই তখন বলত, কথা হল পাখির দানা, সারাদিন ছড়ালে তুমি ফতুর হয়ে যাবে, আজ যে-পাখি দানা খেতে এসেছে, কাল আর সে আসবে না।"

শচিপতি এবার সরল গলায় হেসে উঠলেন। বললেন, "আপনার রামদাস গুরু হিসেবে সত্যিই ভাল।"

আরও খানিকটা পরে উঠে পড়লাম। শচিপতি আমায় এগিয়ে দিতে আসছিলেন। আমি নিষেধ করলাম। পকেটে ছোট টর্চ আছে, বড় রাস্তাটা আমার অচেনা নয়, আমি পথ কমিয়ে যাব না, রাস্তা ধরে যাব, শচিপতিকে তাঁর বাড়ির কাছাকাছি জায়গায় বিদায় দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

শচিপতি আমায় আজ খানিকটা অন্যমনস্ক করে দিয়েছেন। আমি মানুষের মৃত্যু নিয়ে কোনোদিনই বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি না। যেটা অবধারিত, যা মানুষের আয়ত্তের বাইরে তার সম্পর্কে উদ্বেগ নিয়ে বসে থাকা অর্থহীন। অথচ আমি দু-একটি মৃত্যুকে ভুলতে পারি না। যেমন আমার মা পুণ্যবালার মৃত্যু।

আমার মার মৃত্যুর ছবিটি পুণ্যবালারই যোগ্য। তার কোথাও একটু চড়া রঙ নেই। আমাদের সংসারে যেসব সমারোহ মৃত্যুকে ঘিরে থাকে মার বেলায় তার কিছুই ছিল না। ডাক্তার-বদ্যি ছোটাছুটি করে নি, আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীর ভিড় জমেনি দরজার গোড়ায়, বাড়ির বাতাস থমথমে হয়ে ওঠার অবস্থাও হল না, মা মারা গেল।

আমার বাবা ছিল সরকারী চাকুরে। অফিসের কাজে মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হত। সেবার বাবা আমাদের সঙ্গে নিয়ে কোথায় যেন গেল, জায়গাটার নাম আমার মনে নেই। বাবার ছিল কাজকর্ম, আমরা গিয়েছিলাম বেড়াতে। কাঠের ডাকবাংলোয় আমাদের থাকতে হত। রামদাস ছিল আমাদের সঙ্গে। জায়গাটা পাহাড়তলী, চতুর্দিকে পাহাড়ী ঢল, মাথা উঁচু টিলা, গাছপালা ঘাসে সব সবুজ। সামান্য দূরে একটা ছোট পাহাড়ী নদী ছিল, কোন ঝরনা থেকে নদীটা নেমে এসেছিল কে জানে, তার জলে তোড় ছিল, আর নদীতে ছিল অজস্র পাথর। বাঁকের মুখে গাছপালার ঘন ঝোপের গায়ে জল যেত আটকে। আমরা রোজই নদীর দিকে বেড়াতে যেতাম। একদিন বিকেলে মা একা-একা

গেল নদীর দিকে বেড়াতে, আমি গিয়েছিলাম রামদাসের সঙ্গে সেপাই-টিলায় জিনিসপত্র কিনতে, বাবা গিয়েছিল ইনেস্‌পেকসানের কাজে। সন্ধ্যেবেলায় আমরা সবাই বাড়ি ফিরেছি, শুধু মার দেখা নেই। মা জ্যোৎস্নার মধ্যে একটু দেরী করে ফিরছে ভেবে আমরা বসে আছি। এমন সময় খবর এল, মা নদীতে পড়ে গেছে। গিয়ে দেখি, বাঁকের মুখে ঝোপ আর জংলা লতাপাতার মধ্যে মা ডুবে আছে। পুরু শ্যাওলার তলায় মার সর্বাঙ্গ ডোবানো, একটা পাথরের ফাঁকে মাথাটুকু মাত্র ভেসে রয়েছে, মুখ একটু পাশ ফেরানো, কপালের খানিকটা জায়গায় রক্ত জমে কালো হয়ে আছে। কিছু ভিজে চুল মার গলায়, গালে, কপালে আটকে আছে। দৃশ্যটি বড় আশ্চর্যরকম শান্ত, স্তব্ধ ও নিবিড়। অনাবিল জ্যোৎস্না মাথার ওপর, চারপাশ নিঃশব্দ, নির্জন; রাশি-রাশি জোনাকি উড়ছে ঝোপের মধ্যে, আর আমার মা পুরু শ্যাওলার তলায় ডুবে শুয়ে আছে, যেন এতকাল মা যে-শয্যায় শুয়ে এসেছে সেটা মার নিজের মনোমতন হয় নি, এই শ্যাওলার শয্যা, জলজ লতাপাতার আবরণ, ঝোপঝাড়ের নির্জনতা, আকাশ থেকে ঝরে পড়া জ্যোৎস্না মার মনোমত হওয়ায় মা অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। পাথরের ওপর রাখা মার ছোট্ট মাথাটি এক আশ্চর্য জলপদ্মর মতন ফুটে ছিল।

যে-বয়সে মানুষ অভিভূত হয়ে মৃত্যুর বৃহত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করে, কিংবা জীবনের অসারতা, শূন্যতা নিয়ে হাহাকার করে আমার সে-বয়েস তখন হয় নি; তবু মার এই মৃত্যু যেন আমার মনের পটে কিছু এঁকে দিয়েছিল।

বয়স বাড়লে আমি আমার মার মৃত্যুর কথা ভেবেছি। পুণ্যবালার এই মৃত্যু তার ইচ্ছামৃত্যু নয়, একেবারেই আকস্মিক ঘটনা; শ্যাওলাজমা পাথরে পা রেখে হাঁটতে গিয়ে পিছলে পড়ে গিয়েছিল, মাথায় মারাত্মক আঘাত লেগেছিল, দুর্ঘটনায় মা মারা গেছে; তবু বাইরে থেকে যেটা দুর্ঘটনা ভেতরে তাকালে সেটাই যেন অন্য কোনো অর্থ নিয়ে ধরা দেয়।

ভেবেচিন্তে আমার মনে হয়েছে, মানুষ জন্মের সময় সেজে আসে না। তার অবস্থা তখন কুমারটুলির কাদামাটি-লেপা মূর্তির মতন, তারপর সারা জীবন ধরে তাকে সাজতে হয়। এটা জামা-কাপড়ের সাজ নয়, জীবনের সাজ। যদি এমন হয়, মৃত্যুর সময় মানুষ তার সাজটুকু সেরে নিয়ে চিতায় ওঠে তবে মন্দ কী! আমার মার জীবনের যতটুকু আমি দেখেছি বুঝেছি, তাতে বলতে পারি, মার মৃত্যুর সাজটি মাকে চমৎকার মানিয়েছিল। একমাথা সাদা চুল নিয়ে শাখা সিঁদুর পরে শ্মশানে শুতে পারলে পুণ্যবালাকে বোধ হয় এমন করে মানাত না।

বাড়ি ফিরে দেখি আয়না বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে। বলল, "বেড়ানো হল?"

মাথা নেড়ে বললাম, "হ্যাঁ।"

"শচিদার বাড়ি গিয়েছিলেন?"

"ঘুরে এলাম।"

আয়না আমার পাশে পাশে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠল।

"এক গ্লাস জল খাওয়াও। জ্যাঠামশাইয়ের গলা শুনছি যেন..."

আয়না হেসে বলল, "জ্যাঠামশাই মাঝে-মাঝে আপনমনে ওইভাবে গান গায়।"

খানিকটা ভাঙা, দুর্বল গলায় জ্যাঠামশাই তাঁর ঘরের দিকে কোথাও গান গাইছিলেন। গানটি স্পষ্ট কানে আসছিল না, দু-একটি শব্দ যা ভেসে এল তাতে মনে হল, জ্যাঠামশাই ধর্মসংগীত গাইছেন।

ঘরে এসে দাঁড়িয়েছি, আয়না জল নিয়ে এল।

"অবিনদা, ছাদে যাবেন?"

"ছাদে?"

"আমার খুব যেতে ইচ্ছে করছে।"

"যাচ্ছ না কেন?"

"দূর—, অত বড় ছাদে একলা ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে না।"

"ভাল লাগে না, না ভুতের ভয়ে যেতে সাহস হয় না?"

আয়না হেসে ফেলল। "আমার ভূতের ভয় নেই। ছেলেবেলায় খুব ছিল।"

হেসে বললাম, "ঠিক আছে, চলো।"

ছাদে এসে আয়না খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, চারপাশ তাকাল, সামান্য পায়চারি করে বসে পড়ল। আজ আকাশ পরিষ্কার, তারায় তারায় ভরা। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছিল।

আকাশ দেখতে-দেখতে আমার আবার মার কথা মনে পড়ল।

আয়না ডাকল, "বসুন না।"

আয়নার কাছাকাছি বসে তার মুখ দেখতে-দেখতে হঠাৎ বললাম, "আয়না, তুমি মহাভারত পড়েছ?"

ঘাড় এলিয়ে আয়না বলল, "পড়েছি। কেন?"

"মহাভারতে নানারকম মৃত্যু আছে। যেমন ধরো পাণ্ডু এক ভাবে মরেছে, কর্ণ এক ভাবে, আবার মহাপ্রস্থানে যেতে গিয়ে এক-একজন একেক ভাবে পড়ে যাচ্ছে। কোন মৃত্যুটা তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে?"

আয়না আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছিল না, তাকিয়ে ছিল। শেষে বলল, "রাত্তির বেলায় আপনার হঠাৎ মরাটরার কথা মনে পড়ল কেন?"

"এমনি। তোমার ভয় করছে নাকি?"

"না—" মাথা নাড়ল আয়না; একটু থেমে বলল, "আমার কিছু মাথায় আসছে না। আপনি বলুন।"

আমি বললাম, "ভীষ্মর শরশয্যাটা আমার খুবই পছন্দ।"

আয়না সামান্য শিউরে ওঠার মতন করে হাত নেড়ে বলল, "না বাবা, অত তীরের ওপর শুয়ে মরাটা খুব সুখের নয়।"

আমি হেসে বললাম, "তোমার দাদাদের আমি মাঝে-মাঝে জ্ঞান দেবার চেষ্টা করি; ওরা একেবারেই অজ্ঞান-জীব, বিনি পয়সায় জ্ঞানটা নেয় না, ভাবে মাথার দাম কমে যাবে। তোমায় একটু জ্ঞান দেবার চেষ্টা করা যাক। দাঁড়াও তার আগে এই সিগারেটটা ধরিয়ে নি।"

আয়না হাসিমুখে বসে থাকল।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আমি বললাম, "ভীষ্ম মানুষটি খুব ভদ্রলোক। খানিকটা বোকাও। ভদ্রলোকদের মাথায় বোকামিটা শোভা, মোজেইক করা মেঝের মতন, না থাকলে মানায় না। যাক্ গে, আসল কথাটা হল মহাভারতের গোড়ার দিকেই ভীষ্মের আগমন, আর প্রায় শেষ পর্যন্ত মানুষটা থেকে গেছে। ওই বুড়োর বয়েসের গাছপাথর পাবে না। তার চোখের ওপর চার-পাঁচটা পুরুষ বাঁচল মরল। কুরু বংশের খ্যাতি যতই হোক, তার দাপট দেখি ভীষ্ম থেকে। সেই মানুষটা নিজে কিছু করল না, দু-হাত বাড়িয়ে শুধু বংশধরদের আগলে গেল, তাদের কীর্তিকলাপ দেখল, ভালমন্দ কথা বলল, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। ভীষ্মের সাধ্য হল না কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বন্ধ করে। অমন একটা মানুষ—যার স্নেহ, প্রেম, মায়া, ধর্মবোধ, ঔদার্য, ত্যাগ, ক্ষমতা সমস্তই ছিল বিশাল, যে নিজের হাতে চার পুরুষকে আগলে রেখেছিল সেই মানুষটিই শেষ পর্যন্ত দেখল, সব নষ্ট হয়ে গেল। লোভ, অন্যায় পাপ, শঠতা, বিদ্বেষ, রক্তপাত, হানাহানি—কোনোটাই তার পক্ষে সামলানো সম্ভব হল না। যে-সব মহৎ গুণের জন্যে ভীষ্ম প্রণম্য—ঠিক সেগুলোকে ভাঙার জন্যেই তার বংশ-ধররা এসেছে। এটা ওই লোকটির জীবনে কত বড় আঘাত তা ভেবে দেখো। মানুষটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার মনে এই আঘাতগুলো কেমন লেগেছে বলতে পার? আমরা মুখে বলি, বুকে যেন শেল বিঁধল কিংবা বলি তীর বিঁধে গেল। আমি যদি বলি শরশয্যাটা আর কিছু নয়, ওটা মোটা মনের মানুষকে বোঝানোর জন্যে মোটা করে দাগানো ব্যাপার। আসলে যদি ভীষ্মর মনের চেহারাটা দেখানো যেত দেখতে পেতাম, তার জীবনের সব দিকে তার স্বজনরা বাছা-বাছা তীর বিঁধে গেছে। আমার তো মনে হয়, বেদব্যাস বেশ চালাকি করে কাজটা সেরে ফেলেছেন। আমরা ভাবি শরশয্যাটা নেহাতই তীরের খোঁচা, কিন্তু তা নয়, যে মানুষটা মরবে তাকে নিয়ে মহাকবির অত মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না; মানুষটাকে কুরুক্ষেত্রর মাঠে ফেলে রেখে কবি তোমাদের দেখাতে চেয়েছেন, দেখো, ওই বিরাট মানুষটার তোমরা কী দশা করেছ!...আমার কাছে ভীষ্মর শরশয্যা অত্যন্ত সুন্দর লাগে। যেমন মানুষ, যেমন তার জীবন, সেইরকম মৃত্যু। যথাযোগ্য। এমন মৃত্যুর তুলনা নেই।"

আয়না আমার কথা শুনছিল। তার মাথায় শরশয্যার এমন একটা অদ্ভুত অর্থ আগে কোনোদিন আসেনি। অনেকক্ষণ অবাক হয়ে বসে থেকে শেষে বলল, "আপনার মাথায় আসেও সব; খুঁজে-খুঁজে বেশ বের করেন।"

আমি হেসে বললাম, "আমার মাথায় আসবে কেন, এ তোমাদের বেদব্যাস মুনির মাথায় এসেছে।"

আয়না গালে হাত তুলে বলল, "আপনি কি ভীষ্ম হবেন?"

হেসে উঠে আমি বললাম, "না, আমি কোন দুঃখে ভীষ্ম হতে যাব। অত ত্যাগ আমার সইবে না।"

আয়না কিছু বলল না।

আমি বললাম, "তোমাদের শচিদার বাড়িতে বসে তাঁর পরিবারের গল্প শুনছিলাম। ভদ্রলোক আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি মৃত্যুটৃত্যুর কথা ভাবি কিনা! আমি বললাম, না মশাই ওসব আমি ভাবি না। সেই থেকে কথাটা মনে পড়ল। মানুষ মরবে এটা নতুন কথা নয়। আমি ভাবি যারা মরে তারা তেমন করে মরতে পারে না। দু-চারজন বেশ সুন্দর করে মরতে পারে। আমি একটু সেজেগুজে মরতে চাই।"

আয়না ভুরু কুঁচকে অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "কী যে সব অলক্ষুণে কথা বলেন! অন্য কথা বলুন।"

এখন একটা গাড়ি যাচ্ছিল, মালগাড়ি বোধ হয়, রেল লাইন থেকে গুমগুম শব্দ আসছিল। বাতাসটা আপন খেয়ালে বয়ে যাচ্ছে। আয়নার টোপর নীচে বার-বার চেঁচিয়ে উঠে আবার চুপ করে যাচ্ছে। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে খানিকটা চুপ করে থাকলাম।

আয়না বলল, "অবিনদা, আপনি দাদার অনেক দিনের বন্ধু, না?"

"পুরনো বন্ধু। কলেজে পড়েছি এক সঙ্গে। কেন?"

"জিজ্ঞেস করছি। দাদাকে আপনি খুব ভালবাসেন?"

"আমার বন্ধুরাই আমায় বেশী ভালবাসে।"

"আপনি বড় ঘুরিয়ে কথা বলেন।"

আয়না যে কেন আমাদের বন্ধুত্বের অন্তরঙ্গতার প্রসঙ্গটা আনছিল বুঝতে পারছিলাম না। মনে হল, ওর যেন কিছু বলার আছে।

"সুহাস আমায় পছন্দ করে, কিন্তু সেটা তার স্বভাব। কেন বলো তো?"

আয়না চুপ করেই থাকল। তার মুখ অন্ধকারে খুব বেশি স্পষ্ট নয় যে কিছু অনুমান করব।

শেষে আয়না বলল, "আমার খুব কলকাতা যেতে ইচ্ছে করে।"

হেসে বললাম, "মাত্র এইটুকু সাধ। তা বেশ, আমার সঙ্গে চলো।"

"আহা! চলো বললেই যাওয়া যায়?"

"যাবার জন্যে আর কী লাগে! তোমার টিকিট ভাড়া আমি দেব। পথ খরচ আমার। এমন কী ট্যাক্সি করে সুহাসের ফ্ল্যাটে পেঁাছে দেব।"

আয়না হাসতে-হাসতে বলল, "অত সোজা! এ-বাড়ি ছেড়ে পা বাড়ানো মুখের কথা নয়। দাদা তো যখনই আসে তখনই একবার করে দিদিকে বলে, কলকাতায় চলে চল। দিদি এখান থেকে যাবে না, জ্যাঠামশাইও নয়।"

ঠাট্টা করে বললাম, "কিন্তু তোমায় তো একলাই যেতে হবে, ভাই। সুহাস তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাটা পাকা করে ফেলতে পারলে তোমার গন্তব্য হবে কলকাতা। তখন ?"

আয়না ঠাট্টাটা বুঝতে পেরে লজ্জা পেল। বলল, "এ মা! আমি কি তাই বলছি !"

এমন সময় পায়ের শব্দে তাকিয়ে দেখি মোহিনী এসেছেন। কাছে এসে বললেন, "আয়না, তোর টোপর জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে গিয়ে বমি করছে। কী খাইয়েছিস ওকে ?"

আয়না উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি কিছু খেতে দিই নি। কার্তিকদা তখন ওকে পোকা মারতে দেখেছিল। হতচ্ছাড়া তাই খেয়েছে হয়ত।"

আয়না আর দাঁড়াল না, তরতর করে চলে গেল, তার কুকুর বমি করেছে এটা যেন তার কাছে মহা উদ্বেগের বিষয়।

মোহিনী হেসে ফেলে বললেন, "ওই কুকুর নিয়েই থাক।"

সামান্য অপেক্ষা করে আমি বললাম, "একটা কিছু না নিয়ে থাকা মুশকিল। আপনি থাকেন এই সংসার নিয়ে, ও থাকে ওর টোপর নিয়ে।"

মোহিনী কিছু বললেন না।

"বসুন।"

কী যেন মনে করে মোহিনী সামান্য তফাতে বসলেন।

মোহিনী বোধ হয় ঝোঁকের মাথায় বসে পড়েছিলেন। আয়নাকে ডাকতে এসে আবার তার সঙ্গেই নেমে যাওয়া চোখে লাগে বলে সম্ভবত তিনি না বসে পারেন নি। বসে পড়ে মোহিনীর মনে হল, তিনি সুবিবেচনার কাজ করেন নি। তাঁর বসার ভঙ্গি থেকে সে-রকম মনে হচ্ছিল, আমার মুখোমুখি তিনি বসেন নি, খানিকটা তফাতে পাশ ফিরে বসে আছেন, অন্ধকারে আমি তাঁর মুখের একটা পাশ অস্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিলাম, তিনি আকাশ কিংবা তারা দেখছিলেন, হাত দুটি আঁচলের আড়ালে। যে-মানুষটি দিনের আলোতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্পর্ক এড়িয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত সেই মানুষটি এই বিরাট ছাদে, অন্ধকারে, নির্জনে আমার সামনে বসে থেকে যে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছেন তা বোঝাই যায়।

কৌতুক অনুভব করে আমি বললাম, "একটা গল্প শুনবেন ?"

মোহিনী আমার দিকে ভাল করে ঘাড় ফেরালেন না।

আমি হেসে বললাম, "আমার একটা অজ্ঞাতবাস-পর্ব আছে। সেই পর্বে

নিতে চাই।”

কথা বললেন না মোহিনী।

অপেক্ষা করে আমি বললাম, “আপনাকে আমি অপ্রস্তুতে ফেলতে চাই না। এমনিতেই আপনি আমার ওপর প্রসন্ন নন, আরও অপ্রসন্ন হলে আপসোস বাড়বে। যদি আপনার অসম্মতি থাকে অসংকোচে বলুন।”

মোহিনী সমস্যায় পড়লেন। তিনি মনঃস্থির করতে পারছিলেন না কী বলবেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “কী কথা?”

আমি বললাম, “কথাটা বড় করে বলতে গেলে ‘জ্যাঠামশাইয়ের খাবার সময় হয়ে গেছে’ বলে আপনি উঠে যাবেন, আমার আর বলা হবে না। তার চেয়ে ছোট করে বলি। দেখুন, মানুষের জীবনটা খুব সাদামাটা ব্যাপার নয়। যদিও আমি নিজের হাতে বাজার করি না, কিন্তু জানি থলি হাতে বাজারে গিয়ে আলুর দোকানে দাঁড়ালে আলুটা পাওয়া যাবে, মাছের দোকানে গেলে মাছ। ভগবান কিন্তু এই সহজ ব্যবস্থাটা মানুষের জীবনে রাখেন নি। তবু আমরা অভ্যাসবশে কিছু সহজ ব্যবস্থা জীবনেও করে নিয়েছি। কোথায় আপনি সুখ পাবেন, শান্তি পাবেন, তৃপ্তি পাবেন, খুশী হবেন তা নমস্যজনে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাতে কতটুকু লাভ হয়েছে জানি না, তবে অনেককেই দেখলাম সুখ খুঁজতে গিয়ে অ-সুখ জুটিয়ে আনে। শান্তি চাইতে গিয়ে অশান্তি।...আমি কি ঠিক বলছি না?”

মোহিনী আমার ভূমিকাটা ধরতে পেরেছিলেন নিশ্চয়ই, তবু বললেন, “আমি কী বলব!”

“আপনি না বললেও কিছু যায় আসে না। আমি বলছি, এই মজার বাজারে আমরা ঘোরাঘুরি করছি। আপনি নিজে তার থেকে বাদ পড়েন নি।”

মোহিনী নীরব হয়ে বসে থাকলেন।

সামান্য অপেক্ষা করে আমি বললাম, “একদিন আমি আপনাকে বলেছিলাম আপনার গল্প আমি জানি। শুনে আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এটা আমার অনধিকার চর্চা। নিতান্তই অধিকার নিয়ে চর্চা করতে গেলে আমাদের অনেক কিছুই চর্চার আওতায় আসে না। বিশ্বাস করুন, আপনাকে ক্ষুণ্ণ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।”

মোহিনী স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন। তিনি এই মুহূর্তে এতই অক্ষম যে তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করতে পারছিলেন না। তাঁর দৃষ্টি অন্ধকারে কোথায় চলে যাচ্ছিল আমি জানি না।

আমি বললাম, “আপনার গল্পের আগাগোড়া বলার কোনো দরকার নেই। আমি শুধু বলব ; আপনার প্রাপ্য আপনি পান নি। আপনার গুরুজনরা আপনার জন্যে যে-ব্যবস্থাটা করেছিলেন সেটা আমাদের সমাজে মেয়েদের সুখ তৃপ্তি শান্তি পাবার সহজ ব্যবস্থা। তাঁদের দোষ দিই না। তাঁরা ভেবেছিলেন, ঠিক জায়গায় কেনাকাটা সারছেন। এমন দুর্ভাগ্য এ-দেশের মেয়েদের হামেশাই

একবার আমি শালপাতার কাঠির স্বদেশী দেশলাই কারখানা খুলেছিলাম। বাজারে চলল না, নয়ত ঘোড়া মার্কার চেয়ে গাধা মার্কা দেশলাইটা আপনাদের রান্নাঘরে শোভা পেত। গল্পটা অবশ্য আমার ব্যবসা নিয়ে নয়, আমাদের কারখানার একটি লোক কাজ করত, গণেশ, তাকে নিয়ে। তার অভ্যেস ছিল সব সময় মাথার ওপর দু-হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকা। কাজের সময় হাত নামাত, নয়ত হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকত। দেখেশুনে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কাজ না থাকলে মাথার ওপর হাত তুলে তুমি দাঁড়িয়ে থাক কেন? গণেশ বলেছিল, বাবু আমি মুটে-মজুর লোক, বরাবর মাথায় করে মাল বয়েছি। মাথার ওপর মোট না থাকলেও আমি মালুম করি আমার শিরের ওপর মোঠরি আছে।”

মোহিনী বুঝতে পারলেন না আমি কী বলতে চাই, তবে এবার তিনি আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, “আপনি সেই গণেশের মতন। ভয়ের মোটটা মাথায় নিয়ে বসে আছেন।”

মোহিনী অপ্রস্তুত বোধ করলেন। বললেন, “না-না, ভয় কেন?”

“আমিও তো তাই বলতে চাইছি, ভয় আপনার কেন?”

মোহিনী আমার মুখ দেখছিলেন, এই অন্ধকারে আমাদের মুখ পরস্পরের কাছে খুবই অস্পষ্ট। তিনি আমার কৌতুকটুকু নিশ্চয় দেখতে পেলেন না।

উনি বললেন, “আমার ভয় কিসের? অনর্থক ভয়ের কী আছে!”

আমি বললাম, “অবিনের মুখকে আপনি বড় সমীহ করেন। ওটা না করলে আপনার দুশ্চিন্তা দূর হত। সুহাসরা আমার মুখকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করে না। পরম নির্ভয়ে রয়েছে। ধরুন আয়না, সে আমার কথাগুলোকে অবহেলায় ফেলে দেয়, তার কাছে আমি নিতান্তই অবিনদা, সম্পর্কটা একেবারে সরল। কিন্তু আপনি আমাকে ভয়ের পাত্র করে তুলেছেন।”

বিব্রত বোধ করে মোহিনী ব্যস্ত হয়ে বললেন, “কী মুশকিল!”

“মুশকিলটা হল, আপনি প্রথম থেকেই আমায় ঘোরতর শত্রু ভেবে নিয়েছেন।”

“শত্রু!”

“আপনি যদি সুহাসের কান টেনে চোখ রাঙিয়ে বলেন, ওই তোর বন্ধু অবিন জন্তুটাকে তুই কোন আক্কেলে বাড়ির মধ্যে ঢোকালি তাহলেও আমি অবাক হব না।”

বলে আমি গলা ছেড়ে হাসলাম।

মোহিনী লজ্জা পেয়ে বললেন, “কান ধরার বয়েস সুহাস পেরিয়ে গেছে।”

আমি বললাম, “সুহাস তার কান নিয়ে আপনার হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে এটা তার পক্ষে সুখের কথা। কিন্তু ঠাট্টা থাক। পরশু সকালে আমি চলে যাচ্ছি। তার আগে আপনার সঙ্গে দুটো ছোট কথা শেষ করে

হয়। আমার মা পুণ্যবালার পদ্য আপনি দেখেছেন 'আমি থাকি নিজ মনে।' পুণ্যবালার সঙ্গে আপনার তুলনা করব না, এইমাত্র বলতে পারি, মারও দোকান ভুল হয়েছিল। তবে মার কিছু সাংসারিক প্রাপ্তি ছিল, তাতে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়। আপনার সেটুকুও জোটে নি।"

মোহিনী যেন অন্ধকারে কেঁপে উঠলেন। তাঁর নিঃসাড় শরীরে আচমকা সাড় এল। তিনি বললেন, "আমার কথা কে বলেছে?"

"সুহাস।"

"সুহাস?"

"সুহাসকে আপনারা কোথাও-কোথাও ভুল করেন। সে পারিবারিক ব্যাপারে খুব সাবধানী। তবু আমায় বলেছিল। বোধ হয় আমি ছাড়া তার অন্য বন্ধুরা এটা জানে না।"

বাতাসে মোহিনীর গায়ের কাপড় সরে গিয়ে হাত দুটি দেখা যাচ্ছিল। আঁচল গোছাতে গিয়ে তাঁর পিঠে ঝোলানো চাবির গোছা মাটিতে পড়ে ঠক্ করে শব্দ হল। উনি কেমন উদাস গলায় বললেন, "ও-সব পুরনো কথা আমি ভুলে গেছি।"

আমি বললাম, "কিছু দাগ সময়ে মুছে যায়, কিছু আছে যা যায় না। আপনি যদি বাস্তবিক ওই পুরনো কথাটা ভুলে গিয়ে থাকেন তবে আমি আপনার প্রশংসা করব। ওটা আপনার লজ্জা নয়, অগৌরব নয়। বরং আপনি ওই মিথ্যে থেকে নিজেকে মুক্ত করে চলে এসেছেন এটা আপনার সম্মান বাঁচিয়েছে। আমি আপনাকে সাধারণের বাইরে মনে করি। আপনি স্বতন্ত্র।"

মোহিনী যে কতটা চঞ্চল হয়েছেন তা বোঝা গেল ওঁর মাথা নাড়া দেখে। উনি মাথা নেড়ে হাত উঠিয়ে বাধা দিয়ে অস্ফুটস্বরে কী বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপর হঠাৎ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

"সুহাসের কাছে আপনার কথা শোনার পর আমার ইচ্ছে হয়েছিল, কোনো-দিন আপনাকে চোখে দেখব। সুযোগ হচ্ছিল না। এবার চলে এলাম।"

মোহিনী যেন ঘোরের মধ্যে চাপা গলায় বললেন, "আমায় দেখতে?"

সহজ গলায় আমি বললাম, "যদি বলি, হ্যাঁ, আপনাকে দেখতে, তবে সেটা পুরোপুরি সত্যি হবে না। আপনি আট আনা, আর এই আপনাদের বাড়ি, বাড়ির মানুষ, এই জায়গাটা—এরা বাকি আট আনা।"

মোহিনীর ঘাড়, মাথার খোঁপা, পিঠ ছাড়া আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। উনি মুখ ফিরিয়ে বসে ছিলেন।

বসে থেকে থেকে মোহিনী হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। একটু দাঁড়িয়ে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে কী যেন বলব-বলব করেও কিছু বললেন না, চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন।

আমি বললাম, "আমার আর-একটা কথা আছে।"

উনি দাঁড়িয়ে থাকলেন।

মোহিনীর ঠাট্টাটা বুঝতে আমার অসুবিধে হল না। উনি আজ আমার কাছে আগের তুলনায় অনেকটা স্বাভাবিক।

দুপুর বেলায় বই পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙলে দেখি মোহিনী আমার ঘরে এসে চলে যাচ্ছেন।

সাড়া দিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। মোহিনী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালেন।

চোখে চোখ পড়তে মোহিনী বললেন, "শুকনো কাপড়গুলো রেখে দিয়ে গেলাম। বাইরে খুব বাতাস উঠেছে।"

আমি বললাম, "মেঘলা হয়েছে নাকি?"

"বিকেল হয়ে এল। মেঘলাও হয়েছে খানিকটা।"

"আমি বেজায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"দেখলাম", মোহিনী হাসলেন যেন।

"ঘুমের মধ্যে দেখলাম, আমার কলকাতায় ফেরার গাড়িটা দারুণ অ্যাকসিডেন্ট করেছে।"

মোহিনী আমার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বললেন, "সন্ধ্যের দিকে একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি আছে। মাঝখানে বদলে নিতে হয়। সেটা খুব ধীরে ধীরে যায়।"

হেসে ফেলে আমি বললাম, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি সকালের গাড়িতেই যাব। অবিনকে যদি মরতে হয় মেলগাড়ির চাকা উলটে মরবে, গাধাবোট প্যাসেঞ্জারে নয়। তাছাড়া ধীরে সাবধানে গেলে দুর্ঘটনা ঘটে না এটা আমি বিশ্বাস করি না। আপনি পা মেপে হাঁটেন, সাবধানী মোহিনী, তবু কাল সিঁড়িতে পা মচকে পড়লেন।"

মোহিনী এবার আর হাসলেন না।

বারান্দায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছি, গাছপালার পাতা কাঁপিয়ে বড়-বড় ফোঁটায় এক পশলা বৃষ্টি এসে মাটি ভিজিয়ে গেল। আকাশে মেঘ জমে আছে। শেষ বিকেলটা অন্ধকারে ভরে আসছিল। বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, যেন কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি নেমে গিয়েছে। আয়না বোধ হয় বাড়ির সামনে পায়চারি করতে বেরুচ্ছিল, ফটকের কাছ থেকে ছুটতে-ছুটতে বারান্দায় এসে পড়ল।

হেসে বললাম, "হল কী?"

আয়না কপালের জল মুছতে মুছতে বলল, "বৃষ্টি!"

"যাচ্ছিলে কোথায় ?"

"কোথাও নয়। এমনি একটু বেড়াতাম। তপু একটা বই দিয়ে যাবে বলেছিল, এল না।"

একই দিকে মুখ হেলিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। আকাশে চাপা বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছিল। গাছের মাথায় সদ্যফেরা পাখিগুলো সমানে কলরব করছে।

"আপনি আজ কোথাও বেরুলেন না, অবিনদা ?"

"কই আর বেরুলাম।...চলো, বাগানে বেড়াই।"

"বৃষ্টি পড়ছে যে!"

"ফোঁটা-ফোঁটা; তাও থেমে এল।"

সামান্য অপেক্ষা করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে দেখি বৃষ্টি পালাচ্ছে। গন্ধ উঠতে শুরু করেছে মাটির। করবীঝোপের পাতায় পুরু হয়ে ধুলো জমেছিল, বৃষ্টির জল পড়ে পাতাবাহারের মতন দাগ ধরিয়ে দিয়েছে।

আয়না নেমে এল। আমার পাশে হাঁটতে লাগল।

"জ্যাঠামশাইকে দেখুন—" আয়না হঠাৎ বলল। বলে বাড়ির উত্তর দিকটা দেখাল।

জ্যাঠামশাই ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে কার্তিককে দিয়ে কিছু করাচ্ছেন। বুঝতে পারলাম না, তিনি ওখানে কী করছেন।

আয়না বলল, "কোথ্ থেকে এক গাছ পেয়েছেন, কী যেন নাম শুনলাম, সকালে মাটি খোঁড়ানো হয়েছিল, এখন গাছ পোঁতা হচ্ছে।"

আমি চুপ করে আছি দেখে আয়না নিজে থেকেই আবার বলল, "এই বাড়িটার চারপাশে শুধু গাছপালা। কত কালের গাছ সব। জ্যাঠামশাইয়ের কাছে এর হিস্ট্রি আছে, কোনটা দাদু বসিয়েছে, কোনটা ঠাকুমা, জ্যাঠামশাই কবে কলমকরা আমের গাছ কোথায় কোথায় বসিয়েছে, বাবা কী-কী পুঁতেছে সব জ্যাঠামশাইয়ের মুখস্থ। আর গাছ বসিয়ে কী হবে বলুন, অবিনদা!"

আয়না কথাটা মন্দ বলেনি। জ্যাঠামশাই এখনও গাছ বসাচ্ছেন বাড়ির বাগানে। ও-গাছ যতদিনে মাথা তুলে দাঁড়াবে ততদিন এ-বাড়িতে ক'জন আর থাকবে কেউ জানে না। হয়ত উনি নিজেও থাকবেন না। তবু কিসের এক মোহে আজও উনি নতুন চারা পুঁতছেন বাগানে।

এই মোহ অবশ্য জ্যাঠামশাইয়ের পক্ষে স্বাভাবিক। এই বাড়ি তাঁর সত্তার মতন, এর মায়া ওঁর নাড়িতে জড়ানো। মানুষ বরাবরই তার সম্পর্কটাকে খানিকটা ছড়াতে ভালবাসে; কিংবা সে এমন জীব যে-জীব যতটা পারে নিজের মধ্যে বাইরেকে জড়ায়। রামদাস হলে বলত, পরমেশ্বরের এইটেই নিয়ম। বোধ হয়, আমাদের মধ্যে একটা হাত বাড়ানোর ইচ্ছে রয়ে গেছে বরাবর, তাতে জীবাজীব জ্ঞান থাকে না।

জ্যাঠামশাই মানুষটিকে আমার বড় ভাল লেগেছে। তিনি হলেন এ-বাড়ির প্রাচীন পুরুষ। যেন সুহাসদের পরিবারে তিনি এখনও পুরনো ভিত হয়ে

দাঁড়িয়ে বাড়ির কাঠামোটাকে ধরে রেখেছেন। স্পষ্ট করে সেটা নজরে পড়ানোর চেষ্টা তাঁর নেই, স্বাভাবিকভাবেই তা মিশে আছে। চেহারাটি অভিজাত, মাথায় লম্বা, গায়ের রঙ এই বয়সেও ধবধব করছে, মাথার চুল বারো আনাই সাদা, চোখে মোটা কাঁচের চশমা। বাড়িতে বেশির ভাগ সময় ফতুয়া পরেন, ধুতি-টুতিও পরে থাকেন সভ্য করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গাল, দাড়িটাড়ি রাখেন না। মানুষটি কর্তব্যপরায়ণ, স্নেহশীল, প্রশান্ত। তবু আমার মনে হয়েছে, জ্যাঠামশাইয়ের যে-চেহারাটি এ-বাড়িতে চোখে পড়ে সেটি তাঁর আধখানা। বাকিটা চোখে পড়ে না।

"ও অবিনদা, দেখুন একবার—" আয়না আমার হাত টেনে বলল।

তাকিয়ে দেখলাম, ফটক খুলে শচিপতি আসছেন, মাথায় ছাতা।

শচিপতি কাছাকাছি এসে বললেন, "মনে পড়ে গেল অবিনবাবু কাল ফিরে যাচ্ছেন, ভাবলাম, যাই ঘুরে আসি, দেখা সেরে আসি।"

আয়না হেসে বলল, "আজ কিন্তু বৃষ্টি হবে, শচিদা।"

"তা হোক না।"

"কেন হবে বলুন তো?"

শচিপতি প্রশ্নটা ধরতে না পেরে অবাক চোখে আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ইতস্তত করে বললেন, "আকাশে এত মেঘ।"

আয়না কয়েক মুহূর্ত শচিপতিকে দ্বিধায় রেখে শেষে হেসে বলল, "মেঘের জন্যে নয়, মেঘ হলেই কি বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি হবে আপনার জন্যে। আপনার হাতের ছাতাটার যা বাহার!"

শচিপতির হাতের ছাতাটার বাহার অবশ্য দেখার মতনই। খানিকটা কালো, খানিকটা খাকি, আর বাদবাকিটা বোধ হয় ক্যাম্বিসের। ছাতার ডাঁটিটা প্রায় লাঠির মতন।

শচিপতি মাথার ওপর ছাতা তুলে একবার দেখে নিলেন। হেসে বললেন, "রাস্তার মধ্যে বৃষ্টি এল; চৌবের বাড়িতে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওর ছাতাটা আমায় দিল। এটার মজা হল, ছাতাটা বন্ধ হয় না।"

"আয়না খিলখিল করে হেসে উঠল। আমিও হাসলাম জোরে। শচিপতি রাজছত্রের মতন ছাতাটা কাঁধে নিয়ে হাসতে-হাসতে পা বাড়ালেন।

জ্যাঠামশাই আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন, সাড়া দিলেন খানিকটা তফাত থেকেই।

বারান্দায় উঠে এসে আমরা দাঁড়ালাম। এখনও ঘরে বাতি দেওয়া হয় নি, কার্তিক বাগানে। আয়না গেল আলো আনতে।

সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে তপু এসে গেল। সিঁড়ির মুখে সাইকেল ঠেস দিয়ে রেখে বারান্দায় উঠতেই শচিপতি বললেন, "কী রে?"

তপু বলল, "শচিদা?...আপনি এসেছেন শুনেছি। দেখা করতে যেতাম একদিন।"

"কবে আর যেতিস!...কেমন আছিস তোরা?"

"ভাল।"

"বাড়ির সব খবর কী? কাকিমাকে বলিস আমি যাব একদিন।"

"আমাদের বাড়ির খবর একরকম সব। আপনার খুব শরীর খারাপ হয়েছে শুনলাম। খুব রোগা হয়ে গেছেন, শচিদা।"

শচিপতি যেন হেসে-হেসে বললেন, "তোরা সবাই মিলে বলে আমায় আরও ভয় পাইয়ে দিচ্ছিস।...তা তোর চাকরি-বাকরির কী হল?"

"কিচ্ছু না। ইণ্টারভিউ দিচ্ছি মাঝে-মাঝে।...আমি ভাবছি, এখানে একটা কয়লার দোকান দেব।"

শচিপতি হেসে উঠলেন।

আয়না আলো নিয়ে আসছে। গলা খুলে গান গাইতে-গাইতে আসছিল। কাছাকাছি এসে তপুকে দেখতে পেল। দেখতে পেয়ে ভ্রূকুটি করে বলল, "বারে, বাঃ!"

তপু কিছু বলল না।

আয়না জিজ্ঞেস করল, "বই এনেছিস?"

তপু বলল, "এনেছি। আলোটা তুই ঘরে দিয়ে আয়। বৃষ্টি এসে গেছে। আমি পালাব।"

আয়নার হাতের বাতিটা আমি নিতে যাচ্ছিলাম; আয়না নিজেই বসার ঘরে বাতি রেখে এল। বলল, "আপনার ঘরেও আলো দিয়ে এসেছি অবিনদা।"

শচিপতিকে আমি বললাম, "চলুন আমার ঘরে গিয়েই বসি।"

দেখতে-দেখতে বৃষ্টি এসে গিয়েছিল। এবারের বৃষ্টিটা প্রবলভাবেই এসেছে। চারপাশ মুখর হয়ে থাকল।

এলোমেলো, সাধারণ কথা বলতে-বলতে আমরা কখন যেন অন্য কথায় এসে পড়েছিলাম। শচিপতি বলছিলেন যে, তাঁর শরীরটা সারিয়ে নিতে পারলে আবার তিনি কিছু কাজকর্ম নিয়ে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, "আপনিও তপুর মতন একটা কিছু খুলে বসুন।"

শচিপতি হেসে বললেন, "একসময় আমিও তপুর মতন এন্টারপ্রাইজে নেমেছিলাম। দেখলাম ওতে আমার বরাত খুলল না।"

হাসির গলায় আমি বললাম, "আপনার সঙ্গে আমার তাহলে একটা বিষয়ে মিল আছে। বাণিজ্য করার দু-একটা খুচরো চেষ্টা আমারও ছিল, লক্ষ্মী আমার ধৃষ্টতা সহ্য করলেন না।"

শচিপতি সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "আমার ইচ্ছে, কাছাকাছি—তা মাইল ষাট সত্তর হবে—হিন্দু মিশন একটা হাসপাতাল খুলেছে; ঠিক যে হাসপাতাল তাও নয়, আফটার কেয়ার কলোনী, সেখানে একটা কাজকর্ম নিয়ে থেকে যাব। কিছু টাকাপত্তর যোগাড় করতে পারলে আমিও দিতে পারি।'

ওদেরও কাজে লাগে।"

শচিপতি আমায় খানিকটা অবাক করলেন। বললাম, "হাসপাতালে গিয়ে থাকবেন কি মশাই? সেখানে আপনার কাজই বা কী জুটবে।"

উনি আমায় সংক্ষেপে যা বোঝালেন তাতে মনে হয়, টাকাটা উনি দান কিংবা সাহায্য হিসেবে এক থোকে দিয়ে দিতে চান। সেখানে নানা ধরনের কাজকর্ম আছে, তার কিছু একটা জুটিয়ে নেবেন। মিশনেই থাকবেন, কাজকর্ম করবেন। নিজের রোগভোগ এলে ওটাই হবে তাঁর আশ্রয়।

মনে হল, ব্যবস্থাটা একেবারে কাঁচা নয়, শচিপতি বোধ হয় মিশনের সঙ্গে কথাবার্তাও বলে এসেছেন।

আমি বললাম, "ব্যবস্থাটা ভাল। কিন্তু এতে আপনার সুখ কী?"

শচিপতি বললেন, "সুখ জানি না। একটা আশ্রয়।"

আশ্রয়ের ব্যবস্থাটি শচিপতি যা করছেন তাতে আমার বিরক্তিই হল। মানুষটি ঠিক স্বাভাবিক নয়, কেমন যেন উদ্বিগ্ন: অসুস্থ রুগ্‌ণ কোনো জগতের মধ্যে বেঁচে আছেন।

আমি বললাম, "আপনি যেভাবে বেঁচে থাকতে চান সেটা সহজ মানুষের বাঁচা নয়। হাসপাতালে গিয়ে সেবাটেবা করে বেঁচে থাকার চেয়ে না হয় ঘুরে বেড়ান মশাই, তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়ুন, হিমালয়টিমালয় চলে যান।"

শচিপতি কোনো জবাব দিলেন না।

এমন সময় মোহিনী এলেন। পরনে পাতিলেবু রঙের শাড়ি, ঘন নীল চওড়া পাড় শাড়িটার। গায়ের জামাটি সাদা। সদ্য পাট ভেঙেছেন শাড়িটার। খসখস করছিল। গা ধুয়ে চুল বেঁধে একেবারে পরিপাটি হয়ে এসেছেন। তাঁর খঞ্জতার খুঁতটুকু যথাসাধ্য সামলে নিয়ে আস্তে-আস্তে পা ফেলে হাঁটছিলেন। শচিপতির সেটা নজরে পড়ল না।

চায়ের সরঞ্জাম রেখে দিয়ে গেল কার্তিক। মোহিনী বললেন, "শচিদা, তুমি একটু মিষ্টি খাও।" বলে মিষ্টির প্লেটটা তুলে নিয়ে এগিয়ে দিলেন।

শচিপতি হেসে বললেন, "বর্ষার মধ্যে মিষ্টি কেন? পাঁপরটাঁপর হলেই তো হত।"

"খাবে পাঁপর? ভাজিয়ে দি?"

"না-না," মাথা নাড়লেন শচিপতি, "আমার ও-সব খাওয়া নিষেধ। রোগটা নাড়ির শুনেছি। পরিষ্কার করে ডাক্তাররা কিছু বলে নি।"

মোহিনী আমায় মিষ্টি দিতে যাচ্ছিলেন। আমি মাথা নেড়ে নিষেধ করলাম। তাঁর আবির্ভাবই যে এখন অতি মধুর এটা বোঝাবার জন্যে আমি যেটুকু হেসেছিলাম সেটুকু নিঃশব্দে, মোহিনীর তাতে বিব্রত বোধ করার কারণ ছিল না।

শচিপতি আমার দিকে তাকিয়ে সরল গলায় বললেন, "অবিনবাবু মিষ্টি পছন্দ করেন না?"

আমি বললাম, "আমার পছন্দকে আমি শাসনে রাখি। আপাতত জিবকে শাসন করলাম।"

শচিপতি ঠাট্টার গলায় বললেন, "নিজেকেই শুধু শাসনের বাইরে রাখেন।"

মোহিনী আমার দিকে তাকালেন না। তিনি চায়ের কাপ তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

শচিপতি মুখেরটুকু শেষ করে হেসে বললেন, "আপনি নির্লোভ।"

"কথাটা আমার খুব একটা বরদাস্ত হয় না। মানুষের পক্ষে লোভটাই স্বাভাবিক।"

"তাহলে তো অনেক অনর্থ ঘটে যাবে সংসারে। ঘটেও তাই।"

মোহিনী আমার দিকে চা বাড়িয়ে দিলেন। চা নিয়ে আমি বললাম, "অনর্থটা ঘটত না যদি তার স্বাভাবিক লোভটাকে আমরা সহজভাবে নিতে পারতাম।"

পরিহাসের মতন করে শচিপতি বললেন, "আপনার রামদাস কি তাই বলে?"

"আমার রামদাস খাঁটি কথা ছোট করে বলে। তার উপদেশ হল, মৌমাছির গায়ে মধুর গন্ধ না থাকলে তার জাত যায়। আমি বলি, মানুষকে নিয়ে আপনারা যতটা তামাশা করেছেন ভগবানের ততটা অভিপ্রায় ছিল না।"

মোহিনী আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ বলছিল : আমায় আবার অবিনে পেয়েছে।

শচিপতি বললেন, "মানুষকে তার গোড়ার চেহারায় রেখে দিলে তার বোধ হয় কোনো লাভ হত না।"

"মানুষের আজকের চেহারা দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে এটা তার খাশা চেহারা?"

"না, তা নয়। তবু সেদিনের চেহারার চেয়ে এটা ভাল।"

"এটা তার বিড়ম্বনা। সে না হয়েছে মানুষ, না হয়েছে জন্তু। মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আপনারা তাকে নোখ কাটতে শিখিয়েছেন। তাতে তার কতটুকু লাভ হয়েছে আমি জানি না।"

শচিপতি কিছুক্ষণ কথা বললেন না। হাতের প্লেট নামিয়ে রেখে জল খেলেন সামান্য। মোহিনী চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন।

শচিপতি আমার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। মোহিনীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "অবিনবাবু আমাদের পিছিয়ে নিয়ে যেতে চান।"

আমি বললাম, "আপনারা যে এগিয়েছেন তার লক্ষণ আমি দেখি না। আমি যেখানে চাকরি করি সেটাকে লোকে বলে যাদুঘর। আপনাদের এগুবার ঢাক সেখানে বাজছে। আমি সেই ঢাকের বাদ্য শুনে ভাবি, কী নির্লজ্জ, আহাম্মক এই মানুষ। তার চোদ্দ আনা কুকীর্তি বাদ দিয়ে দু-আনা সুকীর্তি সাজিয়ে রেখে বলছে, এই আমাদের সভ্যতা। এটা পুরোপুরি জোচ্চুরি। আমি

সে ঢাকে কান দিই না।”

মোহিনী যেন কিছু বলতে চাইছিলেন, অথচ মুখ ফুটে বলতে পারছিলেন না।

শচিপতি চায়ের কাপ থেকে মুখ উঠিয়ে বললেন, “মানুষকে আপনি যতটা হেয় করছেন অতটা হেয় করে কী লাভ? তার অনেকখানি মন্দ, কিন্তু তার ভালও তো রয়েছে। সেই ভালটুকুর যদি হিসেব নেন আমার তো মনে হয় না তাতে নিরাশ হবার কারণ রয়েছে।”

আমি বললাম, “আপনাদের যুক্তিগুলো পুরনো। সুহাসরাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে এটা বোঝাবার চেষ্টা করে। আমি বলি, তোমাদের মুশকিল হল, পৃথিবীর হিসেবটা যখন করো তখন শুধু ডাঙার দিকেই চোখ রাখো, তিন ভাগ জল যে বাদ পড়ে একভাগের ডাঙায় আটকে রইলো এটা বোঝ না। মানুষের মধ্যে যেটুকু ভাল তা ওইরকম ডাঙার হিসেবে পড়ে।”

শচিপতি বললেন, “মন্দটা অত বেশী হলে আমরা টিকে আছি কি করে?”

“আমরা কতটা যে ইচ্ছে করে টিকে আছি তাতে আমার সন্দেহ আছে। বাধ্য হয়েই আছি হয়ত। ভেড়ার পাল যখন যায় তখন সে নিজের ইচ্ছেয় যায় না; অভ্যেসে যায়, লাঠির তাড়ায় যায়। আমাদের টিকে যাওয়াটা যতখানি প্রকৃতির হাতে ততখানি আমাদের হাতে বোধ হয় নয়।”

কথাটা শচিপতির পছন্দ হল না। তাঁর মুখ দেখে মনে হল তিনি আমার মতটা স্বীকার করলেন না।

একটা সিগারেটের জন্যে মন ছটফট করল। পকেট হাতড়ে সিগারেট ধরালাম। মোহিনী আমায় লক্ষ্য করলেন। শচিপতির চা খাওয়া শেষ হয়েছিল, কাপটা নামিয়ে রাখলেন।

হাসিমুখে আমি বললাম, “মানুষের নানারকম অভিমান আছে! তাকে ভেড়ার পাল বললে মানে লাগে, গাধার সমগোত্র বললে চোখ রাঙায়। মগজের মধ্যে বুদ্ধির ঘড়িটা টিকটিক করে চলছে বলে তার অহঙ্কার অনেক। এই বুদ্ধিটা তাকে শুনেছি সভ্য করেছে। আমি বলি, এই বুদ্ধিটা তার ফাঁদ। এই ফাঁদে সে মানুষকে বঞ্চনা করছে। আমরা সহজ বিচারটা হারিয়ে ফেলে শুধু দুর্ভোগে ভুগছি।”

শচিপতি মাথা নেড়ে ধীরে-ধীরে বললেন, “মানুষের বুদ্ধিই তার শুভজ্ঞান।”

আমি শ্লেষ করে বললাম, “সেই শুভটা আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। বিয়ের ছাপানো চিঠিতে শুভ শব্দটা এখনও চলে এই যা রক্ষে।”

শচিপতি আর তর্ক বাড়ালেন না।

আরও খানিকটা রাত হলে শচিপতি বিদায় নিলেন। বৃষ্টি থেমে গেছে। বাগানের মাটি ভিজে গিয়েছিল। বেলফুলের গন্ধ উঠেছে বাতাসে। ফটক পর্যন্ত শচিপতিকে এগিয়ে দিয়ে আমি ফিরছি, চোখে পড়ল মোহিনী ভেজা

বাগানে অন্ধকারে ছায়ার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কাছে এসে বললাম, "আপনার ব্যথা কি কমে গেল?"

ঘাড় ঘুরিয়ে মোহিনী আমায় দেখলেন; বললেন, "কমেছে একটু।"

"কাল হয়ত আর থাকবে না।" আমি সহজ করে হেসে বললাম।

"কেন?"

"এটা আমার ভবিষ্যৎবাণী; মিলতেও পারে, নাও পারে।"

মোহিনী কোনো জবাব দিলেন না। আস্তে-আস্তে কঁপা হেঁটে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। সামনেই বেলফুলের ঝাড়।

দু-মুহূর্ত দাঁড়িয়ে হঠাৎ উনি ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর ফিরতে লাগলেন।

"কাল সকালে গাড়ি। কিছু পড়ে থাকল না তো!" মোহিনী শুধোলেন।

আমি বললাম, "অবিন হিসেব করে বেরোয় না। ফেরার সময় তার কী পড়ে থাকল সে বুঝবে কী করে?"

মোহিনী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার দিকে তাকালেন। মুখে কথা এল না। তারপর আর কিছু না বলে হাঁটতে লাগলেন।

সিঁড়িতে ওঠবার সময় শুনি আয়না তার এস্রাজ থামিয়েছে। জ্যাঠামশাই গাইছেন : 'এই সংসার-পথ সঙ্কট অতি, কণ্টকময় হে...।।'

সিঁড়ি উঠে মোহিনী তাঁর ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিলেন। জ্যাঠামশাইয়ের গানটি হঠাৎ আমায় স্তব্ধ করে দিল। আমার মার গলায় এই গানটি আমি অসংখ্যবার শুনেছি। আজও শুনলাম জ্যাঠামশাইয়ের গলায়।

আয়না

বিনু এসেছিল সাতসকালেই। বিনু আমার বন্ধু। বিয়ের পর চলে গিয়েছে মীরাট। বছরখানেক আগে একবার এসেছিল, আর এই এল, সেও একটা বছর হব-হব করছে। বাপের বাড়িতে এসেই হুড়-মুড় করে আমার কাছে ছুটে এসেছে। জ্যাঠামশাইকে একটা প্রণাম সেরে, দুটো কথা বলে সোজা আমার ঘরে। দিদি তখন স্নান করতে গেছে।

আমায় পেয়ে বিনুর কী আহ্লাদ। তার আদরের ঘটা সামলাতে গিয়ে আমার হারের জোড়ের মুখটা খুলে গেল, ছিঁড়ে গেল। বিনু বিছানার ওপর থেকে সোনাটুকু কুড়িয়ে আমার মুঠোয় দিয়ে বলল, "এ রাম, কী হবে?"

আমি বললাম, "হবে আর কী! যাবার আগে গড়িয়ে দিয়ে যাবি।"

বিনু আমার গালে অসভ্যের মতন চটাস করে চুমু খেয়ে বলল, "দেব, দেব, তোকেই একেবারে গড়িয়ে দিয়ে যাব।" বলে আমায় বিছানার ওপর ঠেলে দিল।

হারটা এক পাশে রেখে দিয়ে বললাম, "তুই বড় অসভ্য হয়েছিস।"

বিনু খিলখিল করে হেসে উঠে চোখ নাচিয়ে বলল, "নারে, অসভ্য নয় : খুকুকে সারাদিন চটকাতে-চটকাতে আমার এই রকম অভ্যেস হয়ে গেছে। খুকুটা কী নরম রে, আনু; এক্কেবারে তুলো।"

খুকু বিনুর মেয়ে। বছর দুই বয়স হল প্রায়। গতবার বিনু যখন এসেছিল, তখন খুকু তার কোলে।

"খুকুকে আনলি না কেন?"

"বয়ে গেছে আনতে আমার। তার দিদিমার কাছে আছে, থাক। আমি বাবা দু দিন একটু হাত পা ছাড়িয়ে নি।" বলে, বিনু একটু থেমে আমার হাত টেনে নিয়ে তার হাতের ওপর মেরে-মেরে তালি বাজিয়ে পা দোলাতে লাগল। বিনুর এটা অনেক দিনের অভ্যেস, আমারও। আমরা যখন নিনা-মেমের ছোট্ট বাসগাড়িতে চেপে সেণ্ট মেরীতে পড়তে যেতাম, তখন, ন-দশ মাইল রাস্তা পাশাপাশি বসে ওইভাবে তালি বাজাতাম। স্কুলে নেমে দেখতাম, হাতের চেটো লাল হয়ে গিয়েছে। বিনু খুব ফরসা, তারই লাল হত বেশী। আমি যে যামিনী, মাঝরাতে জন্মে আমার রঙ খানিকটা কালোই হয়ে থাকল। বিনু আমায় কোনোদিন যামিনী বলে ডাকে নি, কেউই ডাকে না, শুধু জ্যাঠামশাই মাঝে-মাঝে আদর করে নামটা বলেন, যেন আমার ভাল নামটা আমাকেই মনে

করিয়ে দেন। বিনু আমার আয়না নাম থেকে আদর করে 'আনু' ডাকটা করে নিয়েছে। আনু আর বিনু। এক সময় দাদা বলত 'আনু বিনু দুই ভাই, নাচানাচি করে তাই, আনন্দে দু হাত তুলি নাচে।' আমরা সেই রকমই ছিলাম, দু-জনের ঠোঁটের গোড়ায় 'ভাইটা' ঝুলে থাকত।

বাপের বাড়িতে বিনু এসেছে কাল সন্ধ্যেবেলা। আমি খবর পেয়েছিলাম। আজ সাতসকালেই মুখপুড়ী মেয়ে ছুটতে-ছুটতে আমার কাছে এসেছে।

আমি বললাম, "বিনু, তুই আরও গোবলা হয়েছিস?"

বিনু আমার গাল টিপে দিয়ে বলল, "তুই আরও টোপলা।"

আমরা দুজনে এ ওর গায়ে টলে পড়ে হাসতে লাগলাম। বিনুটার সেই দোষ এখনও রয়েছে, হাসতে শুরু করলে থামে না, কথা বলতে আরম্ভ করলে সামনের মানুষকে হাত ধরে টেনে মুখের কাছে বসিয়ে রাখে। বিনুর হাসি থামলে তার বকবক শুরু হল। তার স্বামী আসে নি, ভাশুরের সঙ্গে সে এসেছে; ভাশুর যাচ্ছেন কলকাতায়, কাজ রয়েছে, বিনুকে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। বিনুর স্বামী তাকে নিতে আসবে। এখন নয়, বর্ষার গোড়ায়।

বিনুর একটানা কথার মধ্যে দিদির সাড়া পাওয়া গেল। তারপর দেখি, দিদি নিজেই ভিজে চুলে, আলগোছা শাড়িতে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বিনু উঠে গিয়ে দিদিকে প্রণাম করল।

দিদি হেসে বলল, "গলা শুনেই বুঝেছি, এ গলা বিনোদিনীর।......কেমন আছিস, বিনু?"

বিনুর নাম বিনোদিনী নয়, বিনতা। দাদা ঠাট্টা করে, রগড় করে বলত বিনোদিনী। আমার যামিনীর সঙ্গে একটা মিলও হয়ে গিয়েছিল বিনোদিনীর।

দিদি সামান্য কয়েকটা কথা বলে তার ঘরে চলে গেল। চুল মুছবে, কাপড়-চোপড় পরবে গুছিয়ে। যাবার সময় বলে গেল, "তুই আয় বিনু, আমি ঘরে যাচ্ছি।"

দিদি চলে গেলে বিনু বলল, "মানুদির গড়ন দেখলে আমার হিংসে হয়। দেখ না, আমি কেমন ঢপসে গেলাম, দু-বচ্ছরেই। মানুদি এখনও কী সুন্দর দেখতে।"

আমার ঠোঁটের গোড়ায় কয়েকটা কথা এসে গিয়েছিল। বলতে-বলতে বললাম না।

দু-বন্ধুতে বসে বসে খানিক গল্প হল। তারপর বিনু উঠল। বলল, "বিকেলে তুই আমার ওখানে যাবি। দুজনে বেড়িয়ে বেড়াব। রোজ তোকে যেতে বলছি না, একদিন তুই যাবি, একদিন আমি আসব। বেড়াব কিন্তু রোজ। চল, মানুদির সঙ্গে দেখা করে যাই।"

চা-টা খেয়ে বিনু চলে গেল। আমি তাকে ফটক পেরিয়েও খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ফিরছি, আমাদের বুড়ো পিয়ন সহদেবের সঙ্গে আমতলায় দেখা। সহদেব আমায় কয়েকটা চিঠি দিল। তার কপালে গরমের একটা ফোঁড়া হয়েছিল,

জ্যাঠামশাইয়ের হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়ে ফেটে গিয়ে শুকিয়ে আসছে। বলল, সে ডাক বিলি করে ফেরার পথে 'বড়বাবুর' কাছে যাবে। জ্যাঠামশাইকে সহদেবরা বলে 'বড়বাবু'; বাবাকে বলত, 'ছোটবাবু'।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেখি, একটা চিঠি দাদার, জ্যাঠামশাইকে লিখেছে। খামটা একটু মোটামোটা। একটা চিঠি আমার, অবিনদা লিখেছে। অবিনদার হাতের লেখা আমার চেনা হয়ে গেছে। এর আগেও, কলকাতায় ফিরে গিয়ে অবিনদা আমায় একটা চিঠি দিয়েছিল; আমি তার জবাব দিয়েছিলাম। এটা সেই জবাবের জবাব। দিদিরও একটা চিঠি ছিল। অবিনদাই লিখেছে। এর আগে দিদির নামে অবিনদার কোনো চিঠি এসেছে কি না, আমি জানি না। আমার হাতে পিয়ন তো আর রোজ ডাক দিয়ে যায় না।

বাগান দিয়ে যেতে-যেতেই অবিনদার চিঠিটা আমার পড়া হয়ে গেল। একেবারে ছোট্ট চিঠি, বড়-বড় হাতের লেখা। অক্ষরগুলো অবিনদার মতনই খোঁচা মারা-মারা। কথায় অবিনদার জুড়ি নেই, কিন্তু চিঠি লেখার বেলায় আর কথা খুঁজে পায় না। আমার বেশ রাগ হল। এরপর পোস্টকার্ডে বড়-বড় করে আমিও লিখব: 'শ্রীচরণেষু অবিনদা, আপনি কেমন আছেন? আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি আয়না।'...চিঠি লেখার কথাগুলো ভাবতে গিয়ে নিজেই হেসে ফেলেছি। হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, জ্যাঠামশাই।

জ্যাঠামশাইকে দাদার চিঠিটা দিয়ে দিদিকে খুঁজতে গেলাম।

দিদি ছিল ভাঁড়ার ঘরে, কমলাদির সঙ্গে সংসারের কথা বলছিল; আমি তার চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, "দিদি, তোমার চিঠি।"

"চিঠি! কার—?"

"অবিনদার।"

দিদি আমার দিকে অবাক চোখ করে চেয়ে থাকল, চিঠি নেবার জন্যে হাত বাড়াতে যেন ভুলে গেল। দিদি তাকিয়ে আছে তো আছেই, তারপর যেন চমক ভেঙে বলল, "ও! দাও।" হাত বাড়াল দিদি। মুখটা গম্ভীর। চিঠি নিয়ে কমলাদির সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

ঘরে আসতে-আসতে আমার মনে হল, অবিনদার চিঠি শুনে দিদি যেন বেশ অপ্রস্তুত হল।

জ্যাঠামশাইকে লেখা দাদার চিঠিটার কথা আমি ভাবতে লাগলাম। দাদা যা ছেলে অত মোটা-মোটা চিঠি জ্যাঠামশাইকে লিখবে না। ওর মধ্যে কি জ্যাঠামশাইয়ের কোনো হোমিওপ্যাথি ওষুধের পাউডার আছে। তাও নয়। আমি আঙুল দিয়ে টিপে-টিপে দেখেছি দাদা আমার বিয়ের কথাবার্তার ব্যাপারে জ্যাঠামশাইকে কিছু লিখেছে নিশ্চয়। নয়ত অত মোটা চিঠি হয় না।

আমার পায়ে-পায়ে টোপর ঘরে এসেছিল, চৌকাটের কাছে এমন করে পায়ে জড়িয়ে গেল যে, মুখ থুবড়ে পড়ে মরতে মরতে বেঁচে গেলাম। পাজী, হতচ্ছাড়া কোথাকার। চোখ রাঙিয়ে ধমক দিতেই ছুটে পালাল টোপর।

বিনু আমার বিছানাটকে চটকে একশা করে গেছে। পরিষ্কার করে নিয়ে একটু বসলাম। তারপর মুখছেঁড়া হারটাকে তুলে রাখতে উঠছি, পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম দিদির। দিদি আমার ঘরে এল না। তার ঘরে চলে গেল।

স্নান সেরে এসে আমার নিত্যকাজ আমি শেষ করেছি। জ্যাঠামশাইকে দুধ দিয়ে এসেছি এক কাপ। চা করেছি আমার দিদির আর কমলাদির জন্যে। দিদিদের চা দিয়ে ঘরে এসেছি, বসে-বসে চাটুকু শেষ করেছি, এমন সময় দিদি আমার ঘরে এসে বলল, "তোর একটা ছবি বের করে রাখিস।"

"ছবি?"

"আমাদের যত ফটোটটো সব তো তোর কাছে থাকে। আমার কাছে তেমন কিছু নেই।"

দিদিকে দেখতে-দেখতে আমি সব বুঝেও না বোঝার মতন করে বললাম "ফটো কী হবে?"

দিদি আমার কথা যেন শুনতে পেল না; বলল, "তোর একলার ছবি বের করবি। সেবার সেই যে সুহাসের বন্ধু জগৎ একটা ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল, সেইটে খুঁজে দেখ। আমায় দিবি।"

একটু দাঁড়িয়ে দিদি চলে গেল।

আমি তো আর খুকী নয়, সবই বুঝতে পারলাম। কলকাতায় আমার ছবি পাঠানো হবে। হয় দাদার কাছে যাবে, না হয় সেই পাত্রপক্ষের বাড়িতে। দাদা যে জ্যাঠামশাইকে কেন মস্ত বড় চিঠি লিখেছে আমি তা বুঝতে পারছি। কিন্তু অত বড় চিঠিতে কী যে লেখা আছে তা তো জানতে পারছি না।

আমার হাতে একটা ছুঁচের কাজ ছিল, সুতো তুলে কাজ করছিলাম। কাজ করছিলাম, না ছাইপাঁশ ভেবে সময় কাটছিল কে জানে, সেই কাজ হাতে নিয়ে বসে থাকলাম। আমার বিয়ের, না-না বিয়ের নয়, মেয়ে পছন্দের ছবি আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। হয়েছে বেশ। সত্যি বড় রাগ হল। দিদিদের যদি অত গরজ, আমার আলমারি খুলে ছবির খামগুলো বের করে নিয়ে খুঁজে নিলেই পারত। বয়ে গেছে আমার ছবি খুঁজতে।

দিদি যেন কী! আমি বেশ বুঝতে পারছি, দাদা জ্যাঠামশাইকে ছবির কথা লিখেছে; জ্যাঠামশাই আবার দিদিকে ডেকে দাদার চিঠি পড়তে দিয়েছেন তারপর বলেছেন, একটা ছবি খুঁজে বের করতে। দিদি আমার সেই হুকুমটি আমারই ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দিব্যি চলে গেলেন। আমার যদি ছোট কেউ থাকত, আমিও হুকুম করতাম : যা তো আমার একটা ভাল ফটো বের কর।

রাগতে গিয়ে দুঃখও হল, হাসিও পেল। আমার আর ছোট কেউ নেই, আমিই ছোট।

দুপুরে আমি ছবিটা খুঁজে বের করে রাখলাম। আমার কাছে দুটো

মোটা অ্যালবাম আছে। তা ছাড়াও খাম আছে দুটো। আমার একটা অ্যালবাম অনেক পুরোনো, আগে বোধহয় দিদির কাছে ছিল, কবে আমার হাতে এসে গেছে। তার মধ্যে আমাদের বাড়ির কত পুরোনো ছবি। প্রায় সকলের। শুধু দিদির বিয়ের কিংবা সেই জামাইবাবুর কোনো ছবি নেই। আমার মনে হয়, সে ছবিও ছিল, দিদি তার অ্যালবাম থেকে ফেলে দিয়েছে। আমি কিন্তু দিদির বিয়ের ছবি একটা পেয়েছি। কেউ জানে না। ছবিটা মার হাতবাক্সে ছিল। পুরনো কিছু কাগজ, চিঠিপত্র, দু একটা ছোট ছোট ছবির সঙ্গে মার কাছে ওটা ছিল। মা মারা যাবার পর, আমি ওটা পেয়ে যাই। ছবিটা আমি সাহস করে অ্যালবামে রাখি নি; খামের মধ্যেও নয়। অন্য জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি। যদি কোনোদিন দিদির চোখে পড়ে, কিংবা জানতে পারে, আমায় কেটে ফেলবে। দাদার কানে গেলেও কি রক্ষে থাকবে!

দিদির জন্যে আমার যে মনে-মনে একটা ভাবনা আছে এটা কেউ বোঝে না। অবশ্য দিদিকে নিয়ে কার কী ভাবনা আমাদের বাড়িতে তাও জানার উপায় নেই। কেউ কিছু বলে না। আমার অত সাহস কোনো কালেই হবে না যে আমি কিছু বলব। আমার মাথার ওপরে রয়েছে যারা তারাই যদি চুপ করে থাকে আমি সকলের ছোট হয়ে কোন সাহসে কথা বলব! আমি যেন ওসবের বিন্দুবিসর্গ জানি নে এমন ভাবে থাকি।

দিদির কপাল খুব খারাপ। কত খারাপ তা আর বলা যায় না। দিদি যখন বড় হয়ে উঠেছে আমি তখন ছোট। ছোটরা অবোধ বলে অনেক জিনিস জানতে পারে। দিদির বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি ভাবে শুরু হবার আগে একটা কথা উঠেছিল। শচিদার সঙ্গে দিদির বিয়ের কথাটা কে তুলেছিল আমার মনে নেই, তবে আমি মা-বাবার মধ্যে ওই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে শুনেছি। বাবার একটুও মত ছিল না; হয়ত মারই একটু ছিল। শচিদারা এ-শহরে আমাদের বংশের চেয়ে কোনোদিক দিয়ে নীচু নয়, ছোট নয়; ছেলে হিসেবে শচিদাকে অপছন্দ করার মতন ছিল না। কিন্তু বাবার, মার, জ্যাঠামশায়েরও মন এই বিয়েতে সায় দিচ্ছিল না। সেটা শুধু এই জন্যে যে, শচিদার পরিবারে কেউ বেশিদিন বাঁচে না, যখন তখন মারা যায়, কে যে কীভাবে মরে তাও বড় বিচিত্র। মা বাবাদের ধারণা হয়েছিল, শচিদাদের পরিবারে কোনো অভিশাপ লেগে আছে। শচিদাও হয়ত বাঁচবে না। মেয়েকে বিধবা করে বাড়ি নিয়ে আসতে কোন মা বাবা চায়! জ্যাঠামশাইও বাবার তরফে ছিলেন। আমি নিজের কানে বাবাকে বলতে শুনেছি, বাবা মাকে বলেছিল, 'দাদার মত নেই। বলছিল, মন খুঁতখুঁত করে এ-কাজ করা যায় না।'

দিদির চেয়ে আমি দশ এগারো বছরের ছোট। আমাদের মাঝ-মধ্যিখানে

দাদা! ছেলেবেলায় দাদা দুষ্টুমি করে আমাদের মাঝখানে শুয়ে পড়ে বলত : 'দুদিকে দুই কলাগাছ মধ্যিখানে মহারাজ।' মহারাজ বলেই দাদার খুব সুবিধে; দিদি তার ছোট ভাইকে যতখানি ভালবাসে অতটা আমাকেও নয়। আমি যে বোন। মেয়ে। আবার আমি দাদাকে যত মহারাজ মনে করি দিদিকে তত নয়। অথচ দিদি আমার বড় আপন, আমি তাকে তুই তোকারি করি বয়সে এতটা ছোট হয়েও। দিদি আমার মায়ের মতন, আদর আব্দার অত্যাচার, অভিমান—সবই আমার দিদির ওপর। দিদিকে জড়িয়ে-জড়িয়ে আমি লতার মতন বেড়ে উঠেছি। আবার দিদিকেই আমি সবচেয়ে মান্য করি, ভয় পাই। দিদির সঙ্গে শচিদার বিয়ের একটা কথা যে খুব চুপি-চুপি এ-বাড়িতে একবার হয়েছিল আমি কোনোদিনই সাহস করে দিদিকে তা বলতে পারিনি। দিদি আমার চেয়ে এতটা বড়, আর তার বরাবরই এমন বড়-বড় ভাবের চালচলন যে আমি দিদিকে বন্ধুর মতন ভাবতে পারিনি কোনোদিন। অথচ তখন, যখন দিদির বিয়ে হয় নি আমিও ছোট, তখন আমি দেখেছি, দিদি শচিদাকে খুব পছন্দ করত। শচিদা আমাদের বাড়িতে কত যেত আসত।

দিদির কী ভাগ্য! বাবা, মা, জ্যাঠামশাইটশাই যে-ভয়ে দিদির সঙ্গে শচিদার বিয়ে দিল না, সেই শচিদা এখনও বেঁচে রয়েছে। অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা নিয়েই। অথচ বাবা যাকে সুপাত্র ভেবে বেছে নিয়ে দিদির সঙ্গে বিয়ে দিল, ভাবল : মেয়ে সুখী হবে, সেখানেই যত সর্বনাশ হল। দিদি তো একরকম বছর খানেকের মধ্যেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে এল। কেউ কি ঠেকাতে পারল? এর চেয়ে শচিদার সঙ্গে বিয়ে হলে দিদির হয়ত ভাল হত।

আমি ছোট। আমাকে বাড়িতে সবাই ছোট করে রেখেছে। দেখতে-দেখতে আমার বয়েস পঁচিশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার না বোঝার কিছু নেই। মা বাবা যাবার আগে আমি মার ঘরে শুতাম। দিদির বিছানায়ও শুয়েছি মাঝে-মাঝে। মা মারা যাবার পর দিদির কাছেই শুয়েছি। তারপর মার ঘরটা আমি পেয়ে গেলাম। পাশেই বাবার ঘর। এই দুই ঘরের মাঝখানে দরজা রয়েছে। আমার ঘরের বাঁ পাশে দিদির ঘর। দিদির পাশে, তার গায়ে গা ঘেঁষে শুয়েও কোনোদিন আমার সাহস হল না দিদিকে তার বিয়েটিয়ে নিয়ে একটা কথা বলি। দিদিও কোনোদিন আমায় কিছু বলে নি। আমার আর দিদির মধ্যে এই আড়ালটা বরাবর থেকে গেল। আমি দিদির খুব আদরের, কিন্তু তার মনের সঙ্গী নই। এ বাড়িতে আমার তেমন সঙ্গী কেউ নেই। বাড়ির বাইরে দু-একজন ছিল। তার মধ্যে বিনুই ছিল আমার সবচেয়ে নিজের। সেই বিনুও বিয়ে হয়ে চলে গেল। থাকল তপু। কিন্তু তপু তো মেয়ে নয়, সে হল ছেলে। আমি বিনুকে যত কথা বলতে পারি, যা যা বলতে পারি, তপুকে কি তাই পারি নাকি! তবু তো আমার ঠিক মনের কোনো সঙ্গী নেই, বন্ধু নেই বলে আমি তপুর কাছে কত

কথা বলে ফেলি যা মেয়েরা কখনো ছেলেদের বলবে না। তপ্‌টাও সেই রকম। তার কোনো জ্ঞানবুদ্ধি নেই। দুমদাম যা মুখে আসে বলে দেয়। আমি যে মেয়ে এটা তার জ্ঞান থাকে না।

অনেকদিন পরে বিনু এসেছে, আমারও মন ছটফট করছে। কত কথা আছে বিনুর সঙ্গে। মন ভরে কথা বলতে না পেরে-পেরে আমার মনে কত কথা জমে আছে, মাঝে-মাঝে হাঁপ ধরে যায়। বিনু যে ক'দিন আছে আমি অন্তত মন খুলে কথা বলে বাঁচতে পারব। অবিনদা থাকতে আমি খুব বকবক করতাম তাঁর সঙ্গে। অবিনদা হেসে বলত : 'তুমি তো বেশ বক্কেশ্বরী!' আমি বলতুম, 'বা রে! আর আপনি কী?' অবিনদা বলত : 'আমি মহেশ্বর, বক্কেশ্বরের সম্বন্ধী।' হেসে আমি মরি। দিয়েছিলাম জোর চিমটি কেটে, হাতের নুন ছাল উঠে গিয়েছিল অবিনদার। অবিনদা উঃ আঃ করে হাত সামলে বলল : 'তোর চিমটিটা ভাই মহেশ্বরের চিমটে।' অবিনদা সেই আমাকে তুই বলল। এ সবই যাবার আগের দিন। পরের দিন অবিনদা চলে গেল।

বিকেলে চুল বেঁধে সবে চিরুনিটা পরিষ্কার করে রাখছি দিদি ডাকল, আয়না।

দিদির ঘর থেকে ডাকলে আমার ঘরে শব্দটা যে কোন দিক দিয়ে ভেসে আসে বুঝতে পারি না। কখনও মনে হয় জানলা দিয়ে এল, কখনও মনে হয় দরজা দিয়ে। আমাদের পাশাপাশি ঘর হলেও এত বড় বড় ঘরে শব্দ ভেসে আসতে দেরী হয়। বেশ জোরে না ডাকলে শোনাও যায় না।

দিদির ঘরে গেলে দিদি বলল, "ছবি বের করেছিস?"

আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মাথা নাড়লাম।

"বের করিস নি? তোকে বললাম যে—!"

"খুঁজে দেখি নি; পরে দেখব।" একেবারে নির্জলা মিথ্যে বললাম। বেশ করলাম বললাম। আমি আমার ছবিটা এনে দিদির কোলে ফেলে দিই আর কি! আমার আর লজ্জা-শরম বলে কিছু নেই।

দিদি বলল, "তুই বড় গেঁতো। একটা ছবি বের করতে কি সাতদিন লাগবে। জ্যাঠামশাই সন্ধ্যেবেলায় আবার তাগাদা দেবে।"

আমি খুব একটা অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে বললাম, "তুমি একটা দিয়ে দাও না।" বলে ঠোঁট ওলটালাম।

দিদি খুব চালাক। আমার মুখ দেখে ও যেন সব বুঝতে পারল। হঠাৎ কেমন হেসে বলল, "বেশ তো, আমি যা হাতের কাছে পাই দিয়ে দেব। পিকনিকে তোর খিচুড়ি খাবার ছবিটা ভালই উঠেছিল। সেটাই দিয়ে দেব।"

আর কি আমি দাঁড়াই! পালিয়ে যাচ্ছি, দিদি জিজ্ঞেস করল, "তোর সাত তাড়াতাড়ি চুল বাঁধা হয়ে গেল যে!"

"বিনুর কাছে যাব।"

গা ধুয়ে, শাড়ি জামা বদলে আমি ঘরে বসেই চা খেলাম। তারপর চললাম বিনুর বাড়ি। একবার ভেবেছিলাম, জগৎদার তোলা আমার ছবিটা নিয়ে যাই লুকিয়ে, বিনুকে দেখাব। সে বলতে পারবে ছবিটা ভাল না মন্দ। বিনুর চোখই প্রথমে পছন্দ করুক। তারপর ভাবলাম, এটা একেবারে বেহায়ার মতন হবে। বিনু তো আমার কাছে আসবেই, তখন না হয় দেখাব। এমন যদি হয়, কাল সকালেই জ্যাঠামশাই চিঠির জবাবের সঙ্গে ছবি পাঠিয়ে দেন তবে আর বিনুকে দেখানো হবে না। ওরই কাছাকাছি একটা ফটো আছে আরও, সেইটেই না হয় দেখিয়ে দেব। একটাতে একটু ঘাড় ফিরিয়ে আছি, আর অন্যটায় আছি সোজাসুজি মুখে।

বিনুদের বাড়ি যেতে খানিক হাঁটতে হয়। বাঁ দিকের মাঠ ধরে 'অরুণ কুটির' ডাইনে রেখে কাঁঠালতলা দিয়ে গেলে মাঝখানে একটা পুকুরের মতন পড়ে, তার পাশ দিয়ে চলে যাব। অনেকটা কাছে হবে।

যেতে-যেতে দেখি, অনেকটা দূরে টিকরিদের গ্রামের কাছে পলাশবন আর মাঠের ওপর দিয়ে ধুলোর রাশি উড়ে যাচ্ছে, মনে হয় যেন দূরে রোদের মধ্যে বৃষ্টি নেমেছে। জঙ্গল আর পাহাড় কালচে হয়ে আকাশের গায়ে মিশে যাচ্ছিল। রোদ সরে গেছে কখন, আভাটা ওপর ওপর ছড়ানো। মাটির তাত আর পায়ে লাগছে না অতটা। বৃষ্টি যে কবে নামবে? পুকুরের মধ্যে দুটো মোষ তখনও ডুবে আছে। একটা চরাণ-ছেলে মোষ দুটোকে উঠে আসতে ডাকছে।

বিনুর বাড়িতে বিনু তখনও তৈরী হয় নি, সে তৈরী হতে বসল। দেরীও হল। খুকুকে দেখতে বেশ সুন্দর হয়েছে। খুব চনমনে। মেয়েটাকে কোলে তুলে নাচিয়ে আমিই হেসে মরি, ও আমায় জিব দেখাল আগাগোড়া। যশোদা-মাসিমা বললেন, 'হ্যাঁরে, আজ দু-তিন মাস তোর মুখ দেখতে পাই নি, যেই বন্ধু এসেছে অমনি ছুটতে-ছুটতে এসেছিস যে বড়। কে তোকে বাড়ি ঢুকতে দিল?'......আমি বললাম, 'বারে, এই তো সেদিনই আমি এলাম। এক মাসও হয় নি।' যশোদামাসিমা খুব ভুলো-মনা। 'ভাবলেন, আমি বোধ হয় সত্যিই গিয়েছিলাম; আর কিছু বললেন না। খুকুকে বিনু সঙ্গে নিল না। সে তার দিদিমার সঙ্গে পাড়া বেড়াতে বেরুবে। দিদিমার সেই রকম ইচ্ছে।

বিনু আর আমি বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের পছন্দসই অনেকগুলো জায়গা ছিল বেড়াবার। আমরা আগে সেখানে কত ঘুরে বেড়াতাম। একটা মাঠ ছিল কাছাকাছি, ঢালু হয়ে অনেকদূর চলে গেছে, তারপর একটা বিল। মাঠটা

আমাদের খুব পছন্দ ছিল। নেড়া মাঠ, মাটি খুব শক্ত, একটা খেজুর গাছ বেঁকে দাঁড়িয়ে থাকত মাঝমধ্যিখানে। আমরা মাঝে-মাঝে টিলা ধরে স্টেশনে চলে যেতাম। স্টেশনের প্লাটফর্মের বেঞ্চিতে বসে গল্প করতাম। আর-একটু জায়গা ছিল, খুব নিরিবিলি, রেলের বাংলো বাড়ির পাশে সাঁকোর কাছটায়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিনু বলল, "আজ বড় দেরী হল, আনু। আজ আর মাঠে যাওয়া হবে না। চল, স্টেশনে যাই। ওখান থেকে তোকে আমি লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে ফিরব।"

আমি সায় দিয়ে বললাম, "চল।"

স্টেশন কাছেই। রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে বিনু কত রকম বকর-বকর করে চলল।

"হ্যাঁরে আনু, তোর সেই সরস্বতীকে মনে আছে?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"আজ দুপুরে সে এসেছিল। বুড়ির মাথাটা সাদা। এসেছিল মার কাছে। ওর ছেলেটা সেজমামার ওখানে চাকরি করত। একটা আঙুল কাটা গেছে মেশিনে। এখন ভাল আছে। খবরাখবর নিতে আসে। বুড়ি আমায় তোর কথা বলল।"

সরস্বতী একসময় আমাদের নিনামেমের গাড়িতে দাইগিরি করত।

বিনু সরস্বতী ফেলে সেণ্ট মেরীর গল্প ওঠাল। তারপর আবার তার স্বামীর গল্প।

"আমার বরের, বুঝলি আনু, মাথায় যা টাক পড়ছে, একেবারে সেই ফাদার গিয়ারসনের মতন। রোজই ভাই এক আধুলি করে বাড়ে।"

আমি হেসে বললাম, "তাহলে তো একেবারেই টরেটক্কা হয়ে গেছে, ভাই।"

বিনু হিহি করে হেসে উঠে বলল, "গেছেই তো। আমি আচ্ছাসে দিই। বলি আগে জানলে অমন টেকো টরেটক্কাকে বিয়েই করতুম না। তা বলে কী জানিস? বলে বিয়ের পর যে পুরুষমানুষের টাক পড়ে না সে নিশ্চয় হনুমান। তার কাণ্ডজ্ঞান জন্মায় নি।"

"তা বিয়ে করতে এল কী করে?"

"পরচুলা পরে। আমি তো বলি তুমি পরচুলা পরে বিয়ে করতে গিয়েছিলে!" বিনু কী জোরেই না হেসে উঠল। আমিও হাসতে লাগলাম।

স্টেশনের ওভারব্রিজ উঠে আমরা ডাউন প্লাটফর্মে নেমে গেলাম। ফাঁকা প্লাটফর্ম। এখন কোনো গাড়ি নেই। দু-জনে মোরম দেওয়া প্লাটফর্মটায় হাঁটতে হাঁটতে সিমেণ্টের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছ। ফুল রয়েছে মাথায়।

বেঞ্চিতে বসে বিনু খানিকটা জিরিয়ে নিল। গোধূলি শেষ হয়ে আসছে। কত বক আর পাখি উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে।

বিনু বলল, "আনু, তোর খবর-টবর বল।"

“আর কী বলব রে? বললাম তো সকালে।”

“ও খবর না। অন্য খবর। ...তোর কথা আমি কত ভাবি রে, আনু। ...ভাবি, তোর জন্যে একটা সম্বন্ধ ঠিক করি। এক আধবার চেষ্টাও করেছি। আমার ঠিক সাহস হয় না, ভাই। তোরা কত বড় ফ্যামিলি। তা ছাড়া কী জানি বাবা, দিদিকে তোর বিয়ের কথা লিখে ফ্যাসাদে না পড়ে যাই। ...সত্যি আনু, তোকে আর এভাবে দেখতে আমার ইচ্ছে করে না।”

আমি চুপ করে থাকলাম। বিনু আমার হাত ধরে টেনে আস্তে-আস্তে তালি বাজাতে লাগল। আমার দিকে সে চেয়ে আছে।

“দাদা একটা সম্বন্ধ এনেছে,” আমি বললাম।

“এনেছে? কোথায়?”

“কলকাতায়।”

“কী করে ছেলে?”

“জানি না। গরুটরু চরায় হয়ত।”

বিনু হেসে উঠে আমার পিঠে কিল বসিয়ে দিল। “পোড়ারমুখী। ...তার-চেয়ে বললে পারতিস, ধেনু চরায়। বৃন্দাবনে বনে আমি ধেনু চরাব।”

আমি হেসে উঠলাম। বিনু যা করে ভেঙিয়ে ধেনু চরাবার গানটা গেয়েছিল।

“ঠিক করে বল, আনু?”

“সত্যি আমি জানি না। কিছু একটা করে নিশ্চয়।”

“কী করে!”

“আমি কি দেখেছি!”

“শুনেছিস তো—!”

“আমি আস্তে করে মাথা নাড়লাম। না, শুনি নি।”

বিনু ঠেলা মেরে মুখ ভেঙিয়ে বলল, “নেকি রে—!”

আমি বললাম, “ন্যাকামি করব কেন! আমাদের বাড়িতে আমার বিয়ের গল্প কে আমার সঙ্গে করবে বল? জ্যাঠামশাই, না দিদি—কে করবে?”

বিনু যে এটা না জানে এমন নয়। সে বুঝতে পারল।

“অবিনদার মুখে আমি একটু-আধটু শুনেছি।” আমি বললাম।

“কে?”

“অবিনদা। দাদার বন্ধু। এবারে দাদার সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলেন। অবিনদা বলছিলেন, ছেলে ভাল, চাকরিবাকরি করে, কলকাতায় বাড়ি আছে...এইসব।”

বিনু আদর করে আমার কানের পাশে গলার কাছে আঙুল বুলিয়ে দিয়ে বলল, “দেখতে কেমন?”

“রাজপুত্তুর।” ঠাট্টা করে বললাম।

বিনু হাসল। বলল, “সব ঠিক?”

“দু-র, ঠিক কোথায়? কথাবার্তা পাড়া হয়েছে। আমার ছবি দেখবে, পছন্দ করবে, যদি পছন্দ হয় দেখতে আসবে, কোষ্ঠীবিচার করবে...কত কী রয়েছে।

এ তো সবে শুরু।”

বিনু আমার মুখের দিকে সামান্যক্ষণ চেয়ে থেকে চোখ সরিয়ে সামনের দিকে তাকাল। ওপারে আপ্ প্ল্যাটফর্মে স্টেশনবাবুদের অফিস। কাগজ আর চায়ের পুরোনো স্টল। দু-চার জন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা কুলি। মাল-গুদোমের দিক থেকে ধোঁয়া উঠে আসছে, একটা ছোট কয়লা এঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে।

বিনু বলল, “তোকে একটা কথা বলি আনু। তোর অনেক আগেই বিয়ে-থা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আমরা গরীব-সরীব মানুষ।” বিনুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে এবার আমি একটা কিল মারলুম তার পিঠে। বিনু কিল হজম করে নিয়ে বলল, “আমাদের বাড়িতে যোগাড়যন্তর করে পছন্দমতন ছেলে খুঁজে বিয়ে দিতে দেরী হয়। তোদের বাপু অত হাঙ্গামা নেই। বড় পরিবার, কত নামডাক,চেনাশোনা। তোর অনেক আগে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। দেখতে-দেখতে আমাদের বয়েসটা কত হয়ে গেল বল তো!”

হেসে ওঠার কথা নয়, তবু আমি হেসে বললাম, “তোর আর বয়েস হল কোথায়?”

“যাই বলিস, তোদের বাড়িতে দেখলাম, কেউ আর গা করল না।...কবে কী একটা হয়ে গেছে বাড়িতে তা নিয়ে বসে থাকলে কি চলে!”

দিদির কথাটা বিনু স্পষ্ট করে বলল না, ইঙ্গিতে বলল।

আমি চুপচাপ।

বিনু একটু সময় চুপ থাকল। তারপর দেখি বেঞ্চ ছেড়ে উঠে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে। খানিকটা এগিয়ে প্লাটফর্মের কিনারায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে ডেকে কী বলল চেঁচিয়ে, তারপর ফিরে এল।

“ভাঁড়ের চা খাব,” বিনু বলল, “সেই লোকটা আর নেই রে, না? ঢেঙা মতন?”

“স্টেশনে বসে চা খাবি কেন? তোর যে কী—”

“ভাঁড়ের চা নয় রে, চায়ে যে মাটির গন্ধ থাকে, নাকে লাগে, আমার খুব ভাল লাগে।”

“তা হলে ভাঁড়ে করে জল খা, কিংবা একটা ভাঁড় নিয়ে শোঁক বসে বসে—” আমি হেসে বললাম।

বিনু হাসতে লাগল।

সামান্য পরে বিনু জিজ্ঞেস করল, “তোর বিয়েটা হচ্ছে কবে? আমি তাহলে থেকে যাব।”

“তোর দেখছি, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।”

“করলে তাড়াতাড়ি করে ফেল বাপু। আষাঢ়ে কর, শ্রাবণের গোড়ায় কর।”

“তাই করব। তুই চুপ কর তো।”

চুপ করার মেয়ে বিনু নয়, একটু পরেই বলল, “তুই কলকাতায় গিয়ে

থাকতে পারবি, আনু?"

হেসে আমি বললাম, "কেন?"

"কলকাতা বিচ্ছিরি জায়গা। আমাদের মতন লোকের পোষায় না। আমরা হলুম ঢিলেঢালা মতির মালা; আমাদের আপন পর কম, আমরা ভাতের পাতে নিমপাতা খেলেও মুখে নিম নই। কলকাতা হল নেবু নুচির জায়গা, বুঝলি আনু; যে যার সে তার সেখানে; চালের রাজত্ব। খালি বাহার আর ঝকমকি। আমার এক ননদ গিয়েছিল কলকাতা থেকে বেড়াতে, আইবুড়ো ধাড়ি মেয়ে. সারাক্ষণ তার নোখ রঙ করছে, ঠোঁট রঙ করছে, চুল ঘষছে মাথার। একটা রুটি বেলতে জানে না, অকর্মার ধাড়ি। হরবখত সিনেমার মেয়েদের গল্প। ওখানে তুই থাকতে পারবি না, দম আটকে যাবে।"

আমি কথা বলছিলাম না। বিনুর একটানা কথা শোনার পর কেউ চট করে কথা বলতে পারে না, তারই কথার তোড়ে অন্যের কথা ভেসে যায়। চুপ করে আছি আমি, দেখি রেল লাইন টপকে চা-অলা চা আনছে।

গোধূলি বলে আর কোথাও কিছু ছিল না। আকাশ নীলচে-কালো হয়ে আসছে। বাস স্ট্যান্ডে বোধ হয় একটা বাস এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যের গাড়ি আসতে আসতে সাতটা। হাওয়াটা চমৎকার বয়ে যাচ্ছিল।

চা-অলা এসে মাটির খুরিতে চা দিয়ে গেল। বিনুর রুমালে যে টাকা পয়সা ছিল বুঝি নি। ও পয়সা মিটিয়ে দিয়ে একটা পান-অলাকে পাঠিয়ে দিতে বলল।

আমি বললাম, "তুই যা বলছিস বিনু, আমি জানি। তবু আমার কলকাতা যেতে ইচ্ছে করে।"

"বিয়ের আগেই তোর টান পড়ে গেছে পোড়ারমুখী?" বিনু চায়ের খুরি মুখে দিয়ে হাসল।

"নারে, এখানে আর আমার ভাল লাগে না। জন্মে পর্যন্ত এই জায়গায় কেটে গেল। সবই সেই, যা দেখেছি জ্ঞান হয়ে তাই থেকে গেল। একই জায়গা, একই বাড়ি—আর যেন ভাল লাগে না।"

"ও তোর বিয়ের জন্যে মনে হচ্ছে ছটফট করছিস। মেয়েদের আবার বিয়ের আগে কানপুর, বিয়ের পর জব্বলপুর তো!"

"যাঃ, কী যে বলিস—!"

"ঠিকই বলেছি।"

"বিয়ের জন্যে আমার কলকাতা যেতে মোটেই ইচ্ছে করে না। বরং ভয়ই করে। আমরা একভাবে মানুষ, কলকাতায় বিয়ে হলে কোন্ ধরনের মানুষের পাল্লায় পড়ব, কে জানে। আমরা কলকাতাকে ভয় পাই রে। এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না একঘেয়েমির জন্যে। জন্মকাল থেকে তো এখানেই আছি। আর কত থাকব? দাদা তো আমাদের কলকাতাতেই চলে আসতে বলে। কিন্তু জ্যাঠামশাই থাকতে তো নয়ই, দিদি যতদিন আছে ওই বাড়ি আঁকড়ে পড়ে

থাকবে।"

বিনু চায়ের খুরিটা ছুঁড়ে রেললাইনে ফেলে দিল। আমার তখনও একটু চা বাকি। বিনুকে খাতির করে চাটুকু ভালই করেছে।

"কী জানি—!" বিনু বলল, "আমার যদি এখানে কোথাও বিয়ে হত আমার মোটেও খারাপ লাগত না।"

আমি হেসে বললাম, "আমার তো এখানে বিয়ে হচ্ছে না।—বিয়েটিয়ের কথা বাদ দে, আমি যেভাবে থাকি সেইভাবে থাকতে ভাল লাগে না। একদিকে বুড়ো জ্যাঠামশাই আর-একদিকে দিদি। দাদা আসে দু-চার মাস অন্তর দু-পাঁচদিনের জন্যে। আমার কথা বলার মানুষ নেই, বন্ধু নেই। তুই ছিলি আগে, এখন তুইও চলে গিয়েছিস। এভাবে থাকতে ভাল লাগে?"

বিনু যেন বুঝল ব্যাপারটা। বলল, "তাহলে আর কী, বিয়ে করে কলকাতাতেই যা।"

"বিয়েটা কি আমার হাতে রে, বিনু? আমি কিছুই নয়, বড়রা যেখানে তুলে দেবে হাতে করে আমায় সেখানেই যেতে হবে, সে কলকাতাই হোক আর বম্বাই হোক। কলকাতায় বিয়ের জন্যে আমার একটুও শখ নেই।"

"নেই বলছিস?"

"না।"

"তবে?"

"তবে আর কী! বরং আমারই কেমন ভয় করে মাঝে-মাঝে। এখন আরও যেন মনের মধ্যে কেমন করে। এখানে থাকার চেয়ে কলকাতা পালাতে পারলেই আমার ভাল।"

বিনু আমার দিকে তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টে। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বলল, "তোর ভয় করে? কিসের ভয়?"

কিসের যে ভয় বিনুকে আমি কী করে বোঝাব! বিনু বিয়ের পর এই জায়গা ছেড়ে চলে গেছে। সে যখন ছিল তখন তার আনু যেমন ছিল আজও কি সেইরকম থাকতে পারে? বিনুর নিজেরই কত অদলবদল হল, আর আমার হতে পারে না?

আমি কিছু বলতে পারছিলাম না, অথচ আমার মন যেন মুচড়ে উঠছিল। নিশ্বাস পড়ল কতবার।

"বিনু এবার ওঠ। সন্ধ্যে হয়ে গেছে।" আমি বললাম।

"বললি না?"

"বলবো'খন। আমি নিজেই যে ছাই বুঝতে পারছি না। তুই তো আছিস রে। বলব তোকে; একটু গুছিয়ে নি।"

আমরা উঠে পড়েছি, পানঅলা একটা বাচ্চাকে দিয়ে পান পাঠিয়ে দিয়েছে। পান নিয়ে বিনু মুখে দিল। আমাকেও খেতে হল।

ওভারব্রিজে এসে বিনু বলল, "আনু, তুই কিন্তু আগের মতন আর নেই।"

কেমন যেন লাগল কথাটা। "নেই কিরে?"

বিনু মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, "না। আমি ঠিক বলছি। আমি তোর নাড়ি-নক্ষত্র জানি। তুই কিছু করেছিস।"

বিনু হাঁটতে লাগল।

আমরা উলটো দিকের ওভারব্রিজ দিয়ে নেমে ছেদীবাবুর বাস অফিসের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি রেল লাইনের গা ধরে, হঠাৎ শুনি পেছনে সাইকেলের ঘণ্টি বাজল।

মুখ ফিরিয়ে দেখি তপু।

সাইকেল থেকে নেমে তপু বিনুকে থিয়েটারী কায়দায় অভ্যর্থনা করে বলল, "আরে ব্যাস, বিনুপিসি যে! তোকে তো আমি মালগুদোমের পিপে ভেবেছিলাম রে।"

বিনু বেশ জোরে তপুর কাঁধের কাছে চড় কষাল। "তোর মতন নেঙটি হয়ে থাকব নাকি!"

তপু হাসতে লাগল। আমরা হাসাহাসি করতে করতে রেল ফটক পর্যন্ত গেলাম। তারপর বিনু বলল, "এই তপু, তুই আনুকে পেঁছে দিয়ে আয়।"

তপু বলল, "সাইকেলে করে?"

বিনু বলল, "বাঁদরামি করবি না। যা, ওকে পেঁছে দে। আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছি। কাল একবার আসবি।"

বিনু গেল তার বাড়ির দিকে। আমি আর তপু হাঁটতে লাগলাম পাশাপাশি। আমি একটু সরে-সরে যাচ্ছিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে তপু বলল, "বিনুটার কী হাল হয়েছে রে? ও যে ব্যাঙ হয়ে গেল!"

আমি বললাম, "যাঃ, কী বলছিস! একটু গোলগাল চেহারা হলেই ব্যাঙ হয় নাকি!"

তপু হাসতে হাসতে বলল, "তোদের চোখে যে কোন্‌টা একটু আর কোন্‌টা আধটু আমি বাবা বুঝি না। বিনু কমসে-কম আধ মণ ওজন বাড়িয়ে ফেলেছে। এই রেটে চললে ও ফেটে যাবে।"

তপু বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছিল। বিনু বরাবরই খানিকটা ঢিলেঢালা চেহারা; গোলগাল গড়ন তার, বিয়ের পর বাচ্চাকাচ্চা হয়ে আরও নাদুসনুদুস দেখায়, তা বলে সে মুটিয়ে বেয়াড়া হয়ে যায় নি। আমি বিনুর হয়ে বললাম, "বিনুর চিন্তা তার বর করবে, তুই চুপ কর; তোর মাথা ব্যথার দরকার নেই।"

সাইকেলের সামনের চাকাটা এ'কিয়ে বে'কিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছিল তপু, হোহো করে হেসে উঠে বলল, "আমার মাথাই নেই, তো ব্যথা!"

"ঘাড়ের ওপর তোর যেটা আছে সেটা কী?"

"ওকে মাথা বলে না; ওকে বলে মুণ্ডু—", তপু ফাজলামি করে বলল, "মাথা আর মুণ্ডুর মধ্যে অনেক তফাত। মাথা থাকলে মগজ থাকে, মানে তোর সার-পদার্থ, ইনটেলিজেন্স। আর মুণ্ডু হল নেহাতই খুলি, একটু-আধটু ঘিলু থাকতে পারে।"

"ঠিকই বলেছিস, যেমন ছাগলের মুণ্ডু, ছাগমুণ্ড।" আমি খিলখিল করে হেসে উঠলাম। তপুও বিরাট করে হেসে উঠল।

হাসি থামলে তপু বলল, "তোরা দুজনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি কোথায়?"

"স্টেশনে বেড়াতে গিয়েছিলাম।"

"বিনু এখন থাকছে তো?"

"বর্ষা পড়ে গেলে যাবে। তোকে কাল ডেকেছে না, গেলেই সব জানতে পারবি।"

তপু চুপচাপ হাঁটতে লাগল। সারা দিনের গরমটা এখন পুরোপুরি কেটে গেছে। মাঠ আর জঙ্গল দিয়ে গা-জুড়োনো ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছিল। মাঠের সন্ধ্যেবেলার গন্ধও নাকে এসে লাগছে। অশ্বত্থ গাছের ওপারে বারোয়ারী কুয়ায় কারা জল তুলছিল, তাদের গলা, চাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আকাশে কোথাও চাঁদ উঠি-উঠি করছিল।

আমি শুধোলাম, "তুই কোথায় গিয়েছিলি?"

তপু বলল, "আমি ধান্দায় ঘুরছিলাম।" বলে একটু থেমে আবার বলল, "আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে—"

"তোর মুণ্ডুতে বল", আমি ঠাট্টা করে বললাম।

"তাই সই। আইডিয়াটা শোন্—" তপু বলল, "বিলাসীবাবুর মস্ত গুদোমটা ফাঁকা পড়ে আছে। কোন্ গুদোমটা বুঝলি? ওই যে তোদের কালীমন্দিরের কাছে, বাজার ছাড়িয়ে খাপরার ছাদ করা বাড়ি, সামনে কাঠের জাফরি—সেইটে। ওই গুদোমের গায়ে দেখেছিস কেরোসিন তেলের কবেকার একটা রঙচঙে টিন আটকানো আছে। আমি ভাবছি, কেরোসিন তেলের স্টকিস্ট হব। বিলাসীবাবু তো কারবার গুটিয়ে ফেলেছে। আমি কথাবার্তা বলেছি, যোগেনদার সঙ্গে গিয়েছিলাম একদিন। বুড়ো রাজী দেখলাম। বুঝলি আয়না, আমি যদি কেরোসিন তেলের ডীলার হতে পারি, পাইকেরী খুচরো দুই-ই বিক্রী করব, তা হলে আমায় মারে কে? আরে এখানে দেহাতী থেকে শুরু করে ভদ্দর লোকদের বাড়ি—সকলকেই কেরোসিন তেল কিনতে হয়। তোদের ক' টিন লাগে মাসে?"

তপুর অশেষ বুদ্ধি। হেসে বললাম, "তোর মাথায় বেশ তেল ঢুকেছে। আমাদের ক' টিন লাগে দিদিকে জিজ্ঞেস করিস।"

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তপু বলল, "তুই ভাবছিস আমি ঠাট্টা করছি?"

"মোটেই নয়।"

"ঠাট্টা করবি না। আমি খুব সিরিয়াস। যত বাইরের লোক এসে এখানে জমিয়ে বসে পড়ল, আর আমরা লোকাল লোক হয়ে বুড়ো আঙুল চুষবো! তুই দেখ না, আমি পুজোর মধ্যেই লাগিয়ে দিচ্ছি।"

"লাগিয়ে দে।"

তপু হাঁটতে-হাঁটতে থেমে গেল। সাইকেলটাকে কোমরের কাছে হেলিয়ে রেখে পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বের করল। আমি দু' পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

সিগারেট ধরিয়ে তপু বার দুই টান মেরে নিয়ে আবার সাইকেল ঠেলতে-ঠেলতে এগিয়ে চলল। বলল, "আমার কিছু টাকা-পয়সা লাগবে। বাড়িতে বলব কি বলব না ভাবছি। আমার ফাদারমশাই শুনলে একচোট ফায়ার হবে, আর মা-জননী তো সত্যনারান শনি ছাড়া কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। ঝামেলাটা ওইখানে।"

আমি যেন তপুর ব্যবসাবুদ্ধিতে কতই না গলে গিয়েছি, দুর্ভাবনার গলা করে বললাম, "তাহলে করবি কী?"

"থিংকিং।...ভাবছি চুরি করব।"

"চুরি?"

"ফাদারের টাকা চুরি করা যাবে না। পোস্ট অফিসে থাকে। তেমন কিছু নেইও। মার গয়নাফয়না কিছু নেওয়া যেতে পারে।"

আমি তপুর কাঁধে দিলাম এক থাপ্পড় কষিয়ে। "কী গুণধর ছেলে রে! বাঁদর।"

তপু হাসতে-হাসতে বলল, "বাঁদরামির কী দেখলি! মার গয়নায় আমার রাইট্ আছে। দাদা, বড়দি, ছোড়দি—সবাই যে যার শেয়ার পেয়ে গেছে। আমারটাই রয়েছে", বলে তপু আবার দু' টান সিগারেট খেল; বলল, "দিদিদের বিয়েতে মা সোনা বের করে দিয়েছে, দাদার বিয়ের পর থেকে বউদিকেও এটা-সেটা গড়িয়ে দিয়েছে। আমিই শুধু বাকি আছি।"

আমি হেসে বললাম, "তোকেও কি হার আর হাতের বালা গড়িয়ে দেবেন নাকি?"

"তুই বড় মুখ্যু আয়না, মেয়েরা মুখ্যু হয়—কিন্তু তোর স্ট্যাণ্ডার্ড আরও লো।...আমায় কেন দেবে। আমার বউকে তো দেবে। সেটাই আগেভাগে দিয়ে দিক।"

হাসতে-হাসতে বিষম খেয়ে মরি আর কী। ভাগ্যিস রাস্তায় লোক ছিল না। তফাতে পড়শীর মুদির দোকানে দু-চারজন সওদা করছে। আমার হাসি রাস্তা ছাপিয়ে মাঠে ছড়িয়ে পড়ছিল।

তপু হাসছিল না। ইচ্ছে করেই গম্ভীর হয়ে ছিল।

হাসি থামলে আমি একটু দম নিয়ে বললাম, "তোর আবার বিয়ে হবে নাকি?"

"হবে না?" তপু ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মজার গলা করেই, যেন তার বিয়ের সবই ঠিক করা আছে।

"যাঃ—!"

"কিসের যাঃ—?"

"তোর আবার বিয়ে হবে কী! তোকে কে বিয়ে করবে?"

তপু খুব যেন অবাক হয়েছে, থিয়েটারী ভঙ্গি করে বলল, "কেন! আমার রিকোয়ার্ড কোয়ালিফিকেশান কোনটা নেই? প্রথমে ধর ফ্যামিলি! আমার ফ্যামিলি খুব রেস্‌পক্টেবল, সার্টিফিকেট আছে বাবা—দেখিয়ে দিতে পারি। তারপর ধর আমার কোয়ালিফিকেশান, স্মার্ট চেহারা, পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা, বডি ওয়েট্‌ ষাট কেজি; গায়ের রঙ ফরসা, মুখের কাটিং শার্প—"

তপুকে জোরসে এক ঠেলা মেরে আমি হাসতে লাগলাম হিহি করে। "তোর কোনো কোয়ালিফিকেশান নেই। একটা চাকরি জোটাবার মুরদ নেই তোর, তোকে লোকে মেয়ে দেবে। যা যা, বাজে বকবক করিস না।"

তপু খুব আহত হবার ভান করে বলল, "চাকরিটা বড় কথা হল? এই যে আমি কেরোসিন তেলের ডীলার হচ্ছি এটার দাম নেই? আমার মান্থলি ইন্‌কাম কত হবে তুই কল্পনা করতে পারছিস?"

"আঃ তপু; চুপ কর। আর বকবক করিস না।"

তপু চুপ করে সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে এগিয়ে চলল। যেন কতই না মনঃকষ্ট পেয়েছে।

জীবনবাবুর বাড়ি আমরা পেরিয়ে এসেছিলাম। 'শান্তি-কুঞ্জ'র মস্ত বাগানের মাথা ছাড়িয়ে চাঁদ উঠেছে। আলো যেন আস্তে-আস্তে ফুটে আসছিল। রাস্তা দিয়ে কখনো-সখনো এক-আধজন চলে যাচ্ছিল। দেবদারু গাছের পাতা জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হয়ে আসছে।

তপু তার হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "তোর কোনো মায়া নেই আয়না, বুঝলি। মেয়েরা বরাবর সেলফিশ হয়। তুই একেবারে থার্ড ক্লাস বন্ধু।"

হেসে উঠে আমি বললাম, "কেন, তোর বিয়ে ভেঙে দিলাম বলে?"

"তা তো দিলিই।...তা তুই-ই আমায় কিছু ক্যাপিটাল দে।"

"আমি?"

"হ্যাঁ, তুই কিছু টাকা দিয়ে দে।"

"আমার গাছ আছে টাকার?"

"গাছ কেন থাকবে! তোর দেদার গয়না আছে। দু-দশটা আমায় দিয়ে দে। আমি তোকে সুদ সমেত ফেরত দেব।"

"আহা, আমার চাঁদ রে—!"

"বিশ্বাস করছিস না? তুই অত গয়না নিয়ে কী করবি?"

"বিয়ের সময় পরব।"

"তোর বিয়ে?"

"আমার বিয়ে।"

"যাঃ! তোর আবার বিয়ে কোথায়?"

"হচ্ছে।"

"হ-চ্ছে! কী বলছিস রে? মাইরি, হচ্ছে?"

"মাইরি হচ্ছে," আমি মুখ ভেঙচে বললাম।

তপু দু-মুহূর্ত আমায় দেখল, তারপর জোরে শিস দিয়ে উঠল। "আরে শ্বাস, ভেরী সিকরেট নিউজ্! তুই মাইরি ডুবে ডুবে জল খাস। বল—বল—বলে ফেল। আজ শালা রাত্তিরে আর ঘুম হবে না।"

আমি কিছু বললাম না। তপু কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে হাঁটতে ল্যাগল। মাঝে-মাঝে অকারণে সাইকেলের ঘণ্টি বাজাচ্ছিল। আমার ভাল লাগছিল না।

তপু বলল, "কী রে?"

আমি কোনো জবাব দিলাম না। সামনে খানিকটা ফাঁকা রাস্তা। নিমগাছের গা দিয়ে রাস্তায় ময়লা ময়লা জ্যোৎস্না পড়েছে। বাতাস আসছিল হু হু করে। শুকনো খড়ের ছেঁড়াখোঁড়া একটা আঁটি পড়ে রয়েছে রাস্তায়, চাঁদের আলোয় জমা জলের মতন দেখাচ্ছিল।

আমাদের বাড়ি সামনেই। বিশ-পঞ্চাশ পা হাঁটলেই পেঁাছে যাওয়া যায়। বাড়ি ফেরায় আমার যেন এখন আর মন উঠছিল না।

তপু আবার বলল, "তুই যে বোবা হয়ে গেলি রে?"

আমি সামান্য পরে বললাম, "চল্, সামনের দিক থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।"

"চল্।"

বাড়ির দিকে ডানহাতি না ফিরে আমরা সোজা হাঁটতে লাগলাম। রাস্তাটা বরাবর চলে গেছে; এখনও আধ মাইলটাক জনবসতি আছে, তারপর ফাঁকা। ছাড়া ছাড়া বাড়ি, বাগান, গাছপালা। বেহারীদের ছোট ছোট ঘর গেরস্থালি কোথাও কোথাও। সবটুকু হাঁটার ইচ্ছে আমার ছিল না। সামান্য খানিকটা যাব, গিয়ে ফিরে আসব। আমি যে অনর্থক কেন সামনের দিকে বেড়াতে যেতে চাইলাম তাও আমি জানি না।

তপু বলল, "তোর হল কী রে?......সত্যি-সত্যি তোর বিয়ে হচ্ছে নাকি?"

তপুর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখলাম। আমার কেমন রাগ হচ্ছিল। "কেন, আমার বিয়ে হতে আপত্তি আছে?"

"মোটেই না। হয়ে যাক—", তপু হালকা করে হাসল। তারপর একটু থেমে বলল, "কবে হচ্ছে?"

"হবে। নেমন্তন্নর চিঠি পাবি।"

"কোথায় হচ্ছে? কার সঙ্গে?"

"একটা ছেলের সঙ্গে।" আমার গলার স্বর রাগী-রাগী শোনাল। সত্যি আমার খুব বিরক্তি হচ্ছিল। মাথার মধ্যে জ্বালা করছিল।

তপু আমায় কীরকম নজর করে করে দেখতে লাগল।

রাস্তায় মানুষজন চোখে পড়ছে না; বাঁ হাতে কিছুটা তফাতে খোলার চালের একটা মেঠো বাড়ির বারান্দায় লণ্ঠন জ্বলছে, দড়ির খাটিয়া পেতে কে যেন মাঝারী করে গানের সুরে কিছু পড়ছিল। খুব মৃদু—যেন কানেই আসে না—একটা শব্দ ভেসে আসছিল ভোমরার গুনগুন শব্দের মতন। দু-পাশের গাছ হঠাৎ যেন জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেছে, সামনে অনেকটা ফাঁকা, জ্যোৎস্না এসে পথের ওপর পড়ে আছে।

তপু বলল, "তোর বিয়ে হচ্ছে—আগে বলিস নি তো? চেপে যাচ্ছিলি?"

"তোকে কি সব বলতে হবে।"

"তাই তো বলতিস।"

"না।"

"বলতিস না। লুকিয়ে রাখতিস? তোর সিকরেট ছিল তাহলে।"

"হ্যাঁ, ছিল। ছিল। চুপ কর।"

"তুই চটে যাচ্ছিস কেন? বিয়ের নামেই তোর মেজাজ গরম হয়ে গেছে।"

"তপু—। তুই সব তাতেই আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারবি না।"

"ইয়ার্কি মারছি কোথায়! যা বাব্বা! ...তোর আজ হল কি রে? মাথা-টাথার গোলমাল করে ফেললি নাকি।"

রাস্তার মধ্যিখানে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। তপুও যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। ওর দিকে আমি যে কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম জানি না। আমার চোখের পলকও হয়ত পড়েনি। খুব খারাপ লাগছিল আমার তপুকে, ঘৃণা হচ্ছিল। ঘৃণা, বিরক্তি, বিদ্বেষ। এমন বিশ্রী আমার আগে কখনো লাগে নি তপুকে।

হঠাৎ আমি ফিরে দাঁড়ালাম। তপুকে অবাক করে দিয়ে ফিরতে লাগলাম তাড়াতাড়ি। তপু বোধ হয় কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আমার পিছু ধরল।

"এই—", তপু পেছন থেকে ডাকছিল।

আমি সাড়া দিলাম না।

"এই—" তপু আবার ডাকল, "এই আয়না?"

আমি পিছু ফিরে তাকালাম না, সাড়া দিলাম না। আমার মাথায় যেন কেমন এক ঘোর এসেছে; কোনোদিকে না তাকিয়ে হেঁটে চলেছিলাম।

তপু আমার পাশে এসে পড়ল। "কী রে? তোর কি সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেল?"

আমি কিছু বলছি না দেখে তপু আমার হাত ধরে ফেলল। "আয়না—!"

ওর হাত আমি জোরে ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে দিলাম। তপু খুব অবাক। তারপর আবার সে আমার হাত ধরে ফেলল। আমি আবার ঝটকা মেরে তার হাত ছাড়াতে গেলাম। পারলাম না। তপু তার শক্ত হাতে আমায় ধরে ফেলেছে। আমার যে কী আক্রোশ হল কে জানে তপুকে আমি প্রাণপণে ধাক্কা মারলাম। তপু পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল, তার বাঁ হাতের আলগা মুঠো থেকে সাইকেলটা রাস্তায় ছিটকে পড়ে শব্দ হল জোরে, ঝন্-ন-ন।

তপু ততক্ষণে দু-হাতে আমায় ধরে ফেলার চেষ্টা করছে। আমি তাকে আঁচড়ে, কামড়ে, চুলের মুঠি ধরে টেনে কী যে অদ্ভুত কাণ্ড করলাম কে জানে। রাস্তার মধ্যে, জ্যোৎস্নার তলায় আমরা দুজনে কী যে বিশ্রী আঁচড়া-আঁচড়ি, চড়চাপড় শুরু করলাম—তা আর বলার নয়।

তপু আমায় ছেড়ে দিল শেষে।

আমি কোনোরকমে গায়ের কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে বললাম, "ছোটলোক, ইতর, অসভ্য।"

তপু কিছু বলল না।

আর আমি দাঁড়ালাম না। হনহন করে এগিয়ে চললাম। আমার তখন কোনো হুঁশ ছিল না।

খানিকটা এগিয়ে এসে দেখি তপু আমার পিছনে সাইকেল চেপে আসছে। সে আসছে আমি বুঝতে পারছিলাম। সাইকেলের শব্দ হচ্ছিল। আমার ভয় হল, কে যেন আমায় তাড়া করছে, এক্ষুনি ধরে ফেলবে। জোরে জোরে হাঁটতে লাগলাম।

তপু আমার গায়ের পাশে এসে গেল। একেবারে গা ঘেঁষে যেতে যেতে বলল, "তোর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কমপ্লিট ম্যাড্ তুই।"

বাড়ির দিকেই আমি হাঁটছিলাম। আমার দু-চোখ জলে ভরা। কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। ফটকের কাছে এসে দেখি আমি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছি।

বাড়ির ফটক খুলে কয়েক পা এগুতেই দেখি দিদি। বাগানে পায়চারি করছিল। ওকে দেখতে পেয়েই ভয়ে আমার বুক ধক করে উঠল। আমার চোখে তখনও জল, পাতাগুলো ভিজে রয়েছে, গালের ওপর গড়ানো কান্না সব আমি মুছে উঠতে পারি নি। দিদি অনেকটা তফাতে ছিল, তাড়াতাড়ি আঁচলে মুখ মুছে নিলাম। গলার মধ্যে তখনও টনটন করছিল, ঠোঁট কাঁপছিল থরথর করে। দিদির সামনে দাঁড়ালে আমি কিছুতেই কথা বলতে পারব না, ধরা পড়ে যাব।

দিদিকে আমি বলতে পারব না, কেন আমি কাঁদছি।

তাড়াতাড়ি দিদিকে তফাতে রেখেই আমি বাড়ির দিকে চললাম। ও আমায় নিশ্চয় দেখতে পেয়েছিল; কপাল ভাল আমার, ডাকল না।

চোখ-মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। দরজাটা অল্প করে ভেজানো থাকল, বাতির শিস রইল কমানো।

আমি যে আজ কী করে ফেললাম আমাকেই যেন তা খুঁজে খুঁজে বের করতে হচ্ছিল। বিনুর সঙ্গে স্টেশনের প্লাটফর্মে বসে গল্পগুজব, তারপর তপুর সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে রাস্তা ধরে খানিকটা পথ চলে যাওয়া, আবার ফিরে আসা—এ সবই যেন গুটিয়ে ছোট হয়ে এসে কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে আটকে গিয়েছিল। তপুকে আমি ভীষণ এক আক্রোশে মারছি, আঁচড়ে দিচ্ছি, মাথার চুল মুঠো করে ধরে প্রাণপণে টানছি—আর নিজেই কাঁদছি—এইটুকুই আমার চোখে ভাসছিল। কেন আমি এমন অদ্ভুত কাণ্ডটা করলাম? কেন? খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে-কাণ্ড আমরা করেছি যদি কারুর তা চোখে পড়ত? যদি কেউ কোনোভাবে দেখে ফেলে থাকে তাহলেই বা কী হবে? আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল? সত্যিই কি আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম? কেন হলাম? এমন একটা কাণ্ড আমি কী করে করলাম? ছি ছি।

চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে আমি যতই ভাবছি ততই ভাবনাটা যেন বাতাস লাগা-আঁচের মতন দাউ দাউ করে উঠছে, আমার শুধু গলা বুজে কান্না আসছে, বুকের মধ্যেটা মুচড়ে টনটন করে উঠছে।

কখন দেখি দিদি ঘরে এসেছে। আমি মুখ ঢেকে শুয়ে থাকলাম।

দিদি বলল, "শুয়ে আছিস?"

বালিশে মুখ আড়াল করে বললাম, "ভীষণ মাথা ধরেছে।"

"খুব টো-টো করেছিস?"

"না।"

দিদি আর কিছু বলল না। বিনুর সঙ্গে ঘুরে ফিরে গল্পগুজব করে বাড়ি ফিরে বোনের মাথাটা কেন ধরে গেল—দিদি হয়ত সে কথা ভাবতে-ভাবতে চলে গেল। কী ভাবল তাও আমি জানি। আমি কিন্তু বেঁচে গেলাম। দিদি এখন আর আমায় ডাকবে না।

বিনুর ওপর আমার রাগ হচ্ছিল। তুই কেন এলি? কেন তুই আমায় এসে সারাক্ষণ বিয়ে-বিয়ে করে জ্বালালি? তুই আমার বন্ধু, তোতে আমাতে বয়েসের হেরফের নেই। তোর বিয়ে হয়ে গেছে, বাচ্চা হয়েছে, ভাল মানুষ স্বামী পেয়েছিস, সুখে শান্তিতে ঘরসংসার করছিস তাতে আমার এক ফোঁটাও হিংসে হয় নি। কিন্তু তুই নিজের সুখেই খুশী নোস, আমাকেও তোর মতন সিঁদুর-শাঁখা পরে ঝলমলে মুখে দেখতে চাস। বারবার তুই শুধু আমায় খোঁচালি, আমার কানে-কানে কত কী বললি। সত্যি বলছি বিনু, গরম দুধ ঠাণ্ডা হয়ে সর পড়ে আসার মতন আমার মনে যে-সরটা আস্তে-আস্তে পড়ে

এসেছিল, তুই সেটা একেবারে ঘেঁটে ঘুটে কী যেন করে দিলি! তুই বড় চালাক। আমি তোকে চিনি। কোন্ বাচ্চা বয়েস থেকে আমরা দুজনে এক সঙ্গে হেসে খেলে, যার যা নিজের অন্যের কাছে উজাড় করে দিয়ে এতটা বড় হয়েছি। আমি তোকে চিনি না, পোড়ারমুখী! তুই যখন আজ স্টেশনের প্লাটফর্মে বললি : 'আনু, আমি তোর নাড়ি-নক্ষত্র জানি। তুই কিছু করেছিস' —তখনই আমি বুঝতে পেরেছি তুই আমায় সন্দেহ করছিস। সন্দেহ তোর আগেই হয়েছিল। তুই আমার কাছ থেকে বার বার জানতে চাইছিলি, এখান থেকে কেন আমি কলকাতায় পালাতে চাইছি? আমার ভয়টা কেন? কিসের? আমি তোকে বলেছিলাম : বলবো তোকে, একটু গুছিয়ে নি। আমি তোকে নিশ্চয় বলতাম বিনু, কাল হোক, পরশু হোক—একদিন নিশ্চয় বলতাম। তোকে ছাড়া আমার বলার দ্বিতীয় কেউ ছিল না, নেই। কিন্তু কপালের কী গেরো দেখ, আজই—ওই অবস্থাতেই—আমার মনটা যখন খুব অস্থির হয়ে গেছে, একেবারে এলোমেলো, ভেতরে ভেতরে গুমরে মরছি—তখনই আবার তুই তপুর হাতে আমায় ছেড়ে দিয়ে দিব্যি চলে গেলি। বিনু, তুই কি বুঝেসুঝেই এই চালাকিটা করলি? তুই কি শুধুই তপুর সঙ্গে আড্ডা মারার জন্যে কালকেই ওকে তোর বাড়িতে যেতে বললি? তোর মনে কী ছিল আমি বুঝতে পারি নি। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে, বিয়ের পর তুই বোধ হয় আরও চালাক হয়েছিস। তপুর কাছ থেকেও তুই হয়ত একটা আন্দাজ নেবার চেষ্টা করেছিস। আমার সঙ্গে তপুর বন্ধুত্বটা তোর না-জানা নয়, তুইও তো আমারই মতন তপুর বন্ধু। যেটুকু কমবেশী—সেটুকু মানুষে মানুষে হয়ই। যদি আজ তুই না থাকতিস, তপু থাকত—তাহলেও এমন কাণ্ড ঘটত না। তুইও এলি, আমায় কেমন অস্থির করে দিলি, আর তপুও জুটে গেল। তার ফলেই এই কাণ্ড।

তারপর দেখ, তপুও আর কথা পেল না। রগড়, ইয়ার্কি করতে করতে সে ওঠাল তার বিয়ে, আর বউয়ের কথা। কোথায় তার বিয়ে, কোথায় তার বউ, ফাজলামি করে তার বউয়ের পাওনা গয়নার গল্প ওঠাল। অন্যদিন হলে এসবে কিছু যেত-আসত না। এরকম আমাদের মধ্যে কত হয়। কিন্তু আজ কেমন হয়ে গেল সব, নেহাতই ঠাট্টার ব্যাপার থেকে যা হয়ে গেল আমার জীবনে এর চেয়ে বড় কাণ্ড কিছু নেই। ছিছি, ছিছি।

হঠাৎ খেয়াল হল জ্যাঠামশাই ঘরে এসেছেন। ডাকছিলেন।

আমি তখন উপুড় হয়ে শুয়ে, বালিশে মুখ চেপে শুধু বলছি—ছিছি, ছিছি, আর গলার মধ্যে কান্নার পুঁটলিটা অনবরত পাক খাচ্ছে।

জ্যাঠামশাই কাছে এসে দাঁড়ালেন। "শুয়ে রয়েছিস?"

বালিশে মুখ গুঁজে কোনো রকমে বললাম, "মাথা ধরেছে খুব।" আমার গলা এমন করে জড়ানো, বালিশের আড়ালে চাপা দেওয়া, যে, কণ্ঠটা জ্যাঠামশাইয়ের কানে মাথা ধরার মতনই শোনাল বোধ হয়।

"জ্বরটর নয় তো?"

"না।"

"আমি ভাবলাম, তোকে একটু বাজাতে বলব। আজকাল তুই তেমন হাত দিস না, বসিস না।...শুয়ে থাক খানিকটা, আমি একটু ওষুধ দিচ্ছি খেয়ে নিস।"

জ্যাঠামশাই চলে গেলেন। তিনি চলে গেছেন এ আমি বুঝতে পারলাম। তবু সামান্য পরে বালিশের আড়াল থেকে মুখ সরিয়ে দেখলাম। দরজাটা হাট করে খোলা, ঘরের মধ্যে ঝাপসা আলো, কেউ কোথাও নেই।

অনেকক্ষণ মুখ হাঁ করে নিশ্বাস নিলাম। ফোঁপানো কান্না গলায় জমে জমে শ্বাস যেন চেপে ধরেছিল। বুকের মধ্যে খাঁখাঁ করছে। কী যেন এক দুঃখ তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমার মনে হল, মা মারা যাবার পর আমি যেভাবে মার ফাঁকা বিছানার চারপাশে, মার ঘরে, বাড়িতে একা একা ঘুরে বেড়াতাম—যেন সেইভাবে আমার বুকের মধ্যে কেমন এক দুঃখ বেচারী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কার্তিকদা বাইরে থেকে ডাকল, "ও ছোড়দি?"

অপেক্ষা করে সাড়া দিলাম।

কার্তিকদা বলল, "তোমার ওষুধ।"

জ্যাঠামশাই ওষুধ পাঠিয়েছেন মাথা ধরার। বলতে পারি না, ফেলে দাও। পায়ের দিকে কাপড় গুছিয়ে বললাম, "দিয়ে যাও কার্তিকদা, আমার বড় মাথা ধরেছে।"

কার্তিকদা ঘরে এসে হোমিওপ্যাথি মোড়কটা দিল। "কপালে মলম দাও না, আরাম পাবে।"

ওষুধটা নিয়ে বললাম, "রাত্রে শোবার সময় দেব।"

কার্তিকদা চলে যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, "কার্তিকদা, দিদি কোথায়?"

"বড়বাবুর ঘরে দেখলাম।"

কার্তিকদা চলে গেল। পাশ ফিরে জানলার দিকে মুখ করে শুলাম। উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে থেকে বড় চাপ লাগছিল বুকে।

আমার ঘরের জানলা দিয়ে গাছপালা ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। আজ জ্যোৎস্না উঠে আছে বলে গাছপালাগুলো ছায়া-ছায়া দেখাচ্ছিল, অন্ধকার থাকলে ঘুটঘুট করে অন্যদিন। মাঝে-মাঝে বাতাস আসছিল দমকা। কতগুলো পোকা ডেকে যাচ্ছিল, আতা গাছের চালে দুটো জোনাকি উড়ছিল।

বিনুর মুখ আবার আমার চোখের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, যেন সে তার বাড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে অবাক হয়ে দেখছে আর বলছে: কী হয়েছে আনু তোর, কেন তুই অমন করছিস? বিনুর ঘাড়ের পাশ দিয়ে মাথা গলিয়ে তপুও আমার অদ্ভুত চোখ করে দেখছিল।

এখন আমি দেখার মতনই। সন্ধ্যের আগে আমায় অবাক হয়ে দেখার মতন কিছু ছিল না। কিন্তু কোথা দিয়ে কেমন করে যে আমি দেখার মতন হয়ে উঠলাম নিজেই যেন ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না।

বিনু, আমার কী হয়েছে তোকে আমি বলছি। আমি যে কেন এমন করছি তুই এবার শোন। আমি তোকে বলেছিলাম, বলব বলব তোকে, সব বলব। কাল হোক, পরশু হোক—তোকে আমার বলতেই হত। তুই ছাড়া তোর আনুর কথা শোনার আর কে আছে। দেখ বিনু আমাদের এই বাড়িটা যদি তুই মন দিয়ে দেখিস, বুঝতে পারবি, এর ঘর দালান বারান্দা সবই শুধু বড় বড় নয়, সবই শক্ত করে গড়া। এ বাড়ির মানুষগুলোও ওই রকম : তারা মান-মর্যাদা, অহঙ্কার-আভিজাত্যে বড়, আবার তারা শক্তও। আমি এ-বাড়ির মেয়ে বিনু, আমার কি চোখ নেই দেখার? তোকে আমি দিব্যি করে বলছি, আমি ওদের মধ্যে সবার চেয়ে ছোট শুধু নয়, আমার হাত বাড়াবার বহরটাও ছোট। ওদের অত বড়তে আমার নাগাল যায় না। আমি এখনও ওদের মতন এই বাড়ির রোদে জলে অত শক্ত হতে পারি নি। আমার বয়সে তুই মেয়ের মা হয়েছিস, আমি এই বয়সেও পুতুল হয়ে রয়েছি, দিদি দাদার জ্যাঠামশাইয়ের আদরের পুতুল, শখের খেলনা। তুই কি মনে করিস চিরকাল এভাবে থাকা যায়? সব মানুষেরই বয়স বাড়ে, মনও বাড়ে। আমি মেয়ে, আমার বয়েস বাড়তে বাড়তে আজ কোথায় এল তা তো তুই জানিস। আমার মনও কি এ বাড়ির পুরোনো সিন্দুকে ঢাকা থাকবে চিরটাকাল? তুই যখন বিয়ে হয়ে চলে গেলি বিনু, তখন আমার বন্ধু বল, মন খুলে কথা বলার মতন মানুষ বল—সবই আমি হারালাম। বাড়িতে আমার অভিভাবক আর গুরুজনই আছে, বন্ধু বলে কেউ নেই। আমি বড় একলা আমার অবস্থাটা তুই বুঝে দেখ। তুই চলে যাবার পর থাকল তপু। তপু, আমি—আমরা সব সমবয়সী, তপু বছর খানেক কি দেড়েকের বড় বড়জোর। আমরা পরস্পরের বন্ধু ছিলাম। যতদিন তুই ছিলি আমি তপুকে যেন অতটা আলাদা করে—পুরুষ মানুষ হিসেবে দেখতে পাই নি। তুই চলে যাবার পর আমার বন্ধু বলতে থাকল তপু। বন্ধুত্বটা এমনই যে, আমি মেয়ে হয়েও ওকে এমন অনেক কথা বলতে পারতাম যে তোর আমার মতন মেয়েরা ছেলেদের বলবে না। আমাদের সম্পর্কটা এমনই সোজাসুজি, সরল ছিল। কিন্তু আমি তোকে কী করে বোঝাব বিনু, দেখতে-দেখতে আমার মনের মধ্যে কী যেন হয়ে যেতে লাগল। আমিই কী ছাই বুঝতে পারতাম তখন! তুই বলবি, এ কেমন করে হল? ওই তপু, ছেলেবেলা থেকে যার সঙ্গে আমরা খেলাধুলো করে, মারপিট করে, একে অন্যকে কুলের আচার আমসত্ত্ব ভাগ দিয়ে মানুষ হয়েছি, বয়েস তরতর করে বেড়ে এলেও যা নিয়ে আমরা কেউই মাথা ঘামাই নি—বরং সম্পর্কটা যেমন তেমনই থেকে গেল—সেই তপুর সঙ্গে আমার কী করে এমন হল? কেমন করে হল আমি জানি না। আমিও কত ভেবেছি। বুঝতে পারি নি।

তবু একটা কথা আমার মনে হয়েছে। স্পষ্ট করেই বলি তোকে। অমন যে পাহাড়ে পাথর, তার গায়েও অনবরত জল পড়লে শ্যাওলা ধরে। ধরে না? একটা ফাঁকা, ধুধু মাঠ পড়ে আছে তো আছেই, হঠাৎ একবার বর্ষার পর চোখে পড়ে সেখানেও কেমন করে দু চারটে চারা গজিয়ে গিয়েছে। তুই কি দেখিস নি বিনু, বাগানে কত গাছ আছে যাতে ফুল আর ফোটে না, ফুটতে চায় না, তারপর হঠাৎ একদিন কোথাকার রেণু উড়ে এসে এসে লাগল, সঞ্চিত হল—আর ফুল ফুটে গেল আচমকা। আমাদের বাড়ির একটা জবাগাছে আমি ওইভাবে ফুল আসতে দেখেছি। মানুষের মন চিরকাল ফাঁকা থাকতে পারে না। মেয়েদের বেলায় বোধ হয় কথাটা আরও সত্যি। তুই ছিলি না, ছিলাম আমি আর তপু। হাসি, রগড়, গল্প, তামাশা, মজা-সজা করতে করতে কখন যে আমার মনে কোথাকার পরাগ উড়ে এসে পড়ল কে জানে। আমি প্রথম-প্রথম বিশ্বাস করতে চাইনি, নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পেয়ে গেছি। আমি কত বেহায়া তা নিজেকেই গালাগাল দিয়ে মনে করিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এই জিনিসটা এমনই যে একবার মুখ তুললে আর তাকে চাপা দেওয়া যায় না।

মনে আমার যাই হোক মুখে আমি কোনোদিনই তা প্রকাশ করি নি। কেমন করে করব বল? কাকেই বা বলব? আমাদের বাড়ির কেউ এমন কথা শুনলে কানে আঙুল দেবে, আমায় যে নজরে দেখবে সেটা তো তুই বুঝতেই পারিস। তপুকে আমার পাশে যেভাবে ওরা এতকাল দেখে এসেছে হঠাৎ অন্যভাবে দেখতে ওরা রাজী হত না। আমাদের বাড়ির মেয়ের পাশে পাত্র হিসেবে তপুকে মানায় না। তা যদি মানাত তবে তো দিদির সঙ্গে শচিদার বিয়ে হতে পারত। শচিদার তবু কত ছিল, তপুর কী আছে? শচিদার যা ছিল না সেটা তার পারিবারিক ভাগ্য। তপুদের পরিবারই কি অত উঁচু? তাছাড়া তারা আমাদের স্বজাতি নয়। তপুটাও অদ্ভুত, চাকরি নেই বাকরি নেই, ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়, মাথায় যত আজগুবী বাজে বুদ্ধি। ওই ছেলের হাতে কে আমায় তুলে দেবে? মরে গেলেও কেউ দেবে না।

এই তো অবস্থা, বিনু। আমার সঙ্গী, আমার বন্ধু, যাকে আমি কোনো-দিন আগে আলাদা করে পুরুষ বলে ভাবি নি সেই তপু আমার কাছে হঠাৎ পুরুষ হয়ে গেল, আমার ভালবাসার মানুষ হল। আমি যে কী করব বুঝে উঠতে পারতাম না। মুখ বুজে, চুপ করে থাকতাম। নানারকম মনে আসত। এবার যখন দাদা আমার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এল, বাড়ির গন্ধে গন্ধে বুঝলাম, এটা যেন ওদের মনে ধরেছে। আমার তখন থেকেই কত কী মাথায় আসছে। একবার ভেবেছিলাম, অবিনদাকে বলি, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে, তবু বলি। অবিনদা দাদার খুব বন্ধু। দাদা অবিনদার কথা শুনলেও শুনতে পারে। তাছাড়া অবিনদা হল তেমন মানুষ যাকে দমানো সহজ নয়। কিন্তু কথাটা

আমি বলতে পারলাম না। লজ্জা হল, ভয় হল, ভরসা হল না। তা ছাড়া দাদাই তো সব নয়। আমি যেমন ছিলাম চুপ করে তেমনই থেকে গেলাম।

দেখ বিনু, আমি তোকে সত্যি বলছি, এমন করে থাকা যায় না। কলকাতায় বিয়ে হলে আমি স্বর্গ পাব যে তা নয়। বরং আমার ভয় করে। দিদির অবস্থা দেখে আমার ভয় করারই কথা। কার হাতে গিয়ে পড়ব, সে কেমন মানুষ, কী তাদের আচার-ব্যবহার, কোন মতিতে চলে কে জানে। আমি শুধু এই অজ জায়গার মেয়ে নই, এ-বাড়ির মেয়ে, আমাদের সহবতটাই আলাদা। ভাল হবে, না মন্দ, তা আমার কপাল জানে। অথচ দেখ তুই, আজ যদি তপুর সঙ্গে আমার বিয়ে হত আমি তো জানতাম কাকে নিয়ে আমার দিন কাটাতে হবে। তপুর সব আমি জানি, ও যে নিম দাঁতন চিবিয়ে দাঁত মাজে, মোটা সোলের জুতো ছাড়া পরতে পারে না, দেড়-দু মাস অন্তর চুল কাটে, কদমফুলের গন্ধ ভালবাসে খুব, আরও কত কী—তা আমি জানি। ওর মাথার চুলের গন্ধটাও যে আমার ছেলেবেলা থেকে নাকে লেগে আছে।...যাকে এত চিনি তার হাতই তো আমার ভরসা ছিল সবার বেশী। কিন্তু আমার ভরসায় কার কী যায় আসে!

আমি বোধ হয় ভুল বললাম, বিনু। তপুকে হয়ত আমি সত্যিই চিনি না। আজ বুঝলাম, তার সাহস নেই, তার তেজ নেই, অহঙ্কার নেই, সে পুরুষমানুষ নয়। সে ভীতু, আমার মতনই ভীতু। আমি এ-বাড়ির মেয়ে বলে আমার সাহস হল না। হবেও না। তপুরও তো সাহস হল না আমায় কোনো ভরসা দেয়! সে মেয়েদের মতন ভীতু-ভীতু হয়ে থাকল, তার লজ্জা দ্বিধাও আমি আজ দেখলাম। না বিনু, তপু পারবে না। আমিও পারব না। তার চেয়ে আমি কাল সকালে আমার ছবিটা দিদিকে দিয়ে আসব কলকাতায় পাঠাবার জন্যে। কপালে আমার যা আছে হবে, এখনকার চেয়ে মন্দ আর কী হবে।

সুহাস

কাল অফিস থেকে ফিরতে সন্ধ্যে পেরিয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ আগে ঝড় উঠেছিল ধুলোর, কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিতে একটা গন্ধ উঠেছে, ধুলোর গন্ধ। বাড়ি ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে প্রমথর গলা কানে গেল, বেশ দরাজ গলায় গান গাইছে। বসার ঘরে উঁকি দিতেই চোখে পড়ল, অবিন হাত পা ছড়িয়ে বিচিত্র-মূর্তি হয়ে বড় সোফাটায় চোখ বুজে শুয়ে আছে।

প্রমথর দিকে এক নজর তাকিয়ে অবিনের শোয়ার ভঙ্গিটা দেখতে-দেখতে বললাম, "আরে, আবিনবাবু যে! কতক্ষণ?"

অবিন সাড়াশব্দ করল না।

প্রমথর দিকে 'কী হল' চোখে তাকাতে সে অবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "গান শুনে মূর্ছা গেছে।" বলে আমার দিকে চেয়ে বলল, "তোর এত দেরী? আমরা ভাবছিলাম, তোকে বোধ হয় ঘেরাও করেছে।"

"করলেই হয়। কলকাতায় আজকাল কী না হচ্ছে। আমি একটা কাজে আটকা পড়েছিলাম।...বোস্‌ তোরা, আমি স্নানটা করে আসি। যা গরম!"

অবিন এবার সাড়া দিল। শুয়ে-শুয়েই। "সুহাস, তুমি একটা কুকুর পুষতে পার না?"

"কুকুর?"

"অ্যালসেসিয়ানের দরকার নেই, নেড়ী কুত্তা হলেই চলবে। আয়নার কুকুরটাকেই আনিয়ে নাও," বলে অবিন চোখ খুলে পাশ ফিরল, "কিছু কিছু লোককে এ-বাড়ি থেকে তাড়ানো দরকার।"

প্রমথ বলল, "তুই আমায় মীন্‌ করছিস?"

উঠে বসতে বসতে অবিন বলল, "বুঝেও তুই জিজ্ঞেস করছিস?"

প্রমথ ভুরু কুঁচকে বলল, "গানের তুই কী বুঝিস?"

"আমি গলাটা বুঝি। তোর গলাটা গেলবার জন্যে তৈরী হয়েছে," অবিন এবার আমার দিকে তাকাল, "তখন থেকে ওই গাধাটা আমায় জ্বালিয়ে মারছে।"

প্রমথ নধর চেহারার মানুষ। নিজের গোলগাল গলায় একবার হাত বুলিয়ে রগড় করে বলল, "যাঃ, অত তাচ্ছিল্য করিস না, মাইরি। আমার শালীরা আমার গলার খুব ভক্ত।"

অবিন বলল, "সব শালীই জামাইবাবুদের গলার ভক্ত হয়। সেটা গানের জন্যে নয় গর্দভ, গলা কোপাবার জন্যে। অমন সুলভ গলা আর তাদের জুটবে

কোথায় রে!"

প্রমথ, অবিন, আমি—আমরা তিনজনেই প্রচণ্ড ভাবে হেসে উঠলাম।

হাসি থামলে আমি বললাম, "তোরা বোস, আমি চটপট আসছি।"

স্নান সেরে জামা কাপড় বদলে ফিরে এসে দেখি অবিনরা বসে-বসে কফি খাচ্ছে আর গল্প করছে।

প্রমথ বলল, "সুহাস, অবিনদের মেস বাড়ি ধসে পড়েছে।"

আমি অবিনের দিকে তাকালাম।

অবিন বলল, "পুরনো বাড়ি, দোতলার পশ্চিম দিকের একটা ঘরের খানিকটা নেমে গেছে। বাঁশের ঠেকো দিয়ে আপাতত খাড়া করা রয়েছে।"

"কেউ জখম-টখম হয় নি তো?"

"না। ব্যাপারটা দুপুরে হয়েছে। রাত্রে হলে পবিত্রবাবু মারা পড়তেন।"

প্রমথ বলল, "অবিন এ-যাত্রায়ও তুই বেঁচে গেলি।"

অবিন বলল, "দেখ প্রমথ, তুই নামেই প্রমথ। তোর সঙ্গে ডিভাইন প্রমথর কোনো সম্পর্ক নেই। তোরা ছোটখাটো রোগে, মোষের গাড়ি, মোটর গাড়ি, ছাত চাপা পড়ে মরবি। আমি মরব না। আগেকার দিনে রাজাদের অশ্বমেধ ঘোড়া ছুটত পৃথিবী কাঁপিয়ে; আমি এ জগতে জন্মেছি কপালে জয়পত্র ঝুলিয়ে, আমার মার নেই।"

প্রমথ হেসে বলল, "তুই কোন জাতের অশ্ব?"

"স্বজাতের।"

প্রমথ হেসে ফেলল। আমিও হাসলাম। নেনু এসে কফি দিয়ে গেল আমায়। খুব রঙচঙে জামা পরেছে নেনু। ছোঁড়াটা হিন্দী সিনেমার পরম ভক্ত। আজকাল আবার গায়ের জামাগুলোও ধর্মতলার ফুটপাথ থেকে কিনে আনে।

প্রমথ উঠে পড়ল। সে এই পাড়াতেই থাকে। বাড়িতে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন আসার কথা, আড্ডা জমাতে পারল না আজ।

আমি অবিনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "তুমি তাহলে মেসছাড়া নাকি অবিন?"

মাথা নেড়ে অবিন বলল, "না। মেসেই আছি। তবে ওই বাড়িটা বোধ হয় আর থাকবে না। কর্পোরেশান কী করে দেখা যাক।"

অবিন যে-মেসটায় থাকে সেটার বাইরের চেহারা দেখে বরাবরই আমার হৃৎকম্প হত। কলকাতা শহরের পুরনো জরাজীর্ণ বাড়ির যে-রকম চেহারা হয় প্রায় সেই রকমই, তফাতের মধ্যে এই যে, ঘরগুলো ছিল বড় বড়, খড়খড়ি দেওয়া দরজা, জানলায় ভাঙা কাচের শার্সি। অবিনকে অনেকবার বলেছি, অবিন তোমার এই বৈকুণ্ঠ ভবনটি ছাড়। অবিন আমাদের স্তোক দিয়ে বলত, মানুষ কত কাঠ খড় পুড়িয়ে বৈকুণ্ঠে যায় হে, আর আমরা মাসে মাত্র সোয়া শ টাকা খরচ করে বৈকুণ্ঠ-বাস করছি। এমন পুণ্য ফেলতে আছে! খুবই মজার কথা,

অবিনদের মেস বাড়িটার গায়ে 'বৈকুণ্ঠ নিবাস' নামটা এখনও অল্পস্বল্প পড়া যায়।

কথাটা আবার তুললাম, "মেসটা এবার ছেড়ে দাও।"

অবিন কিছু বলল না প্রথমে, হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা নিল। সিগারেট বের করতে-করতে বলল, "হ্যাঁ, বৈকুণ্ঠ বাস এবার বোধ হয় বন্ধই হবে।"

"তুমি আপাতত আমার এখানে এসে থাকতে পার। অসুবিধে হবে না।"

"আমি একটা ছোটোখাটো ঘরের খোঁজ পেয়েছি। একটা হোটেলের একেবারে চিলে কোঠার ঘর, দশদিকে আলো বাতাস। সেখানেই উঠে যেতে পারি।"

"সেটা কোথায়?"

অবিন সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে বলল, "ভবানীপুর।"

"ভালই হবে। আরও কাছাকাছি হল।"

অবিন এবার খানিকটা অন্যমনস্ক হল. আমি কফি খেতে লাগলাম। জানলা দিয়ে রুক্ষ একটা গন্ধ ভেসে এল। কোথা থেকে কে জানে।

অবিন আমার দিকে তাকাল, বলল, "সুহাস, আমি তোমায় একটা খবর পেশছে দিতে এসেছি। পরে বলছি। তার আগে তোমার খবরাখবর বলো।"

আমি অবিনের চোখ মুখ লক্ষ্য করলাম। অবিনকে আমি চিনি। তার মধ্যে দুটো আলাদা মানুষ আছে। একটা হল বাইরের 'অবিন', মানুষকে নিয়ে যে মজা করে, খোঁচায়, বিদ্রূপ করে, অদ্ভুত-অদ্ভুত কাজ করে, কথা বলে, অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত করে; আর অন্য যে মানুষটি আছে সে হল ভেতরের 'অবিন'। সে মানুষটি হল পুরনো কাঠামোর, আমাদের মতন প্রায়। তার অবন্তী নামটি ওরই মার দেওয়া, যিনি নাকি কবিতা লিখতেন। অবিনকে কোনো-কোনো সময় সত্যিই সেই রকম পুরনো মনে হয়। অবিন আমার এখানে বড় বেশি আসে না। এবার আমাদের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসার পর সে মাঝে-মাঝে আসে। আমার চোখে এটা না পড়েছে এমন নয়। মনে হয়েছে, অবিন আমাদের বাড়ির মানুষদের সঙ্গে একটা স্নেহ-বন্ধুত্বের সম্পর্কে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। তার পক্ষে এটা কিছু বিচিত্র।

অবিন নিজেই বলল, "তুমি বালিগঞ্জে গিয়েছিলে?"

"পরশু গিয়েছিলাম।"

"কী হল?"

"আয়নার ছবিটবি দিয়ে এসেছি। কথাবার্তাও বলে এসেছি মোটামুটি। ওরা শ্রাবণের কথা বলছে। আমার ইচ্ছে ছিল পুজোর পর, অগ্রহায়ণে। জ্যাঠা-মশাইও সেই রকম লিখেছেন।"

অবিন সিগারেটের ছাই ফেলবার জন্যে ঝুঁকে পড়ে আবার সোজা হল।

"অগ্রহায়ণ মাসটা খারাপ কী! তখন ঠাণ্ডা পড়ে যাবে।"

"খারাপ কোথায়, ভালই হয় সবদিক থেকে।"

অবিন চুপ করে সিগারেট খেতে লাগল।

আয়নার বিয়ের সম্বন্ধটা অনেকখানি এগিয়ে যাবার পর আমার মাথায় এই চিন্তাটা খুব বেশী করে এসে বসেছে। আজকাল প্রায়ই পাঁচ রকম ভাবতে হয়। ছোট বোনের বিয়ের দায়িত্বটা এখন আমার ঘাড়েই এক রকম। সংসারের কোনো দায়িত্বই আমি নিই নি এতদিন। এই প্রথম একটা সাংসারিক দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। সাধারণ ছোটখাটো কোনো দায়িত্ব হলে আমার দুশ্চিন্তা থাকত না, দায়িত্বটা বড়—আয়নার বাকি সমস্তটা জীবনের ব্যাপার। কী হবে কেমন করে বলব? বাবার মতন সংসারী, বিচক্ষণ মানুষই যদি ভুল করে থাকে, আমার যে না হবে তাও তো জোর করে বলতে পারি না। তবে মনে-মনে আশা করছি, হবে না।

আমি দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেটটা ধরাচ্ছি, অবিন বলল, "আয়নার বিয়ে হয়ে গেলে তুমিও একটা করে ফেলো।"

ঠাট্টা করেই অবিন বলেছিল, আমিও ঠাট্টা করে জবাব দিলাম, "একটা ভাল মেয়েটেয়ে খোঁজো।"

"তোমার খোঁজে নেই?" অবিন হাসছিল।

"কোথায় আর—!"

"সত্যি বলছ নাকি সুহাস?"

"এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মিথ্যে বলব কেন?"

অবিন আমায় দেখতে-দেখতে বলল, "তুমি ভাবছ আমি তোমার কোনো খোঁজখবর রাখি না। কিছু-কিছু রাখি।"

"যেমন?"

"সেটা পরে হবে একদিন। এখন কাজের কথাটা বলি," অবিন বলল, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল সরাসরি। "তুমি শচিপতিবাবুর কী করলে?"

"শচিদা—!"

"আমি কলকাতায় ফিরে ভদ্রলোককে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। সাধারণ চিঠি। উনি একটা জবাব দিয়েছেন, বেশ লম্বা গোছের। তাতে কাজের কথা নেই অকাজের কথাই সব। তবে শেষে কয়েকটা কথা লিখেছেন যা তাঁর পক্ষে দরকারী। তোমায় মনে করিয়ে দিতে বলেছেন।"

শচিদা আমায় কী মনে করিয়ে দিতে বলেছে বুঝতে আমার কষ্ট হল না।

অবিন বলল, "তুমি তো ভদ্রলোককে চিঠি দিয়েছ?"

"দিয়েছি।"

"তবে?"

জবাব দেবার মতন কী যে আছে আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না। শচিদার জন্যে দুঃখ হয়। অথচ সে-দুঃখ মোচনের জন্যে আমি কিছু করতে

পারি না।

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে অবিন জিজ্ঞেস করল। "ব্যাপারটা কী, সুহাস?"

অবিনের দিকে তাকালাম আমি। সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অপেক্ষা করে বললাম, "কী আর। শচিদা আমায় কিছু কাগজপত্র দিয়েছিল। তার অসুখ বিসুখের ব্যাপারে। বলেছিল, আমি যদি পারি, কলকাতার কোনো চেনাশোনা ভাল ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে জিজ্ঞেস করি, তার অসুখটা কিসের।"

"চিঠি পড়ে মনে হল, অসুখের ব্যাপারে ভদ্রলোক খুব চিন্তিত।"

"আমি এসে পর্যন্ত এই আয়নার ব্যাপার নিয়ে খানিকটা ব্যস্ত ছিলাম। তবু আমি শচিদার কাগজপত্র দু-একজনকে দেখিয়েছি।"

"কী বলে?"

"ব্যাপারটা মোটেই ভাল নয়, সুহাস।"

"ভাল নয়! মানে?"

"এত দূর থেকে হুট করে কিছু বলা যায় না। রুগী দেখলে হয়ত তারা বলতে পারত। তবে আমাদের অমিয়র দাদা, তিনি তো সন্দেহ করছেন, ক্যানসার।"

"ক্যানসার!" অবিন চমকে গেল।

"আমি আর-একজন বড় ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম, তিনি ঠিক ক্যানসার বলছেন না; বলছেন, রুগীকে কলকাতায় নিয়ে আসতে; না দেখে বলা যাবে না।"

অবিন নীরব। ওর মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে।

"ট্রাবল অনেক—" আমি বললাম, "ডাক্তাররা কী বলছে বা সন্দেহ করছে—শচিদাকে আমি কী করে সেটা লিখি! কলকাতায় যে আসতে বলব, শচিদা এক্ষুনি রাজী হবে কিনা কে জানে। বরং কোনো রকম সন্দেহ না করে বসে। তা ছাড়া আরও ফ্যাকড়া আছে। শচিদা আমার এখানে এসে উঠবে, ডাক্তার দেখিয়ে চলে যাবে তাতো নয়, হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে, অবজারভেশানে রাখতে হবে, তারপর—তারপর যা হয়। কোনোটাই খুব সহজ কাজ নয়।"

অবিন আমার কথা বুঝতে পারল। দেখলাম, সে যেন কিছু ভাবছে। আমি কফিটুকু শেষ করছিলাম। শচিদার কথা আমি ভেবেছি। ভেবেও কিছু ঠিক করতে পারিনি।

অবিন বলল, "কিন্তু, তাই যদি হয়, ভদ্রলোককে তো কলকাতায় আনতে হবে।"

"তা হবে। তবে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মতন অবস্থা এটা। কে করবে? আমি শচিদাকে কিছু জানাতে পারছি না। পারব না।"

"একটা হাসপাতাল ঠিক করা যায় না? তোমার অনেক চেনাশোনা।"

"চেষ্টা করলে হয়ত যায়। সেটা সময়ের ব্যাপার। তার চেয়েও বড় কথা হল, শচিদাকে কলকাতায় আসতে রাজী করানো। তাঁকে একটা কিছু বোঝাতে হবে, সুহাস। ওটা বড় ডিফিকাল্ট জব। আমি পারব না।"

অবিন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকল। সহজে অবিন চঞ্চল হয় না, সাধারণ দুশ্চিন্তাকে বড় বেশী আমলই দেয় না। অথচ শচিপতির ব্যাপারে তার চাঞ্চল্য এবং উদ্বেগ দেখে আমি অবাকই হচ্ছিলাম। শচিদাকে যে অবিনের খুব পছন্দ হয়েছে এমনও আমি জানি না।

আচমকা অবিন বলল, "সব জেনেশুনে তুমি চুপ করে বসে থাকবেই বা কী করে? কিছু একটা তোমায় করতে হবে।"

আমি বললাম, "তুমিই বলো না, কী করা যায়?"

অন্যমনস্ক হয়ে অবিন বলল, "ভাবছি।"

"ভেবে দেখো। আমি অনেক ভেবেছি ভাই, মাথায় কিছু আসে নি।"

অবিন ভাবছিল। আমার দিকে কখনো তাকাচ্ছিল, কখনো তাকাচ্ছিল না। আমি সিগারেটটা শেষ করে আনছিলাম।

শেষে অবিন বলল, "দেখো সুহাস, দুই নৌকোয় পা দিয়ে থাকা উচিত নয়। বিশেষ করে এটা একটা মানুষের জীবনের ব্যাপার। হয়ত কলকাতায় এলে দেখা যাবে, যে ভয় আমরা করছি সেটা সত্যি নয়। আবার ভয়টা সত্যিও হতে পারে। সে যাই হোক, ভদ্রলোককে কলকাতায় আনানো দরকার।"

সিগারেটটা আমি নিবিয়ে ফেললাম। "কী করে?"

"জ্যাঠামশাইকে লেখো", অবিন বলল।

"জ্যাঠামশাইকে?" আমি অবাক হয়ে গেলাম। "তুমি কী বলছ? ওই বুড়ো মানুষটাকে তুমি ভোগাতে চাও? জ্যাঠামশাই শচিদাকে খুব স্নেহ করেন। এ কাজ তিনি পারবেন না।"

অবিন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "জ্যাঠামশাই পারবেন। সুহাস, তোমার জ্যাঠামশাইকে তুমি ভাল করে চেন না।"

অবিনকে আমি বুদ্ধিমান বলেই বরাবর মনে করেছি। ও যে এত নির্বোধের মতন কথা বলবে আমি ভাবতে পারছিলাম না। আমার বাড়ি, আমার বাবা, জ্যাঠামশাই, মা, দিদিকে আমি যতটুকু চিনি অবিন কি তার চেয়ে বেশী চেনে? হয়ত মনে-মনে বিরক্ত হয়েছিলাম। বললাম, "তুমি নিজে লিখলেই তো পার।"

অবিন বলল, "বেশ, আমিই জ্যাঠামশাইকে লিখব।" বলে একটু থেমে সে হঠাৎ কেমন ম্লান গলায় বলল, "সুহাস, তুমি আমার কথা মানতে চাইবে না, কিন্তু একটা ব্যাপার তোমায় বলি। আমরা খুব কাছেরটুকু বিশ্বাস করতে পারি, তার বেশী পারি না। আমাদের বিশ্বাস খুব কম। জ্যাঠামশাইরা অনেক দূরের ওপরও বিশ্বাস রাখতে পারেন। ইহজন্ম, হয়ত পরজন্মও। যে-মানুষ এই বয়সেও বাড়ির বাগানে নতুন একটা চারা গাছ পুঁতে তার বাড়বাড়ন্ত

চেহারাটা মনে-মনে দেখতে পান, সে-মানুষ তোমার আমার মতন অত সহজে দুঃসংবাদে অধীর হয়ে উঠবেন না। তিনি শচিপতিবাবুকে অনেক বেশী আশা-ভরসা দিতে পারবেন। আমরা পারব না।”

আমার কাছে অবিনের কথাটা অর্থহীন মনে হল। বললাম, “ভালই তো, তুমি চেষ্টা করে দেখো। তুমিই লেখো জ্যাঠামশাইকে।”

অবিন বলল, “আমিই লিখব। তুমি শুধু একটা ভাল হাসপাতালের খোঁজে থাকো।”

অবিন চলে গেল। তাকে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আমি শোবার ঘরে চলে গেলাম। অবিন যাই বলুক, জ্যাঠামশাইকে সে চিঠি লিখবে এ-ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছিল না। ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। জ্যাঠামশাইকে ও চিঠি লিখবে যে তাতে আমার সন্দেহ নেই। তারপর একটা ঝঞ্ঝাট বাধবে। আমারই ফ্যাসাদ হবে বেশী। আবার এও ঠিক, শচিদার ব্যাপারে একেবারে হাত ধুয়ে বসে থাকতেও খারাপ লাগে।

শোবার ঘরে এসে কী করি কী করি ভাবে খানিকটা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার ফ্ল্যাটের উলটো দিকে নতুন এক ভাড়াটে এসেছে। আগে যারা ছিল তারা অবাঙালী। বিশ্রী একটা চেহারা করে রেখেছিল বাইরের দিকটার। নতুন যারা এসেছে তারা শৌখিন না হলেও মোটামুটি রুচির মানুষ। জানলায় পরদা ঝুলিয়েছে, ছোট ব্যলকনিতে ফুলের টব রেখেছে কয়েকটা, একটা চেয়ারও অনেক সময় পাতা থাকে। ওই বাড়িতে কারা এসেছে আমি জানি না। কিন্তু একটি মেয়েকে আমি স্টেথস্কোপ হাতে ও-বাড়ি থেকে বেরুতে দেখেছি। তার চোখের তলায় শ্বেতীর দাগ, গলার কাছেও অল্প দাগ আছে। মেয়েটি যে দেখতে খারাপ তা আমার মনে হয় নি, বরং মুখটি ভালই, তবু চোখের তলায় শ্বেতীর দাগ ধরে যাওয়ায় প্রথম নজরেই সেটা চোখে পড়ে, খারাপ লাগে, মায়াও হয়। মেয়েটির বয়েস হয়েছে বলেই আমার ধারণা। সে পড়ে, না কোনো হাসপাতালে চাকরি করে আমি জানি না।

জানলায় দাঁড়িয়ে ফ্ল্যাটটি দেখতে দেখতে আমি সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে থাকলাম। আজ বড় গুমট। ধুলোর ঝড় উঠে অকারণ কয়েক ফোঁটা জল পড়ে গুমটটা বাড়িয়ে দিয়েছে। আকাশ যতটুকু চোখে পড়ে সেই এক টুকরো আকাশ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই, মেঘ জমে আছে কিনা! অন্ধকার দেখাচ্ছিল। আশেপাশের বাড়িগুলো নানান ছাঁদ নিয়ে দাঁড়িয়ে। দেখলে মনে হয়, এই পাড়ার বাড়িগুলো যেন কতকাল ধরে ভিড়ের মধ্যে বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে,

নড়াচড়ার পথ পাচ্ছে না। কলকাতা এই রকমই, চারদিক দিয়ে ঠাসা। তবু কলকাতা আমার ভাল লাগে। আমি অনেক বছর ধরে কলকাতায় আছি। কলেজে পড়ার সময় থেকে। আমার সঙ্গে কলকাতার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এখানে আমি নিজেকে নিয়ে অনর্থক ব্যস্ত হবার সময় পাই না। অফিস, বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা, সিনেমাটিনেমা দেখা, কোনো কোনো দিন তাস খেলা—এই পাঁচ রকম মিলিয়ে দিব্যি দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছি।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার আবার জ্যাঠামশাই ও শচিদার কথা মনে পড়ল। অবিন কোথাকার জল কোথায় যে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কে জানে! জ্যাঠামশাইকে এই বয়েসে আবার উদ্‌ব্যস্ত করতে আমার ইচ্ছে ছিল না। বাবা মারা যাবার পর থেকে জ্যাঠামশাই বেশ ভেঙে পড়েছেন; এখন দেখলে মনে হয়, কোনো রকমে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারলেই বাঁচেন। সেই মানুষকে আবার যে কেন সংসারের শোক দুঃখ উদ্বেগের মধ্যে ফেলা— আমার মাথায় এল না। এমনিতেও এখন জ্যাঠামশাই আয়নার বিয়েটিয়ে নিয়ে মনে-মনে নানা রকম ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছেন। শচিদার অসুখের কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। সেটাই স্বাভাবিক।

কী হবে, হতে পারে—সে-সব নিয়ে আমি আর ভাবলাম না। বসে-বসে ভাবার ধৈর্য আমার কোনো কালেই নেই। ভাল লাগে না। কাজের টুকু আমি ভাবতে পারি, তার বেশী ভেবে অকারণ মাথা ভার করা আমার পোষায় না।

কয়েকটা এলোমেলো কাগজপত্র হাতে করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ছবির কাগজটা পাতা উলটে-উলটে দেখলাম। কোথায় বাঁধ হচ্ছে, কোথায় ধানের পোকা মেরে হাজার-হাজার একর জমির চাষ বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, চাঁদে যাবার পোশাক পরে দুটো লোক হাসছে—এই সব দেখতে-দেখতে আমি কাগজটা শেষ করে যেন বিরক্ত হয়েই বিছানার পাশে ফেলে দিলাম। একটা থ্রিলার হাতে নিলাম। দু-চার পাতা উলটে ভাল লাগল না।

আজ অফিসে একটা নতুন কাজের কথা হয়েছে। কিছুক্ষণ সেটা ভাবলাম। মন বসল না। চোখ বুজে শুয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। দিদির চিঠির কথা মনে পড়ল। সাংসারিক চিঠি, চিঠিতে আয়নার বিয়ের কথাই বেশী। শেষে ঠাট্টা করে লিখেছে : 'আয়নার বিয়ের পর তোর একটা বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে আমাদের ছুটি হয়।'

চিঠি পড়ে মনে হয়, যেন দিদি আমার একটা বিয়ে দিতে পারলে কাশীবাসী হয়ে যাবে, যতক্ষণ আমি সেটা না করছি, দিদি বেচারী সংসারে আটকে আছে।

আমার হাসি পাচ্ছিল। একবার ছেলেমানুষী করে একটু জোরে হাসলাম— যেন দিদিকে শোনাতে চাইলাম।

'দেখ দিদি, কাশী আর কলকাতার মধ্যে কলকাতাটা প্রেফারেবল। আমি আছি, আয়নাও কাছাকাছি থাকবে, তুই কাশী গিয়ে কী করবি রে!'

নিজেই হাসতে-হাসতে উঠে পড়ে একটা সিগারেট ধরালাম। আজ জ্যোতি-

ট্যোতি এলে তাসে বসা যেত। মাত্র সোয়া আটটা। খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার কথা ভাবাই যায় না। অবিনটাকে বসিয়ে রাখলে হত খানিকক্ষণ। কিন্তু ওর এক-এক সময় এক-এক রকম মেজাজ হয়। আমরা বলি 'মুড'। আজ মেজাজ পালটে গিয়েছে দেখে ওকে আর বসাতে সাহস হল না। আমায় নানা রকম তত্ত্ব শোনাত।

রেডিওটা খুলে দিয়ে শুনি নাটক হচ্ছে। খুব চেঁচামেচি হচ্ছিল। ওটা বন্ধ করে দিয়ে বাইরের সরু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাতাস নেই, চারদিকের গুমট দেখে মনে হচ্ছে রাত্রে ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতায় এবার এক দফা বৃষ্টি হওয়া দরকার এখন।

আবার ঘরে আসতে হল। আয়নার জন্যে যে-ছেলেটিকে আমি বেছে নিয়েছি—অমলেন্দু, তার সঙ্গে আজ আমার আচমকা এসপ্লানেডে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। বলল, চলুন না। আমি তাকে এড়িয়ে শেয়ারের ট্যাক্সি ধরতে ছুটলাম। চলে গেলেই হত। অমলেন্দু ছেলেটি ভাল। ভদ্র, বিনয়ী, সুশ্রী চেহারা। আমার চেয়ে বয়েসে কিছুটা ছোট হবে, আঠাশ ঊনত্রিশ। এই বয়েসেই ভাল চাকরিতে রয়েছে। আমার ধারণা, আয়নার সঙ্গে অমলকে ভালই মানাবে। আয়না খানিকটা আদুরে ধরনের, অভিমানী, এলো-মেলো স্বভাবের। অমলকে দেখে, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে হয়েছে সে আয়নার মতন মেয়ে পেলে খুশী হবে। যতীন—মানে অমলের মামাতো ভাই—আমার বন্ধু। যতীনকে মাঝখানে রেখেই বিয়ের কথাটা পাড়া হয়েছিল। যতীন আমায় বলেছে, ছেলে হিসেবে মন্টুকে তুই বিশ্বাস করতে পারিস। আমার ছোট ভাই বলে বলছি না, হি ইজ রিয়েলি গুড।

বিছানায় এসে শুয়ে-শুয়ে বাড়ির কথা ভাবতে গিয়ে আবার জ্যাঠামশাইয়ের কথাটা বেশী করে মনে পড়ল। অবিন আজ আমায় আমার জ্যাঠামশাইকে চেনাতে চাইছিল। আমার পছন্দ হয় নি। এখনও হচ্ছে না।

দাদুর কথা আমার মনে নেই। জ্ঞান হওয়া থেকে আমি জ্যাঠামশাইকে দেখছি। বাবার চেয়ে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গেই আমার মেলামেশা ছিল বেশী। ছেলেবেলাটা আমার অনেক সময় জ্যাঠামশাইয়ের পাশে-পাশে কেটেছে। জ্যাঠাইমা, আমরা যাকে মণিমা বলতাম, একটা সময়ে দিদিকে না আমাকে কাকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রে শোবে ঠিক করতে পারত না, দিদিতে আমাতে ঝগড়া লেগে যেত, তখন আমাকে জ্যাঠামশাইয়ের দিকে ঠেলে দিয়ে মণিমা বলত, যা খোকন, তুই তোর জেঠুর কাছে শুগে যা। আমি জ্যাঠামশাইয়ের পাশে তাঁর গলা জড়িয়ে শুয়ে নানা গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। আমাদের পরিবারের পুরনো যত গল্প সব আমি জ্যাঠামশাইয়ের কাছে শুনেছি। আমার বড় ঠাকুরদা ছিল স্কুলের হেড মাস্টার। ছোট ঠাকুরদা করত মোক্তারী, শেষে সন্ন্যাসী হয়ে যায়।

আমার দাদু আট টাকা স্কলারশিপ না কী যেন পেয়ে ডাক্তারী পড়েছে। বুড়ো বয়সেও দাদু তিন পো-টাক করে দুধ খেত রাত্রে, দুধের ক্ষীর। ঘণ্টাখানেক ধরে জ্বাল দিয়ে দিয়ে ক্ষীরটা করতে হত, ঠাকুমা নিজর হাতে ক্ষীর না করলে দাদু ঠিক ধরতে পারত—এই সব মজার-মজার গল্প জ্যাঠামশাই আমাকে শোনা-তেন। দাদুর ডাক্তারীর অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্পও। একবার দাদু কোন সাহেবের পোষা এক বাঘের বাচ্চার চোখ দেখে ওষুধ দিয়েছিল, সে-গল্প শুনতে শুনতে আমি হেসে অস্থির হয়ে যেতাম।

জ্যাঠাইমা মারা যাবার পরও কিছুদিন আমি জ্যাঠামশাইয়ের খুব আদরের ছিলাম। তারপর দেখলাম, আয়না আমার জায়গাটা দখল করে নিয়েছে। আমিও খুব সহজভাবে আয়নাকে জায়গাটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। বড় হয়ে গেলে মানুষ কোনো-কোনো ব্যাপারে উদার হয়ে যায়। আমি উদার হয়ে গিয়েছিলাম।

আমাদের পরিবারে বাবা এবং জ্যাঠামশাই দুজনকেই আমি যতদূর সম্ভব দেখেছি, সহোদর হয়েও ঠিক এক ধরনের চরিত্রের মানুষ ওঁরা নন। সেটাই স্বাভাবিক। জ্যাঠামশাই বরাবরই আত্মভোলা গোছের লোক। শান্ত প্রকৃতির। কর্তব্যপরায়ণ, সামাজিক। তাঁর অহঙ্কার কোনোদিন মাত্রা ছাড়ানো নয়। বাবা সেদিক থেকে ব্যস্তবাগীশ, ভীষণ সংসারী, বুদ্ধিমান, খানিকটা অহঙ্কারী ছিলেন। বাবার অনেক গুণ ছিল, আবার কিছু-কিছু দোষও। সবচেয়ে বড় দোষ, বাবা মনে-মনে যা করবেন স্থির করতেন তার বিরুদ্ধে কারও কোনো কথা বলার উপায় ছিল না। বললে বাবা ভীষণ চটে যেতেন। মারও সাধ্য ছিল না বাবাকে কিছু বলে। এটা একজনই নাকি পারত, সে আমাদের মণিমা। বাবার হ্যাঁ-কে মণিমা যদি না করে দিত, বাবা বেচারী কিছু বলতে পারত না। আমার ছেলেবেলা থেকেই মনে হয়েছে, বাবা মণিমাকে নিজের বোনের মতন ভালবাসত, সঙ্গী কিংবা বন্ধুর মতন মনে করত। শুনেছি দুজনে নানা রকম অদ্ভুত-অদ্ভুত কীর্তিও করেছে। আর জ্যাঠামশাইকে বাবা চিরকাল বড় ভাইয়ের প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়েছেন। বুড়ো বয়সেও বাবা খুব কম সময়েই দেখেছি জ্যাঠা-মশাইয়ের সামনে বসে-বসে কথা বলছেন; দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই কথা বলতেন। বড় ভাইয়ের ওপর বাবার ভালবাসাও কম ছিল না। কিন্তু সংসারের কর্তৃত্বটা বাবাই করেছেন। সেখানে জ্যাঠামশাইকে হাত দিতে দেন নি।

দাদু নিজে ডাক্তার হলেও তাঁর ছেলেরা ডাক্তারবদ্যি হোক এটা তিনি হয়ত তেমন করে চান নি। জ্যাঠামশাইকে কলকাতায় ডাক্তারী পড়তে পাঠানোও তখনকার দিনে অসুবিধে ছিল। ঠাকুমা ছেলেদের কাছছাড়া করতে নারাজ। জ্যাঠামশাই আর বাবা দাদু বেঁচে থাকতেই ব্যবসাপত্র করতে নেমেছিলেন। আমাদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল মাইকা মাইনস্-এর। কী গোলমালে সেটা ছেড়ে দেবার পর, রোড বাস আর পেট্রল পাম্পের। জ্যাঠামশাই পেট্রল পাম্পগুলো দেখাশোনা করতেন, বাবা রোড বাসের। জ্যাঠাইমা মারা যাবার পর জ্যাঠামশাই ব্যবসাপত্রে আর মন দিতে পারলেন না। চলছিল কোনো রকমে। শেষে বাবা

রোড বাসের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে, পেট্রল পাম্প নিয়েই ছিলেন। মা মারা যাবার সময় পর্যন্ত ওটা টি'কে ছিল। মা মারা যাবার পর বাবাও নিজে দেখাশোনা কমাতে লাগলেন। চুরিটুরিতে অনেক টাকা লোকসান গেল। শেষ পর্যন্ত ওটাও ছেড়ে দিলাম আমরা। এখন যা সংসার আমাদের তাতে অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন হয় না। যা আছে তাতে মোটামুটি চলে যায়। কিছু জমি-জায়গা, শালের জঙ্গল আছে এখনও। দেখাশোনা অন্যরাই করে, হাজার কয়েক টাকা বছরে বাড়িতে আসে আমাদের। তাতে কোথাও কোনো অসুবিধে হয় না।

আমরা এখন আর বিত্তশালী নয়। লোকে আমাদের অনেক টাকা পয়সা, ধন-দৌলত দেখে। সেটা সত্যি নয়। আমার দাদু তাঁর একার জীবনে অনেকটাই করেছিলেন, বাবা-জ্যাঠামশাইও যৌবনে ব্যবসাপত্রে মোটামুটি অর্থ উপার্জন করেছেন; হয়ত তখন কোনো বিত্ত আমাদের ছিল। বাবা সেই বিত্তের অহঙ্কারে দিদির জন্যে বেমানান পাত্র ধরে এনে বিয়ের পি'ড়িতে বসিয়েছিলেন। আমরা সবাই তখন বাবাকে বাহবা দিয়েছি। এক জ্যাঠামশাইকে দেখে আমার মনে হয়েছে, তিনি আড়ালে ওই বিয়েটাকে খুশী মনে মেনে নিতে পারতেন না। অথচ জ্যাঠামশাইয়ের মত ছাড়া এ-বিয়ে হত না। তিনি মত দিয়েছিলেন। বাবার পছন্দকে তিনি অপছন্দ করলেও সেটা বলার সাহস তাঁর হয় নি। একদিন, আমি জানি, জ্যাঠামশাইয়ের মতন মানুষও দুঃখ করে বলেছিলেন, মেয়ের বাবা হবার চেয়ে জ্যেঠা হওয়ার অনেক দুঃখ।

বাবার সঙ্গে জ্যাঠামশাইয়ের স্বভাবের এই অমিলটা সবচেয়ে বড় করে তখন আমার চোখে পড়ত। একজন যেন নিজের অধিকারটা ভাল করেই বুঝতেন, অন্যজন তাঁর অক্ষমতার কথা। দিদি যদি জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে হত, আমি জানি, দিদির ও-বিয়ে হত না। জ্যাঠামশাইয়ের মধ্যে যে-মানুষটি আছে সে কখনও হাত বাড়িয়ে কিছু নিতে শেখে নি। নিরাসক্ত পুরুষ বলে একটা কথা আছে, তার অর্থটা আমি জানি না, তবে জ্যাঠামশাইয়ের অনেকটাই ওই রকম। তেমনই ছিল আমার জ্যাঠাইমা। জ্যাঠামশাইয়ের চেয়ে আরও হয়ত বেশী। ছেলেপুলে হয়নি বলে মণিমার মনে-মনে দুঃখ ছিল কী না আমি কোনো দিন বুঝতে পারি নি। জ্যাঠামশাইকে দেখেও বোঝা যেত না, তাঁর মনে-মনে কোনো আফসোস আছে।

আমার সঙ্গে জ্যাঠামশাইয়ের সম্পর্কটা অনেক দিন ধরেই কেমন আগলা হয়ে গেছে। বিশেষ করে মা মারা যাবার পর থেকে। আমার কোথায় যেন নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। খুব অদ্ভুত চিন্তা এটা। কিন্তু চিন্তাটা হয়। মনে হয়, সংসারে জ্যাঠামশাইয়ের যা প্রাপ্য ছিল আমরা তা যথার্থই দিই নি। ভগবান যেমন জ্যাঠামশাইকে নিঃসন্তান করেছেন, আমরাও সেই রকম নিজেদের প্রাপ্য-টুকু পেয়ে তাঁর চোখের সামনে কর্তৃত্বটা দেখিয়েছি। এ-অপরাধ বাবার। বাবা মর্যাদা দিয়েছেন বড় ভাইকে কিন্তু কর্তৃত্বের অধিকার দেন নি।

নিজের এই অসহায় অবস্থাটার কথা জ্যাঠামশাই নিশ্চয় অনুভব করেন।

তবু তিনি কোনোদিন কোনো অভিযোগ করেন নি। করলে তাঁর অভিমান ঘা খেত হয়ত, কিন্তু আমাদের সংসারের অনেক দুঃখ কমত।

অবিন আমাদের পরিবারের যেটুকু দেখে এসেছে, সেটুকু আজকের। আমাদের পরিবারে এখনকার চেহারাটাই তার সব নয়। তার অতীত আছে, নানা শেকড় দিয়ে বাঁধা তার মূল আছে মাটির তলায়। অবিন কেমন করে সেটা জানবে? অবিন জানে না, শচিদাকে জ্যাঠামশাই কোন চোখে দেখেন।

শচিদার ওপর বরাবরই জ্যাঠামশাইয়ের একটা টান আছে। আমাদের বাড়ির সকলেরই ছিল। জ্যাঠামশাইয়ের সবচেয়ে বেশী। শচিদা একেবারে জ্যাঠামশাইয়ের মনের মতন ছেলে। দিদির সঙ্গে শচিদার বিয়ে হয় এরকম একটা ইচ্ছে জ্যাঠামশাইয়ের ছিল। বাবার ছিল না। বাবার ছিল না বলেই জ্যাঠামশাই নিজের মতামত দেন নি। দিতে সাহসও করেন নি তখন। বাস্তবিকই শচিদার পরিবারের কথা ভাবলে আমাদের ভয় হত। আমরা শচিদার সম্পর্কে কোনো আশাভরসা রাখতে পারতাম না। মনে হত যে-কোনোদিন যে-কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, শচিদা হয়ত আর থাকবে না।

দিদি বরাবরই অসম্ভব চাপা। তার চোখ দেখে মন বোঝার উপায় নেই। তবু শচিদার সঙ্গে দিদির যেরকম ভাবসাব ছিল সেরকম মেলামেশা দিদি অন্য কারও সঙ্গে করে নি। বিয়ের আগে দিদি এখনকার মতন ছিল না। তার স্বভাব তখনও চাপা ছিল, চুপচাপ করে থাকতেই পছন্দ করত। তবু মুখে যতই কেননা গম্ভীর-গম্ভীর ভাব থাক তার মুখে হাসি ছিল, আনন্দ ছিল। শচিদাকে দিদির ভাল লাগত যে তাও আমি জানি। সেটা ভালবাসা কিনা তা আমার জানা নেই। হতে পারে, নাও পারে।

নিজেদের বাড়ির কথা ভাবলে আমার মনে হয়, আমরা এমন একটা পরিবারে এসেছি যেখানে মানুষের নিজের ইচ্ছে বলে কিছু নেই। একমাত্র বাবা নিজের ইচ্ছেকে জানাতে এবং প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন; আর আমরা তার তলায় চাপা পড়ে গিয়েছি। জ্যাঠামশাই, মা দিদি—। আমিও চাপা পড়তাম। কিন্তু সেই ভয়ে আমি কলকাতা পালিয়ে এসেছিলাম। কলেজে পড়ার সময় থেকেই। দিদিই বাবাকে শেষকালে শিখিয়ে দিল, বাবার হিসেবে সংসার চলে না। বাবা সেই থেকে মুখ বুজে ফেললেন।

শচিদার অসুখের কথা জ্যাঠামশাইকে এই বয়সে খুব দুঃখ দেবে। নিজের আত্মীয় সম্পর্কের কেউ নয় শচিদা, তবু শচিদা বেঁচে থাকার মধ্যে জ্যাঠা-মশাইয়ের অনেকটা শান্তি ছিল। সেই শান্তি আর থাকবে না। জ্যাঠামশাইকে এই বয়সে অশান্তি দিয়ে কী লাভ?

বৃষ্টির শব্দ কানে নিয়ে আজ সকালে আমার ঘুম ভেঙেছিল। চোখ মেলে দেখি, ঘরের মধ্যে বাদলার ছায়া ছড়িয়ে আছে। কাল মাঝরাতে বৃষ্টি নেমেছে, ঘুমের মধ্যে বৃষ্টি নামার শব্দও কানে গিয়েছিল, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়েছি।

মুখ ধুতে গিয়ে বাথরুমের জানলা দিয়ে নজরে পড়ল, বৃষ্টির ঝাপটায় সামনেটা সাদা হয়ে আছে। কলকাতায় একটানা গরমের মধ্যে এই প্রথম বড় বৃষ্টি। মনে হচ্ছে, এই বেলাটা চলবে। বর্ষার এখনও সামান্য দেরী। আবহাওয়াটা প্রথম বর্ষার মতন দেখাচ্ছিল।

চা খাবার সময় নেনু এসে কাগজ দিয়ে গেল। আজ শনিবার। শনিবারে আমার অফিসের কাজকর্ম হালকা থাকে। বেলা বারোটা নাগাদ কার্টরাইট কোম্পানী থেকে তাদের লোক আসবে; তার সঙ্গে কিছু কাজ আছে, তারপর আমার ছুটি। অফিস ছুটির পর যতীনের সঙ্গে দেখা হবার কথা। আয়নার বিয়ের মোটামুটি সব ঠিক হলেও একটা কথা আছে যতীনের সঙ্গে। সন্ধ্যে-বেলায় যেতে হবে একডালিয়ায়। আমাদের অফিসের নন্দকিশোর হইচই করে ছেলের অন্নপ্রাশন করছে। প্রায় অফিস সুদ্ধু লোকের নেমন্তন্ন। গত বছর একটা গুজব ছড়িয়েছিল, নন্দকিশোর নাকি ডিভোর্সের জন্যে উকিলবাড়ি ছুটোছুটি করছে। এ-বছরে একেবারে আলাদা ব্যাপার, ছেলের অন্নপ্রাশনের জন্যে দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াচ্ছে। নন্দকিশোর খানিকটা পাগলা ধরনের। তার মাথায় যখন যেটা ঢোকে তাই নিয়ে মেতে ওঠে।

কাগজের পাতাগুলো উলটে যাবার সময় একটা সিগারেট ধরালাম। কাল দিন দুপুরে কলকাতায় একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছে। খবরটা পড়ে মনে হল, আজকাল ডাকাতটাকাতরা খাতিরের মানুষ। আজ অফিসে গিয়ে এই ডাকাতি নিয়ে নানারকম গল্প শোনা যাবে যে তাতে আমার সন্দেহ হল না। ডাকাতির পাশাপাশি আরও একটা ছোট খবর রয়েছে, কর্পোরেশনের মিটিঙে একজন কাউন্সিলার অন্য একজন কাউন্সিলারকে রাগের মাথায় জুতো ছুঁড়ে মেরেছে। আজকাল এইসব হামেশাই হয়। আমার কাছে এই ধরনের খবরের কোনো মূল্য নেই। আমাদের চারপাশে প্রত্যহ যা হয় প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে হলে বাঁচা যায় না। ব্যাংক ডাকাতি, জুতো মারামারির সঙ্গে আমার কোথাও কোনো যোগ নেই। বাস্তবিক আমি এসব ব্যাপারে কোনো উৎসাহ অনুভব করি না।

নেনু বাজারে যাবে, টাকা নিতে এল। নেনু আমার বাড়িতে উড়ে এসে

জুড়ে বসেছে। আজ চার-পাঁচ বছর আগেই রান্নাবান্না ঘরদোর দেখাশোনার জন্যে আমি বাড়ি থেকে লোক এনেছিলাম, অনাদি। বয়স্ক মানুষ। দেশের লোক। নেনু গত বছর কালী পুজোর পর কেমন করে যেন এ-বাড়িতে ঢুকে গেল। এখন তাকে সরানো মুশকিল। আমি একলা মানুষ, আমার জন্যে দুটো লোক রাখার দরকার নেই, মাঝে মাঝে নিজেরই খুব খারাপ লাগে; নেনুকে বলি, তুই আমার সঙ্গে বাড়িতে চল, ওখানে থাকবি। নেনু কলকাতা ছেড়ে যেতে নারাজ। এই শহরের নেশা বেটাকে পেয়ে বসছে। আমারই মতন আর কী।

পাশের ফ্ল্যাটের আশুদা আসছে, সিঁড়িতে আশুদার কাশির শব্দ। সকালের দিকে কাশিটা আশুদার বরাবরের। ভয়ঙ্কর সিগারেট খায়। স্মোকারস কাফ না কি বলে যেন, তাই।

ঘরে এসে আশুদা বলল, "খবর শুনেছ, সুহাস?"

"না। কিসের খবর? রেডিয়োর? আমি রেডিয়োর খবর শুনি না।"

"আরে রেডিয়োর খবর কে বলছে? পাড়ার খবর?"

"পাড়াতেও ডাকাতি হয়ে গেল নাকি আশুদা?" ঠাট্টা করে বললাম।

"রায়দের বাড়িতে একটা মেয়ে সুসাইড করেছে।"

"সুসাইড?"

"আজ আরলি মরনিংয়ের অ্যাম্বুলেন্স এসে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। এতক্ষণে হয়ত মারা গেছে।"

আশুদা কাশির মধ্যেই হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। আমি অবাক হয়ে বসে ছিলাম। অ্যাম্বুলেন্স এসে নিয়ে যাওয়া মানে মানুষটা যাওয়া পর্যন্ত বেঁচে ছিল। মারা গেছে এটা বলা যায় না।

"আপনাকে কে বলল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সমস্ত পাড়া জেনে গেল, আর আমি জানব না!...ঘুম থেকে উঠেই শুনলাম, তোমার বউদি বলল। তারপর বাজার করে ফেরার সময় খবর নিলাম। রায়দের সেজ মেয়েটা। ওই যে, যেটা থিয়েটারটিয়েটার করে বেড়াত; অ্যামেচার অ্যাকট্রেস। লীলাটীলা নাম।"

"ও! আচ্ছা!"

"চিনতে?"

"দেখেছি!" ...

"আমি শুনলাম, আরসেনিক পয়জেন, আর-একজন বললে, স্লিপিং ট্যাবলেটস...। মেয়েটা একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গিয়েছিল, বুঝলে। অবাধ্য, বেপরোয়া, রুড্, বাড়িতে বেশীক্ষণ থাকতটাকত না। আজকাল আবার শুনেছি মদটদও খেতে শুরু করেছিল। কী দিনকাল হয়ে গেল হে, মেয়েরাও মদ খেতে শিখল।"

চুপচাপ বসে থাকলাম। মেয়েটিকে মনে করতে কষ্ট হচ্ছে না। পথেঘাটে, ট্রামে, দোকানে অজস্রবার দেখেছি। কিছুদিন আগেও ওকে রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেখেছি। মেয়েটা উদ্ধত প্রকৃতির ছিল কিনা জানি না কিন্তু তার চেহারায় একটা উদ্ধত ভাব ফুটে থাকত।

আশুদা নিজেই বলল, "ওদের ফ্যামিলিটাই ছন্নছাড়া। কেউ কারুর তোয়াক্কা করে না, যে যার নিজের মতন। অথচ বেশ বড় ফ্যামিলির ছেলেমেয়ে ওরা বুঝলে সুহাস; নৃপেনের বাবা ডি. এম. ছিলেন, সেই আগের দিনের। ছেলে-মেয়েগুলো কী রকম হয়েছে দেখেছ? একটা বন্ধ মাতাল, একটা চিট, মেয়ে তিনটের তিন ধরনের লাইফ। বড়টা বিয়ে করেছে সেদিন, কিন্তু স্বামীর বাড়ি যায় না। সে-বেটা শ্বশুরবাড়ি এসে বউকে নিয়ে ট্যাক্সি করে হাওয়া খেয়ে আবার যথাস্থানে ফেরত দিয়ে যায়। বিচিত্র ব্যাপার সব।"

আমি লীলার কথা ভাবছিলাম। মাস দু-তিন আগে এ-পাড়ার ছেলেদের কিসের একটা চ্যারিটিতে আমায় ওদের থিয়েটার দেখতে যেতে হয়েছিল। লীলা অভিনয় করেছিল সেখানে। মন্দ করে নি।

"তা হঠাৎ স্যুসাইড করার কী হল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"শুনি নি কিছু। বাড়ির গণ্ডগোল হতে পারে, প্রাইভেট অ্যাফেয়ার হতে পারে। আবার রোগটোগও হয়ে থাকতে পারে।"

"রোগ?"

"মেয়েরা মদটদ শুরু করলে নানা বেয়াড়া রোগে পড়ে। তাই তো শুনি। থাকগে, পাড়ার মেয়ে স্যুসাইড করছে শুনলে কেমন যেন লাগে হে।"

আশুদার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকলাম। এই মানুষটি যে পাড়ার গেজেট তা ঠিক নয়, তবু মেলামেশা অনেকের সঙ্গেই, খোঁজ খবরও রাখে নানা রকম। পাড়ার কেচ্ছা, বাড়ির কেচ্ছা গেয়ে বেড়ানোর স্বভাব আশুদার নয়। লীলার আত্মহত্যা করতে যাওয়ার খবরটা যে আশুদাকে সামান্য বিচলিত করেছে সেটা বোঝা যায়।

"চা খাবেন?" আমি বললাম।

মাথা নাড়ল আশুদা। "না, চা আর খাব না। আমায় আজ তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। অফিস ছুঁয়ে দুপুরে যাব শ্রীরামপুর।"

"সেখানে আবার কী?"

"তোমার বউদির মামা ঠ্যাং ভেঙে পড়ে আছে, একবার গিয়ে 'কেমন আছেন—' করে আসা।" আশুদা হাসল।

আমিও হেসে ফেললাম।

সিগারেটটা শেষ করে উঠতে-উঠতে আশুদা বলল, "বুঝলে, সুহাস, আমাদের বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মা, বাপ, ভাই বোন—এ আর এক হাতের পাঁচটা আঙুল নয়। কেউ কারুর সঙ্গে জোড়া নয়। এক-একজন এক-একদিকে ছিটকে পড়েছে। একটা সময় মা দুর্গার প্রতিমা

তৈরী হত সকলকে সঙ্গে নিয়ে, আজকাল স্টাইল হয়েছে সেপারেট কার্তিক গণেশ, সেপারেট লক্ষ্মী সরস্বতী। এটা সেপারেশনের যুগ হে, আলাদা থাকব, আলাদা করব, সবই আলাদা। আমি তোমার বউদিকে বলি, আট বছর ধরে আমার গা ঘেঁষে পড়ে আছ, তুমি কেমন মানুষ! এসো সেপারেট হয়ে যাই, কী বলে যে আজকাল—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাতন্ত্রটাতন্ত্র রক্ষা করি। তা ভাই তোমার বউদি খুব সেয়ানা; বলে : একসঙ্গে আছি বলে বুঝি পারছ না। আলাদা হলেই আর-একটা বউ জোটাবে? কত সাধ? আশুদা ভারী গলায় হোহো করে হেসে উঠল।

আমিও হাসলাম। "আশুদা?"

"বলো ব্রাদার।"

"আপনি এখনও পুরনো থেকে গেলেন।"

"আমি যতটা পুরনো, আমার বাবা তার চেয়ে পুরনো ছিলেন, ঠাকুরদা আরও পুরনো। কার কাছে কোনটা পুরনো বোঝা মুশকিল। ব্যাপারটা কী জান? বাজারে গভর্নমেন্ট নতুন 'কয়েন' ছাড়লে দিন কতক লোকে তাই নেবার জন্যে হুড়োহুড়ি করে, ক'দিন পরে সেটাই পুরনো, দি নিউ বিকামস ওল্ড। আমি পুরনো। তাতেই আমি খুশী ভাই।"

আশুদা চলে গেল। এই ফ্ল্যাটে আসার পর আজ বছর তিন আমি আশুদার পাশাপাশি রয়েছি। আশুদারা এই ফ্ল্যাটে বছর সাত। দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে দিব্যি আছে আশুদা। তবে তার বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের ভিড় হয় প্রায়ই। বাইরের আত্মীয়স্বজনের যত রকম ঝঞ্ঝাট সব আশুদাকে বইতে হয়। কিছুদিন আগেই এক মামাতো বোন এসেছিল অপারেশান করাতে। আশুদাকেই সব ব্যবস্থা করতে হল। রত্নাবউদি মানুষটিও বড় চমৎকার। আমার চেয়ে বয়সে ছোট, ঠাকুরপো বলে ডাকেন, ভাল তরিতরকারি করলে নিজে দিয়ে যান। আর আশুদার মেয়ে রিমকি আমার প্রায় বন্ধু। আমি তাকে নিমকি বলি।

আশুদা চলে গেলে দাড়ি কামাবার জন্যে উঠে পড়লাম।

লীলার আত্মহত্যার খবর এই সকালটাকে মাটি করে দিচ্ছিল। মেয়েটিকে আমি যতটুকু চিনি সেটুকু মুখের চেনা। তাতে অভিভূত হওয়া যায় না, দুঃখ পাওয়াও খুব স্বাভাবিক নয়। ওই ধরনের একটি মেয়ের আত্মহত্যার কথা শুনলে মানুষ যেটা বোধ করে সেটা কৌতূহল। সে-রকম কৌতূহল আমার না হচ্ছিল বলি না। কিন্তু অন্য কথাই আমার বার বার মনে পড়ছিল। লীলাদের পরিবারের মতন পরিবার কেমন করে হয়? কী করে হয়? আশুদা না বললেও আমি জানি, ওদের পরিবারটা অদ্ভুত। চোখে মুখে ওদের পরস্পরের মধ্যে কিছু মিলটিল থাকলেও অন্য কোথাও মিল নেই। পরস্পরকে সহ্য করতেও পারে না। বড় ভাই নৃপেন একদিন লণ্ড্রিতে তার জামা-প্যান্ট নিতে গিয়ে ছোট ভাই মৃগেনের গলা টিপে ধরেছিল। আমি একদিন নিজের চোখে দেখেছি দু-বোন একই ট্রাম থেকে নেমে দুটো আলাদা রিকশা ভাড়া করে বাড়ি ফিরছে।

বোধ হয়, সাংসারিক ঝগড়ার সময় ছাড়া ওরা একজন অন্যজনের সঙ্গে কথাও বলে না।

এই ধরনের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের তুলনা করলে আমি যেন আশ্চর্য এক অহঙ্কার ও আনন্দ অনুভব করি। কেন করি সেটা বোঝা কঠিন নয়। মানুষকে খুব বেশী খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে নেই। অন্তত আমার মতন সাধারণ লোকের নয়। খুঁটিয়ে দেখলে ছোটখাটো দোষ অনেক চোখে পড়ে। চোখে পড়াটা খারাপ নয়, কিন্তু আমাদের স্বভাব, দোষগুলোকে আমরা নিজের স্বার্থে লাগাবার চেষ্টা করি। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে, আমাদের বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষকে আমি যদি চুলচেরা বিচার করি তাহলে আমি যে কোনো অসঙ্গত কাজ করার সমর্থন পেয়ে যাব। বাবার চেয়ে অনেক বেশী অহঙ্কারী কর্তৃত্বপরায়ণ আমি হতে পারি। পারি না কি? এখন আমি আমাদের পরিবারের বড় ছেলে। আমি যদি সংসারের মাথায় চড়তে চাই, নিশ্চয় পারি। জ্যাঠামশাইকে অসম্মান না করেও পারি, দিদিকে তার ঘর থেকে না সরিয়েও পারি। কিন্তু আমার সে-কাজ করতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে, উৎসাহ, আগ্রহ হয়নি; হবে না। আমাদের বাড়ি থেকে ঘুরে এসে অবিন একদিন আমায় ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সুহাস, তোমাদের বাড়ির বাঁধনটা কী?' আমি বলেছিলাম, 'তুমি যে চোখ বুজে থাকো তা আমি মনে করি না। আমায় তুমি ঘাঁটাতে চাইছ। তা হলেও বলছি, আমরা নিজেরাই নিজেদের বাঁধতে দিয়েছি। ধরে বেঁধে যেটা বাঁধা হয় সেটা শাস্তি, পুলিসে যেমন চোরকে বাঁধে। আমরা তো চোর নই হে, ভদ্রজন।' অবিন অবশ্য জবাবে কিছু বলে নি। লীলাদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের বাড়ির তফাতটা এইখানে। তারা মা-ছেলে-মেয়ে মিলে এক বাড়িতে থাকে—কিন্তু তারা যে যার নিজের রাস্তায় ছিটকে যাবার জন্যে সব সময় তৈরী। নেহাত বাড়িটা কিংবা টাকা-পয়সা অথবা কোনো স্বার্থ তাদের জোর করে বেঁধে রেখেছে এক জায়গায়। আমরা তা নই। আশুদা ঠিকই বলেছে। আজকাল সমস্ত সম্পর্ক ভাঙার মুখে।

দাড়ি কামানো হয়ে গেল। আর-এক কাপ চা খেয়ে স্নান করতে চলে গেলাম।

•

দুপুরে ছুটির পর যতীন এল। বললাম, চল নিরিবিলি কোনো জায়গায় যাই, কথা আছে।

চৌরঙ্গিতে আমাদের একটা নিরিবিলি বসার জায়গা আছে। যতীন ঠাণ্ডা বিয়ার নিয়ে বসল। বিয়ারটা ও খেতে পারে। আমি কফি নিয়ে বসলাম। তার মানে এই নয় যে, আমি কোনোদিন মদ্যাদি স্পর্শ করি নি। বছরে এক আধবার, বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড়ে বসে করেছি। তেমন কিছু সুখ পাই নি।

যতীন বিয়ার খেতে-খেতে বলল, "বল্।"

আমি সিগারেট ধরিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "কথাটা আমার

তোকে আগেই বলা উচিত ছিল। আমি বলি নি এই জন্যে যে, আমার ছোট বোনের বিয়ের ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় তা না দেখে এসব কথা বলার কোনো মানে হয় না।"

যতীন তার চুরুট ধরাল। "দেনাপাওনার কথা বলছিস?"

"আরে না। ওসব টাকা-পয়সার কথা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কিছু নেই। জ্যাঠামশাই চিঠিপত্রে ওটা লিখে দিয়েছে। এটা অন্য কথা।"

"কী কথা?"

বলতে আমার অস্বস্তি এবং কুণ্ঠা হচ্ছিল। অথচ এই কথাটা আর ফেলে রাখা যায় না। জ্যাঠামশাই এবার আমায় চিঠিতে বিশেষ করেই কথাটা পরিষ্কার করে নিতে বলেছেন। আমি বললাম, "যতীন, কথাটা আমাদের ফ্যামিলির ব্যাপার। এটা সিক্রেট। আমি চাই না কথাটা অন্য কানে যাক।"

যতীন আমার দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকল। সে বুঝতে পারছিল না আমাদের মতন পরিবারে কী এমন গোপনীয়তা থাকতে পারে।

এক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া গিলে আমি বললাম, "তুই জানিস আমার দিদি আছে।"

যতীন যেন বিরক্ত হয়ে বলল, "তোর কী মাথাফাথা খারাপ হয়েছে? দিদি আছে—। শালা, তোর দিদি আছে এটা কি নতুন কথা নাকি!"

"না, কথাটা নতুন নয়, কিন্তু দিদি, মানে আমার দিদি যে কিছুতেই বিয়েথা করতে রাজী হল না বলে তার বিয়ে হয় নি এটা সত্যি কথা নয়। কেউ জিজ্ঞেস করলে আমরা বলি অসুখ-বিসুখের জন্যে বিয়ে করে নি। অবশ্য আমাদের সেসব কথা কেউ জিজ্ঞেস করে না, আমরাও কিছু বলি না। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। দিদির খুবই বড় যায়গায় বিয়ে হয়েছিল। তোরা যাকে বনেদী বাড়ি বলিস সেই রকম বনেদী বাড়িতে, বড়লোকের ঘরে। স্বামীটা স্কাউণ্ড্রেল, রাস্কেল, দুশ্চরিত্র। দিদি বিয়ের পর মাস সাত আট শ্বশুড়বাড়িতে ছিল। তারপর বাপের বাড়ি চলে আসে। সে আজ দেড় যুগের কথা। দিদির শ্বশুরবাড়ির কারুর সঙ্গে দিদির বা আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তুই এখন একে যা খুশি বলতে পারিস, যদি বলিস ডিভোর্স তবে তাই। ...এটা না জানিয়ে আমার ছোট বোনের বিয়ে দেওয়া যায় না। উচিতও নয়।"

যতীন আগাগোড়া আমার মুখ দেখছিল। সে যে অগাধ জলে পড়েছে তার মুখ দেখে তা বোঝা যাচ্ছিল। যতীনের ভুরু কোঁচকাল, চোখ তীক্ষ্ম হল, মুখে সামান্য ঘাম দেখা দিল। দুশ্চিন্তা, বিস্ময়, বিমূঢ়তায় তার মুখ যেন অন্ধকার হয়ে এল।

আমি চুপ করে বসে যতীনের মুখ থেকে কিছু শোনার জন্যে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

অনেকটা বিয়ার একসঙ্গে খেয়ে ফেলল যতীন। চুরুটটা ধরাতে-ধরাতে তার

চশমাটা চোখে পরে নিল।

"কী রে?" আমি বললাম।

যতীন মাথা নাড়ছিল। "এই কথাটা তুই আমাকে আগে কেন বলিস নি?"

আমার বলার কিছু ছিল না। বললাম, "আমি আগেভাগেই কথাটা বলতে চাইছিলাম না। আননেসেসারী বলে লাভ কী? এখন মোটামুটি ফাইন্যাল হয়ে এসেছে বলে বলছি।"

যতীন বেশ রাগ করেই বলল, "সুহাস, তুই খুব ছেলেমানুষী করেছিস। তুই আমি বা আমাদের বন্ধুবান্ধবরা কী—তার ওপর আমাদের ফ্যামিলি ডিপেণ্ড করছে না। মাথার ওপর বাপ মা রয়েছে। আমাদের সংসারে ওই বুড়োবুড়ির দল পাহারাদার হয়ে আছে এখনও। যতক্ষণ ওরা বেঁচে আছে ওই জায়গায় আমাদের মাথা নুইয়ে ঢুকতে হয়। তাছাড়া এটা হিন্দুসমাজ। আমায় তুই ভুল বুঝিস না; আমরা সব কিছু গ্রহণ করব এমন কথা তোকে কে বলল?"

আমার মনে-মনে এই ভয়টাই ছিল। অস্বস্তি, লজ্জা, দুশ্চিন্তায় আমার কেমন যেন হচ্ছিল। আমি বললাম, "সমাজ নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না, যতীন। হিন্দু সমাজের হিন্দুত্ব কোথায় তা তুই-আমি সমানই জানি।"

"আমিও তো তাই বলছি। তর্কটা তোর বাড়িতে বসে আমরা করতে পারি, বন্ধুবান্ধবে মিলে। সেটা জমবে। অবিন হতচ্ছাড়া ট্রাম্পের পর ট্রাম্প করে যাবে। কিন্তু তর্ক দিয়ে কি আমাদের সংসার চলে?"

"হ্যাঁ, তা চলে না। কিন্তু বিবেচনা? বিবেচনা বলে একটা কথা আছে। বোধবুদ্ধি বলে জিনিস আছে।"

"হয়ত আছে। কিন্তু কার কাছে? কখন?...তুই কেন বুঝছিস না, এই কথাটা যদি গোড়ায় বলে নেওয়া যেত তাহলে আজ অন্যরকম দাঁড়াত। হয় কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যেত না হয় আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়াত। যদি পিসিমাদের বাড়িতে সব জেনেশুনে কথাটা এগিয়ে নিয়ে যেত আমরা কেয়ার করতাম না। এখন কথাটা বলতে গেলেই ওরা অন্যরকম ভাববে।"

"ভাববে?"

"ভাববে না! বাঃ!...ভাববে, আমরা কথাটা ইচ্ছে করে চেপে রেখেছিলাম।"

"তা নয় যতীন, তুই......"

"আমি জানি, তা নয়। কিন্তু সুহাস, এই বিয়েটা আমার ছেলের নয়, এমনকি আমার সহোদর ভাইয়ের নয়। পিসিমার ব্যাপার। তুই আমার পজিসানটা বুঝে দেখ।"

আমি চুপ করে থাকলাম। যতীনও চুপ। আমরা কেউ কারও দিকে বড় তাকাচ্ছিলাম না। বা তাকালেও বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারছিলাম না। আমার মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবু অনুভব করছিলাম আমাকে নিশ্চয় বিমর্ষ, ক্ষুব্ধ, বিরক্ত দেখাচ্ছিল। অসম্ভব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। যতীন গম্ভীর। চুরুটে ধোঁয়া ছিল না।

হঠাৎ অধৈর্য এবং বিরক্ত হয়ে যতীন বলল, "তুই একেবারে ছেলেমানুষ! তোর কোনো সাংসারিক বুদ্ধি নেই। আমারই ভুল হয়েছিল। আমার উচিত ছিল তোর সঙ্গে এ-সব ব্যাপারে কথা না বলে তোর বাড়ির সঙ্গে কথা বলা।"

সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে আমি জানলা দিয়ে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকলাম। বৃষ্টি কেটে গেছে দুপুরেই। মেঘলা রয়েছে।

যতীন বলল, "যাক্ গে, দেখা যাক কী করা যায়!"

আমি ওর দিকে তাকালাম না।

আরও একটু বসে থেকে বললাম, "তুই একটু বোস, আমি একটা ফোন করে আসছি।"

ফোন করার নাম করে আড়ালে এসে আমি চোখমুখ ধুতে গেলাম।

আমার আর বাড়ি ফেরা হল না ভেবেছিলাম, যতীনের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে বিকেলেই বাড়ি ফিরব, তারপর সন্ধ্যের মুখে যাব একডালিয়ায়, নন্দকিশোরের বাড়ি। যতীন আমার মন খারাপ করে দিল। কিছু আর ভাল লাগছিল না। চৌরঙ্গিতে দাঁড়িয়ে যতীনের সঙ্গে শেষ কথা হল; সে বলল—কালকেই সে তার পিসিমার বাড়িতে যাবে, যদি পারে পিসিমার বাড়ি ঘুরে সন্ধ্যে নাগাদ আসবে আমার কাছে।

যতীন চলে যাবার পর আমি কিছুক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। কী যে হয়ে গেল—আমি যেন ভাল করে বুঝতে পারছিলাম না। এতটা এগিয়ে এসে আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছি, আমায় কে কী বলবে, কী হবে—এইসব ভাবতে-ভাবতে মাথা ধরে আসছিল। চোখের সামনে অদ্ভুত এক ফাঁকা ভাব দেখছিলাম। মেঘলা আবার কখন ঘন হয়ে এসে বড়-বড় ফোঁটায় এক ঝাপটা বৃষ্টি দিয়ে রাস্তা ভিজিয়ে চলে গেল। বাড়ি ফিরে স্নান সেরে নন্দকিশোরের বাড়ি যেতে আমার আর ইচ্ছে করছিল না। অথচ একডালিয়ায় না গিয়ে উপায় নেই। ভেবে দেখলাম, কিছু একটা কিনে এই বেলা অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নটা সেরে আসা যেতে পারে। নন্দকিশোর চেঁচামেচি করবে, তা করুক; ওকে বুঝিয়ে চলে আসা যাবে।

শনিবার! বিকেল হয়ে গেছে কখন। এদিকের দোকানপত্র বারো আনাই বন্ধ। খানিকটা খোঁজাখুঁজি করে বড় রকমের একটা খেলনা পাওয়া গেল। ওখান থেকেই ছুটলাম একডালিয়ায়।

নন্দর বাড়ি থেকে বেরুতে-বেরুতে সন্ধ্যে। পাতলা করে বৃষ্টি নেমেছে।

মাথা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে হাঁটি খানিকটা। ট্রামে বাসে ভিড়। কোন রাস্তা দিয়ে কোথায় যাচ্ছি তাও যেন আমার স্পষ্ট খেয়াল হচ্ছিল না। খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। যতীনের কথাবার্তা থেকে আমার আর ভরসা হচ্ছিল না। অমলদের বাড়ির ওপর আমার রাগ হচ্ছিল। এত কুসংস্কার তোমাদের? আমরা তো মিথ্যে বলছি না কিছু, যা ঘটেছে যা হয়েছে—তাই বলছি। দিদির বিয়ের সঙ্গে আয়নার বিয়ের কী সম্পর্ক? তোমরা ভাব কি আমাদের? যাও না, একবার দেখে এস আমার দিদিকে। তার রূপ তোমাদের কানা করে দিতে পারে, তার চরিত্র, স্বভাব, গুণ তোমরা আর ক'টা মেয়ের মধ্যে পাবে! আমি বলছি, দিদিকে দেখলে তোমাদের ধারণা পালটে যাবে।

বৃষ্টিটা আচমকা যেন জোরে এসে গেল। জলের ঝাপটা বাঁচিয়ে হঠাৎ হাত তুললাম। সামনে দিয়ে একটা ট্যাক্সি চলে যাচ্ছিল। ট্যাক্সিটা যেতে-যেতে খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কয়েক পা দৌড়ে ট্যাক্সির কাছে যেতেই দেখি একটি মেয়ে ট্যাক্সির মধ্যে উঠছে। তার গায়ে হালকা রঙের শাড়ি, হাতে ছাতা। ট্যাক্সিটা হাতছাড়া হয়ে গেল, আশ্চর্য তো! আমি হাত বাড়িয়ে ডাকলাম, আর অন্য একজন উঠে বসল। একটা কিছু বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল। অথচ এক্ষেত্রে কী বলা যায়।

ট্যাক্সি ড্রাইভার কিছু বলার আগেই গাড়ির ভেতরের মেয়েটি আমায় বলল, "আসুন।"

দরজাটা তখনও খোলা। মনে হল মেয়েটি আমায় দেখছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি আমাদের ফ্ল্যাটের উলটো দিকের সেই মেয়েটি, মুখে শ্বেতীর দাগ।

খানিকটা বিমূঢ় হয়ে কিছু বলতে চাইবার আগেই মেয়েটি আবার বলল, "আসুন আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

উঠে পড়লাম। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হঠাৎ তীব্র হয়ে বেশ শব্দ হচ্ছে। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল।

রুমাল বের করে মুখ মাথা মুছতে-মুছতে কৈফিয়তের মতন করে বললাম, "একটু আগে আমি হাত তুলেছিলাম। ভেবেছিলাম ট্যাক্সিটা আমার ডাক শুনে দাঁড়িয়েছে। আপনিও যে ডেকেছেন বুঝতে পারি নি।"

"তাতে আর কী!" মেয়েটি বলল।

রুমালটা ভিজে গেল। পকেটে রাখা যায় না। হাতের মুঠোয় ধরে থাকলাম।

"ভিজে গিয়েছেন?" মেয়েটি বলল।

"না, তেমন একটা নয়; সামান্য।" রুমালটা হাতে না রেখে আমার পোর্ট-ফোলিওর ওপর রাখলাম। "আপনি তো আমাদের পাড়ায় নতুন এসেছেন।"

"হ্যাঁ আপনাকে আমি দেখেছি।"

"আপনাদের ফ্ল্যাটের উলটো দিকে আমার ফ্ল্যাট। আমার নাম সুহাস, সুহাস মিত্র"।

"আপনার ফ্ল্যাটটা আমি জানি। আমার নাম ইন্দু। ইন্দুমতী হালদার।" ইন্দু সপ্রতিভভাবে বলল।

আমি সামান্য মুখ ফিরিয়ে ইন্দুকে দেখছিলাম। সামান্য হেসে বললাম, "বাঃ, আপনার নামটি তো বেশ।...আপনাকে আমি প্রায়ই দেখি, স্টেথসকোপ হাতে যাচ্ছেন।"

"আমি ডাক্তার।"

"আচ্ছা! আমারও তাই মনে হত। তবে কিছু মনে করবেন না, আমি একেবারে নভিস; ঠিক বুঝতে পারতাম না আপনি স্টুডেন্ট না ডাক্তার।"

"ডাক্তার। গত বছর পাশ করেছি।"

একটু চুপচাপ। ইন্দুকে স্বাভাবিক বেশে বড় একটা দেখি নি; আজই দেখলাম। মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত, কোনো বিনুনি-টিনুনি নেই, খোঁপাও নয়, সাধারণভাবে আঁচড়ানো, বাতাসে হয়ত সামান্য এলোমেলো হয়ে আছে। ঘাড় পরিষ্কার, গলা মাঝারী রকম লম্বা। মুখটি সুশ্রী, তবে খুব সাদামাটা দেখাচ্ছিল, গায়ের শাড়িটি হালকা নীলচে রঙের, ছোট-ছোট ফুলের ছাপ রয়েছে।

"আপনি কি কোনো কলেজের সঙ্গে অ্যাটাচড্?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ। আমাদের তো কলেজের সঙ্গে থাকতে হয় কিছুদিন," ইন্দু বলল। সে তার কলেজের নাম বলল।

"আজ আপনার কলেজ ছিল না?"

"সকালে ছিল। বিকেলে ছুটি নিয়েছি।... আমরা আগে এদিকে থাকতাম। দেখা করতে এসেছিলাম দু-একজনের সঙ্গে।"

"ও, আচ্ছা!...আমি এসেছিলাম এক বন্ধুর ছেলের অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন রাখতে। সোজা অফিস থেকেই এসেছি একরকম" বলে আমি আমার পোশাক-আশাকটা যেন দেখালাম ইন্দুকে।

ইন্দু কিছু বলল না।

ট্যাক্সিটা বেশ জোরেই যাচ্ছিল। বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তার আলোগুলো বৃষ্টির মধ্যে ঝাপসা দেখাচ্ছিল। ব্রেক করে ড্রাইভার দাঁড়াল। আলো পাবার পর ল্যান্সডাউনে ঢুকে পড়ল পাক খেয়ে।

"আজ আমাদের পাড়ায় একটা স্যাড ব্যাপার হয়েছে, আপনি শুনেছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না। কী হয়েছে?"

"একটি মেয়ে স্যুসাইডের চেষ্টা করেছিল।"

"স্যুসাইড?" ইন্দু আমার দিকে তাকাল।

"তাই শুনলাম।...আরসেনিক পয়জেন কিংবা স্লিপিং ট্যাবলেটস..."

ইন্দু আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তার গলার সরু হারটায় আঙুল ঘষছিল, জড়াচ্ছিল। লকেটটা শাড়ির আঁচলের পাশে দুলছিল।

কৃশ্চান?

"আমি তা হলে যাই," আমি বললাম।

"আপনি আমায় খুব অপদস্থ করলেন। এমন জানলে—"

"ট্যাক্সিতে নিতেন না?" আমি হেসে বললাম।

ইন্দু অপ্রতিভ হয়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। তারপর হেসে ফেলল। ছাতাটা খুলে নিয়ে বলল, "বেশ...একদিন আমাদের বাড়িতে আসবেন।"

আমি শুধু ঘাড় হেলালাম। আসব।

ইন্দু তাদের বাড়ির সদরে দাঁড়াল। আমি রাস্তা পেরিয়ে আমার বাড়ির সদরে। দরজাটা ভেজানো ছিল।

সিঁড়ি উঠতে-উঠতে আমার বেশ মজা লাগছিল। বাড়ি ঢোকার আগে আমার কথা শুনে ইন্দু যখন হেসে ফেলেছিল, তখন তাকে একেবারে সাধারণ একটি মেয়ের মত দেখাচ্ছিল, সে যে ডাক্তার এটা যেন—কিংবা তার ডাক্তারিত্ব—বেমালুম উধাও হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি বেশ। রাস্তায় তাকে যতবার আগে দেখেছি, ইন্দুর মুখের গাম্ভীর্য, খানিকটা বা তার আত্ম-সচেতন ভাবটা তাকে কেমন স্বতন্ত্র করে রাখত। আজ আশ্চর্যভাবে দেখলাম, মেয়েটি আর পাঁচজনের মতন, তার গার্হস্থ্য, ভদ্র, সামাজিক, শালীন, সপ্রতিভ চেহারা আছে।

সারাদিন পরে এই সন্ধ্যেটুকু আমার ভাল লাগল।

বিশ্রাম এবং স্নান সেরে অনেকটা আরাম পাওয়া গেল। চা খেলাম এক কাপ। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

আয়নার বিয়েটা আমায় নানাদিক দিয়েই ভাবিয়ে তুলল। কী হবে আমি বুঝতে পারছি না। অমলদের বাড়ি থেকে আপত্তি করলে জ্যাঠামশাইকে যদি ব্যাপারটা আমায় লিখতে হয়, আমি কী লিখব কে জানে। সোজা কথাটা লেখা সম্ভব নয়। অথচ না লিখেও উপায় নেই। এতটা এগিয়ে এসে পিছিয়ে যাওয়ায়, জ্যাঠামশাই মনে মনে খুব হতাশ হয়ে পড়বেন। হওয়া স্বাভাবিক। আমি ধরেই নিচ্ছি, জ্যাঠামশাই চিঠিতে যখন নিজেই ব্যাপারটা লিখেছেন তখন তিনি খানিকটা দোমনা হয়ে আছেন, তবু আশা রাখা আর নিরাশ হয়ে যাবার মধ্যে তফাত আছে বইকি।

যতীন আমায় ছেলেমানুষ বললেও আমি ছেলেমানুষ নই। আমার বাবা জ্যাঠামশাই কেউই ছেলেমানুষ ছিলেন না। বাবা বছর খানেক হল মারা গেছেন। আয়নার যে বিয়ের বয়েস অনেকদিন হয়ে গেছে এটা নিশ্চয় তাঁর চোখে পড়ত। জ্যাঠামশাইও চোখ বুজে নেই। তবু আমাদের বাড়িতে আয়নার বিয়ে নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাতে কেউ বসেনি। তার কারণ দিদি। আয়নার বিয়ের সম্বন্ধ এলে দিদির কথাটা এড়ানো যাবে না, এটা আমরা জানতাম। বিয়ের

পরও দিদি স্বামীর ঘর করে নি, স্বামীকে ত্যাগ করেছে—এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে যা, অন্যের কাছে তা নয়। মেয়েরা বিয়ে না করলে সন্দেহ, বিয়ে করে স্বামীর সংসার না করলে সন্দেহ, স্বামী মারা যাবার পর বিধবা হলেও যে তাদের সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হয়ে যাই তাও নয়। তবু অবিবাহিত মেয়ে আর বিধবার খানিকটা ছাড় আছে, স্বামী ত্যাগ করলে বিবাহিতার কোনো উপায় নেই। আমার বাবা বুদ্ধিমান ছিলেন; তিনি জানতেন, তাঁর ছোট মেয়ের বিয়ের পাত্র জোটানোয় অসুবিধে আছে। বাধ্য হয়েই তিনি চুপ করে ছিলেন। নিজের কৃতিত্ব দেখাবার জন্যে যে-মানুষ বড় মেয়েকে একটা নিমিত্ত করে নিয়েছিলেন, সেই মানুষ ছোট মেয়ের বেলায় নিজের অক্ষমতা এবং অসহায় অবস্থাটাই প্রকাশ করেছেন। অবশ্য লুকিয়ে।

দিদিকে আমি কোনোদিন দোষ দিই নি। আজও দিই না। কিন্তু দিদির জন্যে যদি আয়নার জীবনটা নষ্ট হয়ে যায় তখন আমি কী করব? কার ওপর রাগ করব? সমাজের ওপর? দিদির ওপর? সমাজের ওপরই আমার রাগ হবার কথা। অথচ সমাজ কে? তার সঙ্গে লড়বার জন্য আমার যত আগ্রহই থাক সে তো আমায় গ্রাহ্য করছে না। সে তার অদ্ভুত, বিসদৃশ, কিম্ভুত এক

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আশুদা আমায় ডাকছিল। বিছানা ছেড়ে উঠে বসতে বসতে সাড়া দিয়ে বললাম, "আসুন"।

ঘরে এসে আশুদা বলল, "কী গো, গোকুল যে আজ অন্ধকার দেখছি?"

আমি বললাম, "আজ কেউ আসে নি। আমিও ছিলাম না। একটা অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন সেরে খানিকটা আগে বাড়ি ফিরেছি।"

"তাই বলো। আমি ভাবলাম, এমন বৃষ্টিবাদলার দিন, শনিবারের সন্ধ্যে, অথচ তোমার ইয়ার-দোস্তদের সাড়াশব্দ নেই, হল কী?"

আমি একটু হাসলাম।

আশুদা গলা পরিষ্কার করার কাশি কাশল। "খাওয়াদাওয়া সেরে এসেছ তাহলে? এখন কি ঘুম?"

"না না, ঘুম না; শুয়ে ছিলাম। কটা বেজেছে বলুন তো?"

"সোয়া নয়।"

"বৃষ্টিটা মন্দ হল না।"

"আর একটা জোর শাওয়ার হলে দু-তিনটে দিন কাটিয়ে দেওয়া যাবে। তারপর বর্ষা আসছে।"

আশুদার পরনে সাদা লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই। বাড়ি ফিরে স্নানটান সেরে গল্পগুজব করতে এসেছে।

"শ্রীরামপুর গিয়েছিলেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"না গিয়ে রক্ষে আছে! সোয়া পাঁচটা থেকে ফিরব ফিরব করছি, সাতটা নাগাদ গাড়ি পেলাম। হাওড়া স্টেশনে নেমে দেখি জোর বৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ি আসতে-আসতে আটটা বেজে গেল।...নাও, সিগারেট খাও।"

আশুদা আমায় সিগারেট দিয়ে নিজে একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া গিলে ফেলে বলল, "রায়দের বাড়ির মেয়েটার খবর শুনলে?"

"না। মারা গেছে নাকি?"

"দুপুরেই মারা গেছে।"

আমার জিব দিয়ে একটা স্বাভাবিক দুঃখের শব্দ বেরুলো।

আশুদা চুপচাপ সিগারেট খেতে লাগল। মুখ দেখে মনে হল, কোথাও যেন কেমন দ্বিধা-সন্দেহ রয়েছে। কিসের দ্বিধা তা বোঝা যায় না। আমার দিকে তাকাল আশুদা, বলল, "আমি ভেবেছিলাম, তুমি খবরটা শুনেছ।"

"না। আমিও তো খানিকটা আগে বৃষ্টির মধ্যে ছুটতে ছুটতে এসে বাড়ি ঢুকেছি।"

আশুদা অল্প অপেক্ষা করে বলল, "শুনলাম, কাল বডি পোস্ট মর্টমে যাবে। সৎকার হতে-হতে সন্ধ্যে। কিংবা পরশু।...আরও একটা ব্যাপার শুনছি বুঝলে সুহাস? বাড়িতে কোনো ঝগড়াঝাটিও হয় নি। ও যে আত্মহত্যা করবে তা ঘুণাক্ষরেও কাউকে বুঝতে দেয় নি, খুব ঠাণ্ডা মাথায় ঘুমের বড়ি খেয়েছে। কেউ কেউ বলছে, প্রেমফ্রেমের ব্যাপার। আমার খটকা লাগছে। প্রেম করে মরার মতন মেয়ে ও নয়। মেয়েটার যে রকম নেচার তাতে হা-হুতাশ করে বিষ খাবে বলে তো আমার মনে হয় না। অবশ্য আমরা বুঝিও না ভাল। বাবা মেয়ে দেখে বিয়ের দিন ঠিক করে ফেললেন, আমিও টোপর চড়িয়ে তোমার বউদির সামনে গিয়ে হাজির। ব্যাস্ একেবারে সহজ মামলা। তোমরা এ-সব বুঝতে পারবে না। তোমরা বুঝবে প্রে-ম।"

আমি হেসে বললাম, "আপনি দাদা সবই বোঝেন।"

"দূর! আমি প্রেমের কী বুঝি! আমি বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘরসংসার বুঝি। বউয়ের সঙ্গে আমাদের যা হয় তাকে বলে প্রণয়। ওটা ওলড্ ব্যাপার হে ব্রাদার। প্রণয়ে কত রকম কী হয়, রাগ ঝগড়া মান অভিমান। তা সে যাই হোক গো, তাতে আমাদের ভয়ডর নেই। আমরা কনফিডেণ্ট। কিন্তু তোমাদের প্রেমট্রেমে, এই কনফিডেন্সটা আসে না। আসে?"

"জানি না," আমি হেসে জবাব দিলাম।

"আর কবে জানবে হে। সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়..." আশুদা ঠাট্টা করে বলল, বলে হাসতে লাগল। "এই বেলা যা করার করে ফেল।"

লীলা মারা গেছে এই খবরটি আমার কাছে এখন আর অদ্ভুত লাগছিল না। স্বাভাবিক একটা দুঃখ ছাড়া আমি অন্য কিছু অনুভব করছিলাম না। সে প্রেম করেছে, অথবা করে নি তাতে আমার উৎসাহ বোধ করার কথা নয়। বরং এই মুহূর্তে আমার অন্য একজনকে মনে পড়ল। বুলা।

আশুদা বলল, "আমায় তুমি একটু প্রেমট্রেম বুঝিয়ে দিতে পার সুহাস? আজ-কাল শুনি ঘরে-ঘরে প্রেম, আমাদের সময়েও ওটা ছিল না তা নয়, ছিল। তার আগেও ছিল। ওটা আদ্যিকালের ব্যাপার। কিন্তু তোমাদের মর্ডাণ ব্যাপারটা কী? চুল কাটা, দাড়ি কামানো—এই সব জিনিসের মতন নাকি? আমাদের অফিসের একটা ছেলেকে দেখতাম একটু চকচকে মেয়ে হলেই তার পেছনে লেগে থাকত। একটার সঙ্গে শুনি আজ বিয়ে কাল বিয়ে। গুজব রটল। ওমা. শেষে কোথ্ থেকে একটা মেয়েকে বিয়ে করে আনল, তার চেহারা দেখলে তোমার চোখ নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে আসবে। শুনলাম, সে-হারামজাদা ভরি পঁচিশ সোনা আর নগদ চার হাজার টাকা পেয়েছে। আলতু ফালতু আরও কত কী!...তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? সোজা কথা ভাই, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।"—

আশুদার কথায় আমি তেমন কান করছিলাম না। আশুদা এই রকমই। গুরুগম্ভীর করে কথা বলার অভ্যেস তার নেই, হালকা করে মজা করেই

কথা বলে। মাঝে-মাঝে দু চারটে এমন বেয়াড়া প্রশ্নও করে যে আমাদের জবাব দেবার কিছু থাকে না। আশুদার কথাবার্তা থেকে মনে হল, লীলার মতন মেয়েরা প্রেমট্রেম করতে গিয়ে দুঃখ পেয়ে আত্মহত্যা করে এটা মানতে সে রাজী নয়।

আমি চুপচাপই থাকলাম।

আশুদা তার সিগারেটটা শেষ করে ছাইদানে ফেলে দিল।

হঠাৎ কী ভেবে আমি বললাম, "আশুদা?"

আশুদা আমার দিকে তাকাল।

"আমাকে একটা বিয়ের সম্বন্ধ এনেদিন না?"

"বিয়ে? কার বিয়ে? তোমার?"

"না," আমি সামান্য হেসে মাথা নাড়লাম। "আমার নয়।"

"তবে?"

"আছে একজন। আপনি তো বন্ধুবান্ধব, এর-তার নানা ঝঞ্ঝাট কুড়িয়ে বেড়ান। আমায় একটা যোগাড় করে দিন না।"

আমায় নজর করে দেখতে দেখতে আশুদা বলল, "সিরিআসলি বলছ?"

"বাঃ, আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করব নাকি?"

"কার সম্বন্ধ?"

"একটি মেয়ের।"

"শুধু মেয়ে বললে তো হবে না। মেয়ে তো বাঙলা দেশে লাখ-লাখ। ডিটেলস্ বলো।"

আমি অন্যমনস্ক হয়ে থাকলাম, তারপর বললাম, "পরে বলব।...আপনি যে বললেন, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না, তাই মনে হল কথাটা। তা ধরুন মোটামুটি ভাত ছড়ানো যাবে। তবে ভাল ছেলে চাই। ঠিক কাক চাই না।" আমি একটু হাসলাম।

আশুদা একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল সামান্যক্ষণ। তারপর বলল, "তুমি তো আমায় কিংবা বউদিকে কিছু বলো নি ভাই। বললে নিশ্চয় চেষ্টা করতাম। বেশ তো, পরেই বলো। দেখব। ...একটা কথা তোমায় বলি, আমার নিজের কথা। আমাদের সমাজে যে বিয়েটা চলতি রয়েছে এর দোষ-গুণ দুই-ই আছে। যেটা দোষ সেটা হল, আমরা নিজেরাই ছেলেমেয়ে বাছতে ভুল করি। নিজেদের ঘরবাড়ি, বাড়ির অবস্থা, হাবভাব এ-সব ভাল করে না বুঝে একটা বেহিসেবী পছন্দ করে ফেলি। তাতেই যত গণ্ডগোল হয়। নয়ত আমাদের সমাজে বাপ-মার দেওয়া বিয়েতে সত্যি-সত্যি ক'টা ছেলেমেয়ে দুঃখকষ্ট পায় তা একবার ভেবে দেখলে মনে হবে—তার সংখ্যাটা সত্যিই কম। মানুষের স্বভাব হল মন্দটাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলা, আর ভালটাকে না বলা।"

আশুদার সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিসেরই বা তর্ক করব?

আরও খানিকক্ষণ বসে আশুদা চলে গেল।

এটা খুবই আশ্চর্যের কথা, আয়নার বিয়ে সম্পর্কে আশুদাকে আমি কিছু বলি নি। বললে আশুদা হয়ত কোনো ছেলে-টেলের খোঁজ এনে দিতে পারত। সাংসারিক বোধ, বুদ্ধি, দায়িত্ব আশুদার অনেক বেশী। অথচ তাকে আমি কোনোদিন এ-সব কথা বলি নি। বললে ভাল হত। আমাদের বাড়ি ঘরের মোটামুটি পরিচয় তার জানা। একটি ভাল ছেলে হয়ত আশুদা যোগাড় করতে পারত। বাস্তবিকপক্ষে আমি নিজে আমার ছোট বোনের বিয়ের জন্যে হঠাৎ যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম তাও নয়; কী একটা কথায় একদিন যতীনই বিয়ের কথাটা তুলেছিল। নিতান্তই কথা সেটা। সেই কথাই আজ এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। যদি যতীন কাল আমায় এসে বলে তার পিসিমারা রাজী হল না, তখন আশুদাকে আমি আয়নার বিয়ের জন্যে বলতে পারি।

. রাত্রে খাওয়াদাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। এটা-ওটা করে নন্দকিশোর অনেক কিছু খাইয়ে দিয়েছে। দুধটুকু খেয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হল। বাইরে বৃষ্টি একেবারে থেমে যায় নি।

অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে নানারকম ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ আবার বুলার কথা মনে পড়ল। কেন মনে পড়ল তাও জানি না। হয়ত আশুদার সেই প্রেমট্রেম নিয়ে হাসির রগড় করার জন্যে। হয়ত লীলার কথা ভেবেই। এবার বাড়ি গিয়ে একদিন বুলাদের বাড়ি যেতে হয়েছিল। না গিয়ে উপায় ছিল না। বাবলা আমাকে রাস্তার মধ্যে ধরে এমন সব কথা শোনাল যে, আশাকাকিমার বাড়িতে না গেলে খারাপ দেখাত। শুধু যে মুখ বাঁচাতে গিয়েছিলাম তাও নয়, বুলাকেও দেখতে গিয়েছিলাম। বাবার বার্ষিক কাজের দিন বুলা এসেছিল এটা আমার নজরে পড়লেও আমি তাকে নজর না করে থাকার চেষ্টা করেছি। বুলাকে আমি অনেকদিন ধরেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি। তার সঙ্গে আমার যোগা-যোগ আর নেই। বাড়ি গেলেও দেখা-সাক্ষাৎ করতে চাই না, নেহাত চোখে পড়ে গেলে কথাবার্তা বলতে হয়। আগে, অনেক আগে, বুলা আমায় মাঝেমাঝে চিঠি লিখত, আর লেখে না। আমিও লিখি না।

একটা সময় ছিল যখন বুলার চিঠির জন্যে আমি হাঁ করে চেয়ে থাকতাম। আজকাল চিঠি লেখালেখি বন্ধ; আমারও কোনো প্রত্যাশা থাকে না। এবার বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর আমার কয়েকবারই মনে হয়েছে বুলাকে একটা চিঠি লিখি। লেখা হয় নি; শেষ পর্যন্ত ভেবেছি, কী হবে লিখে! অথচ এবার যখন ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, তখন মনে-মনে ঠিক করেছিলাম বুলাকে কয়েকটা কথা বলব। ওর সঙ্গে আমার সাধারণ কথাবার্তা যা হবার হল, আমার নিজের কথাটাই বলা হল না। কলকাতায় ফিরে এসে একটা চিঠি লেখার ইচ্ছে তখন থেকেই। কিন্তু লিখতে আর পারি না।

বুলার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক অনেকদিন ধরেই গড়ে উঠেছিল। আমরা

একই জায়গার ছেলেমেয়ে, বুলার দাদা মুকুল ছিল আমার বন্ধু। গলায়-গলায় বন্ধু। আমি কলকাতায় চলে আসবার আগেই মুকু অ্যাকসিডেণ্টে মারা যায়। মুকু বরাবরই হুজুগে ছেলে ছিল। একবার সে আমাদেরই দু-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় গিয়েছিল বেড়াতে, ফেরার সময় তার সাইকেলের সঙ্গে লরির ধাক্কা লাগল। ঢালুর মুখে হাত-পা ছেড়ে বোঁ-বোঁ করে নেমে আসছিল মুকু, লরির গায়ে ধাক্কা লাগার সঙ্গে-সঙ্গে সে কোথায় যে ছিটকে পড়ল, বোঝা গেল না। শেষে আতাঝোপের আড়াল থেকে তার যে-চেহারা বের করে আনা হল, সেটা আর মুকুর নয়। হাসপাতাল নিয়ে যাওয়াই সার হল। মুকু তার আগেই মারা গেছে। মুকু মারা যাবার পর আমাদের, তার বন্ধু-বান্ধবদের, যে কী অবস্থা হয়েছিল তা বলা যায় না। বিশেষ করে আমার। শ্মশানে আমরা হাউমাউ করে কেঁদেছি, বাড়ি ফিরে এসে তার জন্যে অনবরত চোখ দিয়ে জল পড়ত, রাত্রে লুকিয়ে-লুকিয়ে কাঁদতাম। মুকুকে আমি খুব ভালবাসতাম। মুকু চলে যাবার পর সেই ভালবাসাটা যেন কেমন করে বুলার ওপর গিয়ে পড়ল। বুলাদের বাড়িতেও, মুকুর মা-বাবা—আশাকাকিমারা আমায় মুকুর ফাঁকা জায়গায় বসিয়ে দিলেন।

বুলার সঙ্গে আমার স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্কটা কৈশোরের শেষে যে-ধরনের চেহারা নিল, তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল না। তারপর ধীরে-ধীরে যৌবনের মুখে পড়ে তার ধরন পালটে গেল। আমরা আগের মতন স্বাভাবিক সম্পর্কের বাইরেও একটা সম্পর্ক গড়ে তুললাম। ইচ্ছে করে নয়, জোর করে নয়। কেমন করে যেন সেটা হয়ে গেল। আমরা কোনোদিন মুখ ফুটে পরস্পরকে সেকথা বলিনি। বলার দরকার করত না। কিন্তু দুজনেই বুঝে নিয়েছিলাম, আমরা পরস্পরের কত আপনার। তখন বুলা আমায় কলকাতায় যত চিঠি লিখত, তাতে বার-বার লিখত ঃ 'তুমি খুব সাবধানে থাকবে। কলকাতায় খুব গাড়িঘোড়া। হুঁশিয়ার হয়ে পথ চলবে। আমার বড় ভাবনা হয়।' তার চিঠি পড়ে আমার হাসি পেত। তার দাদা যেভাবে মারা গেছে—তা সে ভুলতে পারত না। ভয়ে মরত। চিঠির খামের মধ্যে সে কতবার আমায় ঠাকুরের ফুল বেলপাতার টুকরো পাঠিয়েছে। পুজোর সময় বাড়ি গেলে সে আমায় আরতির পর প্রদীপের তাপ বুকে ছুঁইয়ে দিত লুকিয়ে। বিজয়ার দিন প্রতিমা বিসর্জনের সময় পুকুর পাড়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত, বরণের তাপ ছুঁইয়ে দিত কপালে, আর ফিসফিস করে বলত : 'তোমার ভাবনাতেই আমি মরি। ঠাকুর তোমায় ভাল রাখুন।' আমার হাসি পেত, ভালও লাগত। ওর বিনুনিতে টান মেরে বলতুম : 'ঠাকুর এখন জলে হাবুডুবু খাচ্ছে তোমার কথা শুনতে পাবে না। নাও, চলো, বাড়ি চলো।'

একবার আমরা চড়ুইভাতি করতে বনে গিয়েছিলাম। জঙ্গলে ঘুরতে-ঘুরতে আমার পায়ে কী যেন একটা পোকা কামড়াল। কাঠ পিঁপড়ে হবে হয়ত। ভীষণ জ্বালা করছিল। আমি নটান গাছতলায় শুয়ে পড়ে বললাম,

'বুলি আমায় সাপে কামড়েছে।' সঙ্গে-সঙ্গে বুলির কী চিৎকার! চারপাশ থেকে আমাদের পিকনিকের লোক ছুটে এল। আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসলাম। বুলি দেখি কাঁদছে। খুব অপ্রস্তুত হয়েছিল বুলা। রেগে গিয়েছিল খুব। পরে আমি বলেছিলাম, 'বুলি, আমি মরে গেলে তুমি কী করতে? সাবিত্রী হতে নাকি?' বুলি রাগ করে বলেছিল, 'হ্যাঁ হতাম। যাও!'

আমাদের ভালবাসার সম্পর্কটা এমন করে গড়ে উঠেছিল, যার মধ্যে তীব্রতা ছিল না, মাদকতা ছিল না। সাধারণ একটা ফুলের গন্ধর মতন একেবারে সাধারণভাবেই ফুটে উঠে তার গন্ধ বাতাসে মিশেছিল। আমি বুলাকে নিয়ে চালচিত্র আঁকতে পারতাম না। সে আমার মধ্যে মিশে থাকত।

এইরকমই ছিল। তারপর একদিন আমার মনে হল, বুলাকে আমি এভাবে টেনে নিয়ে যেতে পারি না। সে আমার ওপর নির্ভর করে থাকবে, অথচ আমি তো তাকে আমাদের সংসারে আনতে পারব না। জ্যাঠামশাই, দিদি—এরা যে পছন্দ করবে না তা নয়। দিদি বুলাকে খুব ভালবাসে। জ্যাঠামশাইয়েরও বুলাদের পরিবারের ওপর মায়ামমতা আছে। বুলার বাবা মারা যাবার পর জ্যাঠামশাই ওদের আপদ-বিপদ যথেষ্ট দেখেছেন। ওদের অবস্থা একেবারে পড়ে গেছে এটাও কেউ গ্রাহ্য করবে না। তবু, আমি আমাদের বাড়িতে বুলিকে আনতে পারব না।

আমি পারব না, আমার পক্ষে সেটা উচিত হবে না—এই ধারণা আমার মাথায় ঢোকার পর আমি আর সেটা তাড়াতে পারলাম না। কী যে হল, ভাবনাটা আমার মাথায় আস্তে-আস্তে শেকড় ছড়িয়ে বাড়তে লাগল। আমি বুলার কাছ থেকে সরে আসার চেষ্টা করতে লাগলাম। সরে আসাটা খুব কষ্টের। আমার কষ্ট হত খুব। তবু আমি প্রাণপণে সরে আসতে চেষ্টা করলাম।

আজ আমি অনেকটা সরে এসেছি। প্রায় সবটাই। কিন্তু বুলাকে আমি বলতে পারলাম না, কেন এ-রকম করলাম।

এবার বাড়ি গিয়ে ভেবেছিলাম, বুলাকে সব কথা বুঝিয়ে বলব। বলা হল না।

মাঝে-মাঝে মনে হয়, বুলাকে একটা চিঠি লিখি। সে হয়ত ভাবে, আমি কলকাতায় থাকতে-থাকতে তাকে ভুলে এই শহরের কোনো মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছি। শহরের চটক, শহরের ছিমছামপনা, শিক্ষাদীক্ষা আমার চোখ ভুলিয়েছে। তা নয়। এই শহরে দু-চারটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকলেও ভালবাসার সম্পর্ক কোথাও গড়ে ওঠে নি। আমি কোনো মেয়েকে ভালবাসি নি।

তা হলে এমন কেন হল?

কেন হল তা স্পষ্ট করে কেমনভাবে বোঝাব? সত্যি বলতে কী, আমি আমার দিদির চোখের সামনে নিজের সুখ-আনন্দ নিয়ে নিজস্ব করে কিছু গড়ে তুলতে চাই না। আমার দিদির জন্যে কোথাও কিছু রাখা নেই। বাবা তাকে তেপান্তরের মাঠের মধ্যে একা ফেলে রেখে গেছে। জ্যাঠামশাইয়ের জীবন

শেষ হয়ে এল। আয়নার কোথাও না কোথাও কিছু একটা হয়ে যাবে। দিদি একেবারে একা। সে বেচারী কোন পাপে এই যক্ষের ধন—আমাদের বাড়ির ইটকাঠ, তার দু-পুরুষের জমা ধুলো নিয়ে পড়ে থাকবে? তার যদি কোন সঙ্গী না থাকে, তবে আমারও না হয় না থাকল। জীবনের শেষ-বেলায় আমরা দু-জনে দু-জনের মুখের দিকে তাকিয়ে যে সান্ত্বনা পাব সে-সান্ত্বনা তো কম নয়!

দিদির জন্যে আমায় এই রকমই থাকতে হবে। তার দুঃখের সঙ্গী হয়ে।

জ্যাঠামশাই

আশ্রমের রাস্তায় শচির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অনেকটা তফাত থেকে বুঝতে পারি নি সে কার সঙ্গে কথা বলছিল। খানিকটা এগিয়ে আসতে দেখি, শচি আমার দিকে আসছে, অন্য লোকটি তেঁতুলতলার পাশ দিয়ে চাঁদবাবুদের কুঠির দিকে বেঁকে গেল।

শচি এগিয়ে আমার কাছাকাছি এসে বলল, “আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন জ্যাঠামশাই? আমি যাচ্ছিলাম।”

আমি বললাম, “তোমায় আর যেতে হবে না; আমিই যাচ্ছি। চলো।” বলে আমি শচির হাতের কাছটা ধরে আশ্রমের দিকে পা বাড়ালাম।

শচি বলল, “আপনি আমার খোঁজ করতে আসছিলেন?”

“হ্যাঁ, তোমার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। কোথায় বেরিয়েছিলে সকালে?”

আমি শচির বাড়ি পর্যন্ত এসেছি শুনে বেচারী কুণ্ঠিত হয়ে বলল, “আমি তো যাচ্ছিলাম, আপনি আবার কেন কষ্ট করে এলেন?”

হাঁটতে-হাঁটতে আমি বললাম, “আজ পাঁচ-সাত দিন এদিকে আসা হয়ে ওঠে নি। আশ্রমে তো আমি মাঝে-মাঝেই আসি, শচি। ভাবলাম যাই, নিজেই যাই, বেড়িয়ে আসাও হবে।...ক’টা দিন কেমন গুমোট চলছে দেখেছ? আজ দু-দিন না কাঠফাটা রোদ, না তেমন মেঘলা। সব ঘোলাটে হয়ে রয়েছে। বড় কষ্ট গেছে এ ক’টা দিন।”

“আজ খানিকটা বাতাস দিচ্ছে।”

“বর্ষার আগে-আগে এখানে দেখেছি এই রকম হয়।...দু-চার দিনের মধ্যেই বর্ষা নামবে।”

শচি বলল, “কুসুনডিয়া থেকে দত্তবাবু এসেছিলেন কাল; বললেন—ওদিকে পরশু দিন খুব বৃষ্টি হয়েছে।”

“কোথায় গিয়েছিলে তুমি সকালে? সময়টা ভাল নয়, তোমার শরীরও ভাল যাচ্ছে না, টোটো করে ঘুরে বেড়াও কেন?”

শচি আমার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কী মনে করে আর বলল না। আমি তার হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম। সে পাশাপাশি হাঁটছিল। আশ্রমের এই রাস্তাটি নিরিবিলি, বাড়ি ঘর খুবই কম, গাছগাছালি ঘন হয়ে আছে অনেকটা পথ। বিকেলের রোদ নেই, আলোও কমে এসেছে।

“কোথায় গিয়েছিলে শচি?” আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

"ঠাকুর সিংয়ের কাছে।...আমাদের সেই শাল জঙ্গলটা—" শচি চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল।

বিঘে কয়েক শালের জঙ্গল পড়ে আছে শচিদের। এক সময় তাদের নিজেদেরই মস্ত কাঠের কারবার ছিল; জঙ্গল ছিল, ইজারা ছিল। এখন কিছুই আর নেই। বাকি যে বিঘে কয়েক জঙ্গল ছিল তা ঠাকুর সিংয়ের কাছে ইজারা দেওয়া। ঠাকুর সিং মানুষটি ভাল, শচিদের কাঠের কারবারের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। শচি বোধ হয় বাকি জঙ্গলটুকু বেচে দেবার কথা বলতে গিয়েছিল।

"কী বলল ঠাকুর সিং?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

শচি বলল, "আমায় কিছু টাকা দিল। বলল, তুম তো বিলকুল সব্ ফেংক্ দিয়া বেটা, থোড়া কুছ্ রাখ দেও।" বলে শচি একটু থামল, আবার বলল, "ঠাকুর সিং খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছে জ্যাঠামশাই, একটা পা একেবারেই পড়ে গেছে। বাইরে বেরুতে পারে না বছব খানেক। অনেক কথাবার্তা বলছিল। আপনাদের কথা জিজ্ঞেস করছিল। ওর খুব ইচ্ছে আপনাদের সঙ্গে একবার দেখা সাক্ষাৎ করে। বুড়ো হয়ে গেছে, কোথাও যেতে পারে না। কথা বলতে বলতে কাঁদে।"

পথ চলতে-চলতে আমি বললাম, "আমিও তো বুড়ো শচি। বুড়োরাই বুড়োদের জন্যে কাঁদে। যাব একদিন ওকে দেখতে। অনেকটা দূর বলে যেতে পারি না। বর্ষাটা পড়ুক, একদিন যাব।"

আশ্রমের কাছাকাছি পেঁাছে মনে হল, শচিকে নিয়ে আশ্রমের মধ্যেই কোথাও বসি।

"শচি?"

"আজ্ঞে?"

"তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে। চলো, আশ্রমে গিয়ে বসি একটু।"

"বাড়িতে যাবেন না?"

"আশ্রমেই চলো। আমাদের স্বামী অমৃতানন্দজী ওই ছোট্ট পুকুরটির পশ্চিম দিকের পাড়টি বাঁধিয়ে বেশ করেছেন, বাগানের পাশে ঘাটটি বড় চমৎকার লাগে।"

শচি আপত্তি করল না।

আশ্রমটি এখন ফাঁকাই প্রায়। মন্দিরের দিকে দু-একজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোট স্বামীজীকে দেখলাম তাঁদের ঘরের দিকে ঘোরাফেরা করছেন। কাঁকরের রাস্তাটুকু পেরিয়ে আমি শচিকে নিয়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলাম।

এই আশ্রমটা আরও ভাল হতে পারত। দশ বারো বছর ধরে কোনো কাজ হয় নি। পূর্ণানন্দজী আশ্রমটি শুরু করেন, তাঁর অনেক সাধ ছিল, প্রাণ ঢেলে পরিশ্রমও করেছিলেন। হঠাৎ তিনি দেহরক্ষা করেন। তারপর যিনি ভার নিলেন—তিনি একেবারেই অপদার্থ। নিজের ঘরটুকু সাজিয়ে, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে আরাম

করে, আরও নানা রকম দুষ্টিকটু কাজ করে আশ্রমের দুর্নাম করলেন, আশ্রমই বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হল। তাঁকে সরিয়ে দিয়ে অমৃতানন্দজীকে পাঠানো হল। অমৃতানন্দজী কাজের মানুষ, বিচক্ষণ, উদ্যোগী। তাঁর হাতে পড়ে আশ্রমটি আবার সুন্দর হয়ে উঠেছে। মাথায় নানা রকম চিন্তা ঘুরছে স্বামীজীর। দু-একটা বড় কাজে হাত দেবার ইচ্ছে; আশ্রমের এলাকাও তাই খানিকটা বাড়িয়ে নিতে হয়েছে তাঁকে।

বাঁধানো ঘাটে এসে শচিকে নিয়ে বসলাম। কয়েক ধাপ মাত্র সিঁড়ি। পুকুরের অন্য তিনটে পাশ কাঁচা। কাঠের গুঁড়ি পুঁতে কাঁচা পাড়ও মজবুত করা হয়েছে। গরমে পুকুরের জল শুকিয়ে তলায় নেমে গেছে। তবু পরিষ্কার। চার দিকে গাছপালা, আম নিম কদম; ডান দিকে বেড়া দিয়ে ফুলের বাগান তৈরি হয়েছে। জায়গাটি বড় মনোরম।

আকাশে গোধূলি ফুরিয়ে আসছিল। আজ বোধ হয় ত্রয়োদশী। শুক্লপক্ষ।

পথশ্রম কাটিয়ে নিতে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। শচিও নীরব। বাতাস ছিল আজ।

শেষে আমি বললাম, "শচি, তুমি সুহাসের চিঠি পেয়েছ?"

শচি আমার দিকে তাকাল। তার মুখ চোখ বলছিল সে যেন খানিকটা অবাক হয়েছে। বলল, "নতুন চিঠি তো কিছু পাই নি।"

"আগে পেয়েছ?"

"হ্যাঁ। কেন জ্যাঠামশাই?"

"তুমি ওকে কিছু কাগজপত্র দিয়েছিলে?"

"কাগজপত্র মানে আমার অসুখের—। ডাক্তারদের ওই সব কাগজ..."

"সুহাস তোমায় কিছু লেখে নি?"

"লিখেছিল। তবে ও খুব ব্যস্ত; কাগজপত্র ভাল জায়গায় দেখাতে পারছে না।"

আমি শচির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম কয়েক পলক। "তুমি একবার কলকাতা যাও না।"

"কলকাতা?"

"কলকাতায় না গিয়ে কি এসব হয়? ওই ডাক্তারী কাগজপত্র দেখে কেউ কি ঠিক করে কিছু বলতে পারে! নিজের চোখে রোগীকে দেখতে হয়। দেখো শচি, পরের মুখে ঝাল খেয়ে ডাক্তারী হয় না।"

শচি কেমন দুর্বলভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। আমার মনে হল, সে যেন বুঝতে পারছে না কথাটা। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বলল, "সুহাস তো আমায় লেখে নি।"

"তোমায় লেখে নি কেন তা তো জানি না", আমি বললাম। এই বয়সে শচির সঙ্গে এমন করে কথা বলতে আমার দুঃখ হচ্ছিল। সুহাস তাকে কিছু লেখে নি; কেন লেখে নি—তা আমি জানি। শচিকে ভয় পাইয়ে দেবার মতন

কিছু আমি বলতে চাই না। আবার আমি চাই না, সে আর অবহেলা করে। "সুহাসকে তো তুমি জানো শচি, ওর ঘর সংসারের কথাবার্তায় গরজটা কম। কিছু বোঝে না। ওর উচিত ছিল, যাবার সময় তোমায় সঙ্গে করে কলকাতা নিয়ে যাওয়া। একবার ঘুরে আসতে। এমন একটা দূর জায়গা কলকাতা নয়।"

শচি কী যেন ভাবল। চুপ করে থাকল খানিকক্ষণ, তারপর বলল, "সুহাস কি আপনাকে তাই লিখেছে, জ্যাঠামশাই?"

আমি শচির দিকে একটিবার তাকিয়ে পুকুরের চার পাশের গাছপালা দেখতে লাগলাম। সন্ধ্যে হয়ে এল। "আমায় ঠিক লেখে নি। আমি শুনলাম। ওই যে ছেলেটি—সুহাসের বন্ধু—অবিন, অবিন আমায় একটা চিঠি দিয়েছে। তাতে লিখেছে সুহাসের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল, তোমার কী অসুখবিসুখের কথা জিজ্ঞেস করতে বলেছিলে—" কথাটা আমার আর শেষ হল না।

শচি মাথা হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ, অবিনবাবুকে আমি বলেছিলাম। উনি আপনাকে চিঠি লিখেছেন?"

"অবিনই লিখেছে। তোমার অসুখ নিয়ে ঠিক লেখে নি। কথায়-কথায় লিখেছে। আমার নিজেরই মনে হল, তোমার নিজেরই যখন অত চিন্তা, মনের মধ্যে খুঁতখুঁতি তখন একবার দেখিয়ে এলেই পার।...শচি, আমিও যে হাফ-ডাক্তার, হোমিওপ্যাথী..." বলে আমি হালকা করে হাসলাম, যেন শচির মনে কোনো সন্দেহ না হয়।

শচি অনেকক্ষণ আর কথা বলল না। আমিও চুপ করে থাকলাম।

"এখানে আমার কিছু কাজকর্ম ছিল—" শচি বলল।

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। "তোমার যা কাজ তা খুব জরুরী নয়। তা ছাড়া তুমি এবার পুজো পর্যন্ত এখানে থাকছ। এখন একবার কলকাতা ঘুরে আসতে পার।"

শচির আগ্রহ দেখছিলাম না। চুপ করে বসে থাকল।

"অত ভাবছ কী?"

"না। আচ্ছা দেখি—"

"দেখার কিছু নেই। তুমি চলে যাও। আমি যদি আগে জানতাম তুমি সুহাসকে কাগজপত্র দিচ্ছ, আমি তোমায় তখনই ওর সঙ্গে কলকাতা চলে যেতে বলতাম। এত দিনে ঘুরে আসতে।"

শচি কেমন দুঃখের মুখ করে হাসল, তারপর আচমকা বলল, "ঘুরে আসতাম না, জ্যাঠামশাই।"

আমার গায়ের মধ্যে কেমন করে উঠল, বুকের মধ্যেও শচির বলার ধরনটি মনের মধ্যে বড় লাগে। বললাম, "ঘুরে আসতে না? কেন?"

কথা বলল না শচি, বাঁধানো ঘাটের সিমেণ্টে হাত বোলাতে লাগল মাথা নীচু করে। ও আমার কথায় কিছু সন্দেহ করেছে, না মনে মনে ও জেনে বসে আছে সব—তাও আমি বুঝতে পারছিলাম না।

মাথার ওপর দিয়ে সন্ধ্যেটা নেমে এল। এই অন্ধকারের ভাবটুকু অল্প-ক্ষণের, শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠে যাবে। মন্দিরের দিক থেকে শান্ত করে ঘণ্টার শব্দ ভেসে এল।

"শচি ?"

"জ্যাঠামশাই—!"

"তুমি ওকথা বললে কেন ?"

"আমার তাই মনে হয়।"

"তোমার মনে হওয়াটা ঠিক নয়। হবেই বা কেন? তোমার কী অসুখ তুমি জান না। যদি জানতেও তবু তোমার মনে হওয়াটা ভুল হত। তুমি ডাক্তার নয়।"

শচি তার মাথার ছোট ছোট চুলের ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে আস্তে করে বলল, "আমি আমার অসুখটা জানি না জ্যাঠামশাই। তবে এবারে হাসপাতালে পড়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছে, আর বেশী দিন আমার নেই।"

ছেলেটার মুখ দেখলে আমার বুক দুঃখে ভরে যাচ্ছিল। ওর মনের কথাটা আমার অজানা নয়। মনে মনে ও ভেবে নিয়েছে, দিন ওর ফুরিয়ে এসেছে। এটা একরকম বিশ্বাসও হয়ে গিয়েছে ওর। এখানে যেটুকু যা রয়েছে, বেচেবর্তে দেবার চেষ্টা করছে। টাকাটা কোথাও দিয়েথুয়ে সেখানেই বাকি দিনগুলো কাটাতে চায়। আমার যে এটা পছন্দ তা নয়। বারণ করেছি। কিন্তু যখন বারণ করেছিলাম তখন আমি জানতাম না তার অসুখটা এমন ভয়ঙ্কর ধরনের হতে পারে। অবিনের চিঠি পেয়ে জানলাম, ভয়টা কোথায়। আজ আমার নিজেরই মনে জোর নেই, ওকে কী করে সাহস জোগাব।

"তুমি শচি—" আমি বললাম, "যা ভাবছ তা ঠিক নয়। তুমি ভাবলেই তোমার দিন ফুরিয়ে যাবে না। আবার না ভাবলেও তোমার দিন পিছিয়ে যাবে না। ওটা ভাগ্য।"

"ভাগ্যের আর কতটা জোর থাকবে জ্যাঠামশাই ?"

"কেন ?"

"আমার ভাগ্য নেহাত দয়া করে এতটা টেনে এনেছে। আর কত জোর থাকবে!"

"থাকবে; আরও থাকবে।...দেখো শচি, সংসারে এসে শুধু মন্দর হিসেব করতে নেই। আমরা সাধারণ মানুষ, হিসেবটা না করে পারি না, তা ঠিক। তবে তাতে মন ভাঙে তিল-তিল করে শুধু দুঃখটাই জমা হয়। দুঃখ কার নেই, পশুপাখিরও আছে। আমাদের কারও কম, কারও বেশী দুঃখ। তোমার বেলায় ভগবান অবুঝ হবেন এমন মনে করছ কেন? ওসব ভাবনা না ভেবে তুমি যা উচিত তাই করো। কলকাতায় যাও। একবার ডাক্তার দেখিয়ে ফিরে এস, তোমার মনে জোর পাবে। তা ছাড়া, তুমি যদি অতই নিশ্চিন্ত হতে, তবে কাগজপত্র সুহাসের হাতে গুঁজে দিতে না। দিয়ে ভালই করেছ অবশ্য। আরও

ভাল করতে যদি কলকাতায় চলে যেতে।”

শচি নিরুত্তর থাকল।

বসে থাকতে-থাকতে দেখি সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গাছের অন্ধকারে একটা টিয়া ডাকল। রেল স্টেশনের দিক থেকে ঝড়ের বেগে মালগাড়ি চলে যাবার শব্দ আসছিল।

“আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। উঠবেন?” শচি জিজ্ঞেস করল।

“আর একটু বসি। এখুনি জ্যোৎস্না উঠবে। রাস্তা হাঁটতে আমার অসুবিধে হবে না।”

“আশ্রমের ভেতরে যাবেন?”

“না-না। আজ থাক।”

আমরা চুপচাপ বসে থাকলাম। মন্দিরে সন্ধ্যেপুজো শেষ হল। ঘণ্টা থেমে গিয়েছে। খুব নিস্তব্ধ হয়ে এল চারপাশ।

“জ্যাঠামশাই?”

“বলো বাবা!”

“আয়নার বিয়ের কতটা হল? মানুর কাছে শুনছিলাম—”

“সম্বন্ধটা বোধ হয় ভেঙে গেল।”

“ভেঙে গেল?” শচি অবাক হয়ে বলল।

“আজ সুহাসের কাছ থেকে যে রকম চিঠি পেলাম, তাতে মনে হচ্ছে ওদিকটা আর এগুবে না।”

শচি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে থাকতে জিবের শব্দ করল। “আমি যা শুনেছিলাম তাতে সম্বন্ধটা ভাল ছিল।”

“আমিও ভেবেছিলাম হয়ে যাবে—।” আমি নিশ্বাস ফেললাম, শচিও নিশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকাল।

আরও খানিকটা বসে আমরা উঠলাম।

আশ্রমের বাইরে এসে দেখি জ্যোৎস্না নেমে গেছে।

“শচি?”

“আজ্ঞে?”

“তুমি যখন কলকাতায় যাবে, তোমার সঙ্গে ওকে পাঠিয়ে দেব। দিন কতক থেকে আসুক তার দাদার কাছে। এই জায়গাটা বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে ওর। শরীরটাও দেখছি শুকিয়ে যাচ্ছে, রোজই প্রায় মাথা ধরা নিয়ে শুয়ে থাকে সন্ধ্যে বেলায়।”

পাশাপাশি রাস্তা হাঁটছিলাম আমরা। হাঁটতে-হাঁটতে শচি বলল, “আপনি আমার জন্যে মিথ্যে দুর্ভাবনা করছেন। কলকাতায় গিয়ে আমার কোনো লাভ হবে না।”

“লাভ লোকসানের হিসেবটা তুমি না হয় না করলে। ধরো লোকসানই হল। তা হলেও তো আপসোসের কিছু থাকবে না। ভাগ্য আমরা পাল্টাতে

পারি না শচি, কিন্তু ভাগ্য কী তাও তো আমরা জানি না।"

শচি কোনো জবাব দিল না, নীচু মুখে হাঁটতে লাগল।

শিমুল গাছটা পেরিয়ে আসতেই চাঁদের আলোয় পথ ফুটে উঠল। গরুর গলার একটা মালা পড়ে আছে একপাশে। বনতুলসীর গন্ধ উঠছিল।

"দেখো শচি, আমার কী হবে শুধু এই ভাবনা ভেবে সংসারে আমি বেঁচে থাকতে পারি না। তুমি তোমার কথাটা না হয় ভুলে যাবার চেষ্টা করো। আমরাও তো তোমার আত্মীয়ের মতন। তোমার জন্যে আমাদেরও দুর্ভাবনা থাকে। আমি বলছি, তুমি অত হতাশ হয়ো না, মুষড়ে পড়ো না। কলকাতায় যাও। সুহাস রয়েছে, অবিন আছে। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। মনের মধ্যে একটা ভয় পুষে রাখার চেয়ে, সাহস করে ভাগ্যের মুখোমুখিই না হয় দাঁড়ালে। তাতে তো কোনো ক্ষতি নেই। তুমি বুদ্ধিমান।"

শচি আমার কথা কান দিয়ে শুনছিল কিনা বুঝতে পারছিলাম না। সাড়া-শব্দ দিচ্ছিল না।

যেতে-যেতে শেষে আমি বললাম, "তুমি দু-একটা দিন ভেবে দেখো। তোমার যদি ভয় করে আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

"আপনি?"

"কেন?"

"আপনাকে তো আমি কোনোদিন এখান থেকে যেতে দেখি নি।"

"আমি কি চিরটা কাল এখানে থাকব, শচি? সকলেই গেছে, আমিও যাবার জন্যে বসে আছি। তার আগে তোমার সঙ্গে ঘুরে আসি। মানুষ তো বুড়ো বয়সে তীর্থও করতে যায়। ছেলেমেয়েদের দুঃখ-বিপদের দিনে তার পাশে-পাশে থাকাটাও তো বড় কথা।"

শচি কেমন যেন আশ্চর্য চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

বাড়ির ফটকের সামনে মানু দাঁড়িয়ে ছিল। আমি কাছাকাছি এলে সে নিজেই ফটক খুলে দিল। শচি আমার সঙ্গে আধাআধি পথ এসে ফিরে গেছে, আসতে সে চেয়েছিল, আমি আর টেনে আনি নি বাড়ি পর্যন্ত।

মানু বলল, "কোথায় গিয়েছিলে?"

আমি বললাম, "শচির কাছে।"

মানু আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকল। তারপর অন্যমনস্কভাবে ফটকটা আস্তে-আস্তে বন্ধ করছিল। আমি হাত দিয়ে ঠেলে ফটকটা পুরোপুরি বন্ধ করে আঙটাটা লাগিয়ে দিলাম।

শচির কথা মানুকে কিছু বলি নি। একবার ভেবেছিলাম, বলব। মানুর পরামর্শ নেব। পরে আর বলি নি। খানিকটা সাবধান হওয়া ভাল। শচি এ-বাড়িতে মাঝে-মাঝেই বেড়াতে আসে। বেড়াতে এলে মানুর সঙ্গে তার গল্প-সল্প হয় বেশী। মানুর সঙ্গে শচির যেরকম সম্পর্ক তাতে মানু মুখ ফসকে সবই বলে ফেলতে পারে। ভেবে-ভেবে আমার মনে হয়েছিল, মানুর মুখ থেকে কোনোরকমে যদি এমন কিছু শুনতে পায় শচি যাতে তার সন্দেহ হয় তবে সেটা ভাল হবে না। মানু বুদ্ধিমতী, খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে, তবু বিপদে-আপদে মানুষের বুদ্ধি ঠিক থাকে না। আমার মতন বুড়ো মানুষেরই দেখছি থাকছে না। শচিকে আমি যতই বুঝোই যে তার ভয় পাবার কিছু নেই, তবু সে কি আর কোথাও একটু সন্দেহ করে নি!

মানু বলল, "সকালে তুমি শচিদার খোঁজে লোক পাঠালে; বিকেলে আবার নিজে ছুটলে—" বলে মানু সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম, "শচিকে একটু দরকার ছিল।"

বাগান দিয়ে আমি হাঁটছি, মানুও আমার পাশে হাঁটছে। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদে যেন পূর্ণিমা দেখা দিয়েছে, বাগানভরা জ্যোৎস্না।

মানু ডাকল, "জ্যাঠামশাই?"

আমি মানুর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম।

"তুমি শচিদাকে কলকাতায় পাঠাতে চাইছ?"

মানুর কথা শুনে আমি অবাক। আমি তো তাকে কিছু বলি নি; তবে সে কেমন করে জানল?

"তুই জানিস?"

মাথা সামান্য নুইয়ে মানু বলল, "সে জানে।"

"কে তোকে জানাল? সুহাস?"

মানু কিছু বলল না। যেন সে কেমন করে জানল এটা কোনো বড় রকমের কথাই নয়। আমি ভেবে পেলাম না খবরটা তাকে কে জানাল? সুহাস আমাকেই কিছু জানায় নি। কেন জানায় নি তা বুঝতে পারি। অবিনের চিঠিতেই সেটা লেখা আছে। সুহাস কি মানুকে জানিয়ে রেখেছে, পাছে তার জ্যাঠামশাই ব্যস্ত-ব্যাকুল হয়ে কী না কী করে বসে!

নুড়ি পাথরের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মানু বলল, "কী বলল শচিদা?"

শচি যে কী বলল আমি নিজেই স্পষ্ট করে বুঝি নি। সে শেষাবধি রাজী হয়েছে বলেই আমি ধরে নিয়েছি। কাল শচি আসবে বলেছে। আমি বললাম, "বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললাম তো, দেখি কী করে। যাবে হয়ত।"

"বলল না?"

"তেমন করে বলল না। তবে নিমরাজী মনে হল।"

মানু বাগানের গাছপালার পাশ দিয়ে সিমেণ্ট বাঁধানো ছোট বেদিটার কাছে কাছে এসে দাঁড়াল। আমি খেয়াল করি নি আমরা পথ ছেড়ে বাগানে এসে

দাঁড়িয়েছি।

"আমি তো বুঝিয়ে বললাম, তুমি কলকাতায় গিয়ে একবার দেখিয়ে এস। মনে-মনে একটা দুশ্চিন্তা রেখে লাভ কী? তাতে আরও ক্ষতি হবে। কলকাতায় গিয়ে থাকতে কোনো অসুবিধা নেই, সুহাস রয়েছে; সেই সব ব্যবস্থা করবে। আমিই না হয় সঙ্গে যাব।"

"তুমি?" মানু আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল।

"আমিও যাব বললাম। কী হয়েছে আর যেতে? ওর যদি মনে ভয়টয় থাকে আমি সঙ্গে থাকলে সাহস পাবে।"

মানু অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলল না, তারপর আস্তে করে বলল, "এই বয়েসে তুমি ছুটোছুটি করে কী করবে! শচিদা কলকাতায় গেলে তাকে দেখার লোকের অভাব হবে না।"

দেখার লোকের অভাব শচির হবে না জানি। সুহাস আছে, অবিন আছে। কিন্তু দেখার লোকটাই বড় কথা নয়, সহায়ের মানুষটি তার চাই। এই সহায় তার কে হবে?

আমি বললাম, "না রে, আমায় ছুটোছুটি করতে হবে না। শচি যদি আমায় তার সঙ্গে পেলে ভরসা পায় আমি যাব। আর ও যদি একাই যেতে রাজী হয়ে যায় তবে অন্য কথা।"

মানু অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে শেষে বলল, "শচিদাকে তুমি যতটা ভাবছ ততটা নয়। সে যদি যেতে রাজী হয় একাই যেতে পারবে।"

মানু আমায় কী যে বোঝাতে চাইল আমি বুঝতে পারলাম না। সন্ধ্যে পেরিয়ে যাচ্ছিল। আমার পুজোর ঘরে যাবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। মানু এখন হয়ত বাগানে বেড়িয়ে বেড়াবে, খানিক বসবে। আমি আর না দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

বারান্দায় উঠে আসতেই আয়নার কুকুরটা ডাক ছেড়ে ঘরের দিকে ছুটল। তাকিয়ে দেখি রেলিং ঘেঁষে আয়না দাঁড়িয়ে। ওকে দেখলে আজকাল আমার মনে হয়, আনুটাই আমার বুকের কাছে ভার হয়ে বসে আছে। কী যে করি মেয়েটাকে নিয়ে বুঝতে পারি না। মনে মনে বড় আশা করেছিলাম, খোকা যে-বিয়ের সম্বন্ধটা ঠিক করছে সেটা ঠিক হয়ে যাবে; হয়ে গেলে আমিও নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। বরাত মন্দ, এমন ভাল সম্বন্ধও ভেঙে যেতে বসেছে। শচিকে মাঝ-রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে একা-একা আসবার সময় আমার একটা কথা মনে হয়েছে। শচিকে নিয়ে আমি যদি কলকাতায় যাই তবে একদিন সুহাসকে সঙ্গে নিয়ে সেই ছেলেটির বাড়িতে যাব। নিজে গিয়ে দেখা করে কথাবার্তা বললে ছেলেদের বাড়িতে গুরুজনদের মত পালটাতেও পারে। সুহাস ছেলে-মানুষ, সাংসারিক বোধবুদ্ধি তার কম। তার বলা-কওয়া হয়ত ওদের মনে ধরে নি।

আনুকে ডাকলাম। প্রথম ডাকে সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। আবার ডাকতে

আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

"আজও তোর মাথা ধরে আছে?"

মাথা নাড়ল আনু। না, ধরে নি।

"বাইরে বাগানে গিয়ে খানিক বেড়িয়ে বেড়া। ভাল লাগবে।...তুই আজকাল বাড়ির মধ্যে বসে থাকিস কেন?"

আনু চুপচাপ। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, আনু এখন বাড়ির মধ্যেই চুপচাপ কাটায়। তার বন্ধু বিনু এক-আধদিন বাইরে নিয়ে গেলেও বোধহয় বেশী দূর টেনে নিয়ে যেতে পারে না। কাছাকাছি গিয়ে সে ফিরে আসে। আনুর স্বভাব এভাবে রাতারাতি পালটে যাবার কথা নয়। মেয়েটার শরীর স্বাস্থ্য হয়ত ভেতরে-ভেতরে খারাপ যাচ্ছে, খানিকটা একঘেয়েমিও লাগে বোধ হয়।

"আনু?"

"উঁ?"

"কলকাতায় যাবি?"

কলকাতার কথায় আনু মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল।

"যাবি নাকি?"

"যাব।"

আনুর মুখটি দু-মুহূর্ত নজর করে দেখলাম। নিতান্ত ঝোঁকের মাথায় যেন বলল।

"আচ্ছা দেখি; তোকে দিন কয়েক কলকাতা ঘুরিয়ে আনা যায় কিনা!" বলে আনুকে আমি ছেলেমানুষের মতন একটু লোভ দেখালাম। তারপর চলে যেতে গিয়ে বললাম, "অনেকদিন তুই আর বাজনাটা নিয়ে বসিস না। যা না, আজ একটু বোস। আমি পুজোর ঘর সেরে আসব।"

আয়না দাঁড়িয়ে থাকল!

ঘরে এসে কাপড়জামা ছেড়ে কলঘরে ঢুকতেই মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। পাশে জানলা ছিল, কোনোরকমে সামলে নিলাম। কিছুক্ষণ কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। অস্বস্তি সমস্ত শরীরেই। সামান্য ঘাম হল কপালে। মাস খানেক আগে আরও একবার এই রকম হয়েছিল। হজমের গোলমাল, গরম, বুড়ো বয়সের দুর্বলতা—নানা কারণেই এমন হতে পারে। আজ যে কেন হল আমি বুঝতে পারলাম না। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার জন্যে হতে পারে। কাল সারারাত ঘুম হয় নি ভাল। শারীরিক ক্লান্তির জন্যেও হয়েছে হয়ত।

ভাল করে হাতমুখ ধুয়ে গা মুছে ঘরে এসে আমার পুজোর কাপড়টি পরে ঠাকুর ঘরে গেলাম।

এই ঠাকুর ঘরটি আমার মার। আমার বাবা নিজে ঠাকুর দেবতায় খুব একটা নিষ্ঠাবান ছিলেন না। শেষ বয়সে নেহাতই যেন নিতে হয় বলে মন্ত্র নিয়েছিলেন; তাঁর গরজ তেমন কিছু আমি দেখি নি। আমার মা ছিলেন ধর্মপ্রাণা। মার জন্যেই এই ঠাকুরঘর। ঘরটা লম্বা চওড়ায় অনেকটা, পাথর

বসানো মেঝে, দেওয়ালে তাক, জানলাগুলো বড়-বড় খড়খড়ি আর কাচের শার্সি দেওয়া। ঠাকুর দেবতার মূর্তি, পট, পুজোর সামগ্রীর অভাব নেই। মা নিজের হাতে এসব সাজিয়ে ছিল। সকাল বিকেল এই ঘরে সময় কাটাত অনেকক্ষণ। মা মারা যাবার পর ঠাকুর ঘরের সেই ঝকঝকে ভাবটা মরে গেছে। ঠাকুরদেবতায় ধুলো জমেছে পুরু হয়ে, নাড়া-চাড়ায় কিছু ভেঙেচুরে গেছে, পটগুলোর রঙ ময়লা হয়ে গিয়েছে। পুজোর জিনিসপত্র রাখা আছে একটা কাঠের সিন্দুকে। মা মারা যাবার পর আমাদের পরিবারের এই ঘরে তেমন যত্নের হাত আর পড়েনি। মণি—আমার স্ত্রী—এ-বাড়ির বড়বউ উদাস প্রকৃতির ছিল। ঠাকুরঘরে তার আসা-যাওয়া থাকলেও সে ওই নিয়ে সারাদিন পড়ে থাকতে পারত না। তার বিশ্বাস ছিল, ভক্তি ছিল; কিন্তু তার মনে কোন্ যে দেবতার আসন ছিল আমি বুঝে উঠতে পারিনি। আমাদের হিন্দু বাড়ির মেয়েরা স্বাভাবিকভাবে যে-ধর্মসংস্কার মেনে নিয়ে সংসারে চলে তেমন সংস্কার মণির ছিল, আমার ভ্রাতৃবধূরও ছিল। মনি ঠাকুর ঘরের কাজকর্ম করত বাড়ির বউ হিসেবে সংস্কারবশে, মনের টানে নয়। আমাদের সমাজে দু-ধরনের ভক্তি দেখা যায়, একটা আচারসম্মত, অন্যটা প্রাণের আকর্ষণে। আমার মা ছিল প্রথম দলে; আর আমার স্ত্রী ছিল অন্যটা। তার দেবতা ছিল ঠাকুরঘরের বাইরে। সেটা কেমন দেবতা আমি বুঝতে পারি, বলতে পারি না। সে-দেবতা আকার নিয়ে আসে না, সে যে নিরাকারও নয়; অথচ আমাদের দিনরাত্রি সুখদুঃখ জীবন—সব যেন একাকার করে সেই দেবতা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ভালবাসলে হয়ত অনুভব করা যায়; কিন্তু চোখে কি দেখা যায়? মণি বলত: সবই যে দেখতে হবে তা কেন গো! তুমি আমার প্রাণটা দেখতে পাও? আবার কখনো কখনো গম্ভীর হয়ে বলত, তার দেবতা শিব। অথচ আমি জানি—এ আমাদের ঠাকুরঘরের শিব নয়। ঠাকুরঘরের বাইরে এ জগতের বহুসুরের প্রবাহের মধ্যে যে বৈরাগ্য সুরটি ছড়ানো আছে এ হলো তার সঙ্গে সুর বাঁধা। মণি খানিকটা অদ্ভুত ছিল। এ-বাড়ির বড়োর কর্তৃত্ব, মর্যাদা, সম্ভ্রম সে চায় নি, নেয়ও নি। হাত না পেতেও যা পাওয়া যায় মণি তাও নিত না। তার ছিল নির্লিপ্ত স্বভাব, সে আমাদের মায়ায় জড়িয়েও তার নিজের পথ খুলে রেখেছিল। আমার ভাই প্রতাপ আর মণি এই দুজনে একবার মান অভিমানের পালা হয়েছিল, কী ঘটনা নিয়ে তা আজ আর আমার মনে নেই, শুধু মনে আছে মণি তার তোরঙ্গ থেকে একগাদা কাপড়চোপড় এনে জ্বলন্ত উনুনে ফেলে দিল, আর আমার ভাইটি সেই কাণ্ড দেখে তার বউদির পা জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। বাবা তখন বেঁচে। বড় বউমার মাথার দোষ হয়েছে কিনা তা দেখবার জন্য উঁকি মেরে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে আমায় ডেকে বললেন, 'বউমাকে অকারণে বিরক্ত করো না।'...মণিকে আমি কোনোদিনই বিরক্ত করি নি। তার দেবতাকে আমি যখন থেকে আন্দাজ করতে পেরেছি তখন থেকেই বুঝতে শিখেছি ও আমার যতটা স্নেহের, অন্তরের, ততটাই আবার দূরের। মণি যখন চলে গেল তখন

আমি যেন হঠাৎ কোন জলের তলায় ডুবে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, আমার কোনো চেতনা ছিল না। আমার শুধু বারবার মনে হত, এমন কথা ছিল না; মণি আমায় বলে নি—সে চলে যাবে। আমায় না জানিয়ে মণি কোথাও যেত না, কিছু করত না। সে বলত, আমি নাকি ভেবে মরব। মণি যখন সত্যি-সত্যি চলে গেল তখন কিন্তু বলে গেল না। সে চলে যাবার পর আমি পুজোর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে কিছুদিন কাটিয়েছি। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। আমার কাছে মার আমলের এই পুজোর ঘর আমাদের পারিবারিক সংস্কার। না এসে পারি না। এই ঘরে আমার জন্যে একটি আসন আছে, একটি প্রদীপ আছে মা যেটি নিজের হাতে জ্বালাত, বরাবর এই ঠাকুরঘরে সন্ধ্যের মুখে জ্বলে উঠেছে। কয়েকটি কর্পূর, সামান্য ধুনো; এর বেশি উপকরণ নেই। মার অত ঠাকুদেবতা, পট আমার ভগবান নয়। আমার আরাধ্য যিনি তিনি আমার চোখের সামনে পট হয়ে যতটুকু আছেন, তার বেশী রয়েছেন মনে। তাঁকে আমি বর্ণনা করতে পারি না।

পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে কাপড় ছেড়ে ফতুয়াটা গায়ে দিয়েছি, মানু আমার সন্ধ্যেবেলার দুধটুকু নিয়ে ঘরে এল।

আমি বললাম, "পুজোর ঘরটায় ঝুলময়লা জমেছে রে, একটু ঝাড়ামোছা করাস।"

মানু বলল, "কমলা তো রোজই মুছে দেয়।"

"জিনিসপত্র নাড়ানাড়ি করে ধোয়ামোছা করতে হবে, কমলা একা পারবে না, কার্তিককেও বলিস।"

মানু আর কিছু বলল না। সংসারের সব দিকে নজর থাকলেও পুজোর ঘরে তার চোখ বড় একটা পড়তে দেখি না। আমাদের পরিবারের একটা বাৎসরিক নারায়ণ পুজো আছে, মার হাতে চল হয়েছিল। সেই পুজোটুকু তিন পুরুষ ধরে বজায় আছে। মা মারা যাবার পর মানুর মা শ্বশুরবংশের সেই পুজোটা ধুমধাম করেই করত, এখন মানু অনুষ্ঠানটা মেনে চলে এই মাত্র। যে-ধরনের ধর্মাচরণ আমাদের বাড়ির মেয়েরা সচরাচর করে থাকে মানুর তা নেই। পুজোর ঘরে সে কমই ঢোকে। আনু বাড়িতে না থাকলে সন্ধ্যের আলোটুকু দিয়ে আসে; তার বেশি আমার কিছু চোখে পড়ে নি। মেয়েটাকে দেখে দেখে আমার এক সময় মনে হত বয়েস বাড়লে মন খানিকটা সুস্থির হলে সে ঠাকুরদেবতার ওপর নির্ভর করবে। মানু এখন পর্যন্ত তা করে নি। তার ভাবসাব দেখে মনে হয়—পুজোআর্চায় তার মতি নেই, আস্থাও নেই। বরং উপেক্ষা রয়েছে। মানুর মা মেয়ের মন বসাবার জন্যে দেবদ্বিজে চেষ্টা করেছিল, তাতে কিছু ফল হয়নি। মাঝে-মাঝে আমি ভাবি, আর ক'দিন পরে মানুর অবলম্বন কী হবে? এখন পর্যন্ত আমরা তার অবলম্বন হয়ে

আছি। এর পর?

কেদারায় বসে দুধ খেতে খেতে দেখি মানু দাঁড়িয়ে আছে। সে কিছু বলবে বলে মনে হল।

"কিছু বলবি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মানু যেন তার কথা গুছিয়ে নিচ্ছিল; বলল, "সুহাসের চিঠি পেয়েছ, আয়নার কথা কিছু লেখে নি?"

সুহাসের চিঠি এসেছে গতকাল। আজ এতটা পরে মানু তার খোঁজ করছে। আমি জানতাম এই খোঁজ সে করবে। কাল সারাটা দিন বড় উৎকণ্ঠায় কেটেছে। সব সময় মনে হয়েছে মানু এসে জিজ্ঞেস করবে, আয়নার কী হল? আজ সকালটাও স্বস্তিতে কাটে নি। তবু মানু কাল সারাদিন বা আজ সকালে কিছু জানতে আসে নি। কেন আসে নি জানি না।

মানুর কথায় আমি খানিকটা অবাকও হচ্ছিলাম। সুহাস আমাকেই চিঠি দিয়েছে, মানুকে কি দেয় নি? তাহলে মানু শচির কথা কেমন করে জানল?

"ছেলেটির মার সঙ্গে সুহাস কথাবার্তা বলছে—" আমি বললাম আস্তে করে, এমন কোনো আভাস দিতে চাই না যাতে মানু বুঝতে পারে তার জন্যে এই বিয়ে আটকে যেতে বসেছে। "হিন্দু বাড়ির বিয়ে এক কথায় হয় না, পঁচিশ রকম ফ্যাসাদ আছে, বুঝলি না—" আমি মানুকে বিয়ের হুজ্জুত বোঝাবার মতন করে বললাম। "সুহাস সব জিনিস ঠিক মতন গুছিয়ে বলা কওয়া করতে পারছে না।"

"তুমি তো চিঠিতে সবই লিখেছ।"

"চিঠিতে লেখা আর মুখে বলা আলাদা কথা। তুই দাঁড়িয়ে কেন, বোস না।"

মানু বসল।

"আমি তাই ভাবছিলাম, শচিকে নিয়ে আমি যদি কলকাতায় যাই, দুটো কাজই সেরে আসতে পারি। কী বলিস?"

মানু কিছু বলল না। চুপ করে বসে হেঁট মুখে হাতের নোখ দেখতে লাগল। মানু খুব বুদ্ধিমতী। আমার ভয় হচ্ছিল সে বুঝি সব জেনে ফেলেছে।

"তুই কোনো চিঠিপত্র দু-একদিনের মধ্যে পেয়েছিস কলকাতা থেকে?"

"কার? সুহাসের? না, পাই নি।"

"পাস নি! তাহলে শচির কথা—"

"সুহাসের বন্ধু লিখেছে।"

"অবিন!...আমাকেও যে অবিন লিখেছে।"

মানু নোখ দেখা বন্ধ করে আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল। তার মুখ বলছিল, কথাটা সে জানে। আমিও যেন হাঁপ ফেলে বাঁচলাম।

মানু বলল, "আগে শুনলাম ছেলেদের পক্ষ থেকে তাড়াতাড়ি করতে চাইছে, এখন আবার দেরীর কথা উঠছে কেন?"

বিব্রত বোধ করে বললাম, "হ্যাঁ—আগে ওদের তাড়া ছিল। তা আমরা তো পুজোর পর-পর করছিলাম। তা ছাড়া ছেলেমেয়ে দেখাদেখি আছে। একবার অন্তত চোখে দেখা দরকার। আমি নিজেও একটু ঘরবাড়ি দেখতে চাই। হুট করে রাজী হয়ে গেলে পরে কী হয় কে বলতে পারে। আমার তো মন হয়, আয়নাকে নিয়ে আমি ক'দিনের জন্যে কলকাতা ঘুরে আসি। শচিকে পোঁছে দেওয়া হবে, সেই সঙ্গে ওরাও মেয়ে দেখুক, আমরাও ছেলে দেখি। সামনাসামনি কথাবার্তা বলে যা স্থির করার করা যাবে। কী বলিস?"

মানু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তুমি আয়নাকেও নিয়ে যাচ্ছ?"

"ভাবছি। ওরও দু-দিন জায়গা বদল হবে।"

"তা হবে।"

"তোর কি অসুবিধে হবে? এই বাড়িতে একা-একা থাকবি—"

"না, আমার কিছু হবে না।"

"থাকতে পারবি?"

"পারব।"

মানু আরও একটু বসে থেকে উঠে গেল।

ও চলে গেলে আমি বসে বসে নানারকম ভাবলাম। আমার কেমন মনে হচ্ছিল, মানু যে কথা বলতে এসেছিল তা বলল না। সে কী বলতে এসেছিল আমি জানি না। সে কি শচির জন্যে কিছু বলতে এসেছিল? আয়নার কথা কিছু কি ধরতে পেরেছে?

মানুও যেন ইদানীং কেমন হয়ে যাচ্ছে। আজকাল তাকে আমার মাঝে-মাঝে বড় বেশী গম্ভীর, একা-একা মনে হয়। তার হাতে এই সংসারের নিত্যদিনের সব দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সে পালন করতে করতে এমন এক অভ্যাস করে নিয়েছিল যে আমার মাঝে-মাঝে মনে হত, সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে মানু যেন সংসারের শত রকম ছোট-বড় কাজ কোলে নিয়ে বসে সারাদিন ধরে একটি মালা গাঁথে। কাজের শেষে সেই মালাটি আমাদের পরিবারের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করে। তার চোখেমুখে ওই মালাগাঁথার আনন্দ দেখেছি বরাবর। তাতে মায়া থাকত, সুখ থাকত। এখন দেখি মানু যেন কোল বিছিয়ে বসে অন্যমনস্কভাবে মালাটি গাঁথছে বটে, কিন্তু তার সুখ আনন্দ আর তেমন করে চোখমুখে ফুটছে না। তার কেন এমন হল আমি জানি না; বুঝতে পারি না। মানু কি হঠাৎ একদিন এই মালা-গাঁথা থামিয়ে কোল থেকে সব ফেলে দেবে?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে দেখি আনু আমার বিছানায় মশারি টাঙিয়ে দিচ্ছে। এটা বরাবরই সে করে। মাঝে-মাঝে মানু। আমার সুখ-সুবিধে, প্রয়োজন ওরা দু-বোনে কতকাল ধরে যে দেখে আসছে আমার আর তা মনেও পড়ে না।

আগে আনুর অভ্যাস ছিল আমার খাবার সময় সামনে বসে গল্প করা। ছেলেবেলায় সে আমার কোল ঘেঁষে বসে খাবার জন্যে ঘুম-চোখে জেগে থাকত, কোনো কোনো দিন খেতে বসে টলে পড়ত, তার মা কত বকত, মেয়েটা তবু তার অভ্যেস বদলাতে পারত না। তার মা মারা গেল যখন আনু তখন বেশ বড় হয়েছে; তখন দেখতাম মাঝে-মাঝেই আমার সঙ্গে খাওয়া সেরে আমার বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছে। তার ভয় করত। ভয়টা আস্তে-আস্তে কাটল। সে আর শুতে আসত না, কিন্তু খাবার সময় আমার সামনে বসে বসে কত রকম গল্পই করত। আনুই ছিল আমার সবচেয়ে কাছাকাছি মানুষ। মানুকে তার মণিমা বারো আনা নিজের দখলে নিয়েছিল, আমি পেয়েছিলাম চার আনা। খোকা—মানে সুহাসের বেলায় আমি মণির কাছ থেকে আট আনা নিজের দিকে টেনে নিয়েছিলাম। খোকা বড় হবার পর আনু আমারই বারো আনা দখলে এল। আমাদের পরিবারের মানুষ-জন যখন একজন একজন করে চলে যেতে লাগল, ছড়ানো, বড় সংসার গুটিয়ে ছোট হয়ে আসতে লাগল তখন কে কাকে আঁকড়ে ধরে এইরকম এক মন হল সকলের। আমি যেন আনুটাকেই আঁকড়ে ধরলাম। কিংবা সে আমাকে ধরে থাকল। সেই হল আমার সবচেয়ে আদরের।

মানু হল একরকম, আর আনু অন্যরকম। আনু আদুরে, ভীষণ অভিমানী, ভীরু, সরল, হাসি-হুজুগের মেয়ে। তার না আছে দায়-দুশ্চিন্তা, না সাংসারিক দায়িত্ব; তাকে আমরা এখনও ছেলেমানুষ করে রেখেছি। অথচ বয়সটা তার ছেলেমানুষের নয়।

আনুকে যে আর বেশী দিন এ-বাড়িতে আমরা ছেলেমানুষ করে ধরে রাখতে পারব না এটা বুঝতে আমাদের দেরি হয় নি। তার বাবা মাঝে-মাঝে আমায় বলত : কী করি বলো তো? নিজে আমি আর ও দায় নিতে চাই নে দাদা, তুমি যা হয় করো, ও মেয়ে তোমার।

ওরা কেই বা আমার নয়! মানু, খোকা, আনু—সকলেই আমার। তবু আনুটাই বুঝি এখন সবচেয়ে বেশী আমার। মেয়েটার জন্যে আজ আমার দুশ্চিন্তা সবার বেশী।

মশারি গোঁজা শেষ করে আনু যাব-যাব করছে আমি বললাম, "তোর

বিনুর খবর কী? আজ তাকে দেখলাম না।"

"এসেছিল।"

"কখন এল?"

"বিকেলে।"

"বিনুর মেয়ের জন্যে যে ওষুধ দিলাম; কেমন আছে?"

"ভাল হয়ে গেছে।"

আনু কথা বলতে-বলতে এক দিকে সরে গিয়ে আমার জন্যে সামান্য ভাজামসলা নিয়ে এল। কাচের ছোট্ট প্লেট থেকে মসলা তুলে মুখে দিতে-দিতে আমি বললাম, "কলকাতায় গিয়ে তুই থাকতে পারবি তো?"

কলকাতায় যাওয়ার ব্যাপারটা আনু প্রথমবার যেভাবে নিয়েছিল এখন যেন আর সেভাবে নিতে পারল না। সে আমার দিকে তাকাল। বোঝাবার চেষ্টা করল হঠাৎ তাকে কলকাতা পাঠাবার গরজটা কেন হল? আনু তার বিয়ের সম্বন্ধের কথা জানে, কথাবার্তাও যে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে তাও তার কানে যায়নি বলে মনে হয় না। তার বন্ধু বিনুই আমার কাছ থেকে নানা খবর নিয়ে গেছে। আনুর মুখ দেখে মনে হল, সে হয়ত সন্দেহ করছে তাকে কলকাতায় নিয়ে যাবার গরজটা তার বিয়ের জন্যে।

আনু চুপ করে থাকল। এবার আর সে চট করে বলতে পারল না, সে যেতে রাজী। তার সংকোচ হচ্ছিল।

আমি বললাম, "তোর দাদার কাছ থেকে দু-দিন বেড়িয়ে আয়। ভাল লাগবে। জায়গা বদল হলে শরীরটাও ভাল হবে।"

আমার মুখের দিকে দু-মুহূর্ত তাকিয়ে আনু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "দাদা আমায় যেতে লিখেছে?"

"দাদা না লিখলে তুই যাবি না নাকি? আমি তোকে পাঠাব।" আমি হাসিমুখে বললাম।

আনু এবার মাথা হেলিয়ে দিয়ে বলল, সে যাবে।

ও চলে গেল। মেয়েটার পেছন থেকে দেখলে ওর মার মতন মনে হয়। আনুর মা মাথায় অতটা লম্বা ছিল না, কিন্তু হাঁটাচলা, ঘাড় অনেকটাই আনুর মতন।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরের সামনে পায়চারি করা আমার অভ্যেস। আজ আর পায়চারি করতে ইচ্ছে করছিল না, অথচ খানিকটা হাঁটাচলা না করে শুয়ে পড়লে একটা ভার বুকের তলায় জমে থাকবে, অস্বস্তিতে ঘুম হবে না।

বারান্দার দিকের দরজাটা ভেজানো ছিল, খুলে বাইরে বারান্দায় এলাম। গরমটা আর নেই। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। পুজোর ঘরের সামনে বাতাবী লেবুর পাতা দুলছিল। সামনে বাগানে জ্যোৎস্না আরও ফুটফুট করছে। দূরে রেল-ফটকের দিকে একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে ঘনঘন হুইসল দিচ্ছিল।

বারান্দার গা ঘেঁষে পায়চারি করতে-করতে চোখে পড়ল মানুদের ঘরের বারান্দা ঘেঁষে জ্যোৎস্না এসে গেছে। বেশীদূর ওটা আসবে না, ঘুরে যাবে। আমার বাবা যতটা এলাহি কাণ্ড করে এই বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন তাতে সব ক'টি ঘরের পক্ষে সব কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। সংসারে এটা বড় খাঁটি জিনিস, আমরা সবাই সমান করে সমস্ত কিছু পেতে পারি না। ভগবান কাকে কতটুকু দিতে চেয়েছেন কে বলবে।

আমি আমার ভাগ্যটুকু স্বীকার করে নিয়েছি। আমার বাবা আমাদের দুই ভাইকে মানুষ করতে কোনো গাফিলতি করেন নি। দু'জনেই সমানভাবে মানুষ। তবু প্রতাপ যা পারত, আমি পারতাম না। প্রতাপ ছিল একরোখা, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান; আমি কোনো দিনই জেদী হতে পারি নি, আমার স্বভাবে খানিকটা আলস্য ছিল। প্রতাপের মতন সাংসারিক বুদ্ধিও আমার ছিল না। সে আমার ছোট হয়েও আমার অভিভাবক হয়ে গিয়েছিল। আমার ওপর তার ভক্তি-ভালবাসার অভাব কোনো দিনই দেখি নি; তবু আমার মনে হয়, প্রতাপ আমার ওপর আরও একটু ভরসা করতে পারত। সে কোন দিন আমার ওপর ভরসা করত না। দোষটা আমার, আমি পারিবারিক ব্যবসাপত্রে হাত দিতে গিয়ে সামলে উঠতে পারি নি। কিংবা আমার স্বভাবে এমন একটা অক্ষমতা ছিল, যেটা প্রতাপ জানত। কিন্তু বুদ্ধি রেখেও তো প্রতাপ শেষ পর্যন্ত সুখী হতে পারল না। সুখের জন্যে সে যতটা ছুটেছিল ততটা ছুটে সে কী পেয়েছে আমি তো জানি। বুড়ো বয়সে নিরিবিলিতে বসে আমরা দুই ভাইয়ে যখন পাঁচরকম কথা বলতাম তখন প্রতাপ মাঝে-মাঝে বলত : এই বয়সে এত রকম ঘা খাব কে জানত বলো? আমার আর সহ্য হয় না।

আমার ভাই বেচারীর মনে শেষের দিকে যত দুঃখ জমেছিল তার অনেকটাই আমি জানি। বড় মেয়ের জন্যে তার আফসোসের অন্ত ছিল না, ছেলেটা আস্তে-আস্তে তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেল। না, আমি খোকার কলকাতায় থেকে যাওয়ার কথা বলছি না, আমি বলছি ছেলে আর বাবার মধ্যে মনের তফাত। খোকাটা তার বাবার কাছ থেকে বরাবরই একটু তফাতে থাকত, আমার দিকেই তার টান ছিল বেশী। এটা তার বাবা না বুঝত এমন নয়, কিছু বলত না। প্রতাপের স্ত্রীও মারা গেল অনেক দিন অসুখে ভুগে ভুগে। তার স্ত্রী—আমার ভ্রাতৃবধূর জন্যে আমার নিজের শোকতাপ আমি কোন দিন বুঝতে পারি নি। আমার স্ত্রী মণি মারা যাবার পর সবই সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। আমার ওপর যত্নের কোনো অভাব সে কোনো দিন ঘটতে দেয় নি। আমার ভ্রাতৃবধূ হয়েও সে আমার সঙ্গে কথা বলত, সেকেলে আচার আমাদের বাড়িতে চলত না, বাবা-মা চলতে দেয় নি, আমরাও নয়। স্ত্রী মারা যাবার পর প্রতাপ খুবই ভেঙে পড়েছিল। তার শরীর স্বাস্থ্য মন সেই যে ভাঙতে শুরু করল, আর সেরে উঠল না। শেষের দিকে তার মাথায় আরও

একটা দুশ্চিন্তা এসেছিল ছোট মেয়েকে নিয়ে। আনুর বয়স বাড়তে-বাড়তে কুড়ি-একুশ হয়ে গেল অথচ তার কোনো ব্যবস্থা সে করতে পারছে না এই ক্ষোভ তার ছিল। প্রতাপ যে তলায় তলায় চেষ্টা করে নি তাও নয়, কিন্তু আমরা দুজন ছাড়া সে কথা কারও জানার নয়। একটি ছেলে মোটামুটি প্রতাপের মনে ধরেছিল, আমার ধরে নি। কথাটা চাপা পড়ে গেল তখনই। আমার অমতে আর হাত বাড়াবার সাহস প্রতাপের হয় নি।

সংসারে আমি চিরটা কালই মুখ বুজে থেকেছি। না থাকলেই হয়ত ভাল ছিল। ওই যে মেয়েটা—মানু, ভগবান যাকে রূপে-গুণে রাজরাজেশ্বরীর মতন করে গড়ে তুলেছিলেন সে বেচারীর মুখের দিকে তাকালে নিজেকে কোথায় যেন অপরাধী বলে মনে হয় আমার। মানুর বাবা যা চেয়েছে আমি তাতে মাথা না নাড়লে কী এমন হত! প্রতাপ আমায় অমান্য করত কী না আমি জানি না। হয়ত শেষ পর্যন্ত করত, তবু আমার বিবেকে লাগত না। আমি প্রতাপের এই লোভ পছন্দ করি নি। তার তখনকার আচরণ দেখে মনে হত, প্রতাপ যেন মস্ত এক জুয়া খেলায় নেমেছে। ও কার সঙ্গে জুয়া খেলছে এটা ভেবে দেখি নি। আমি জানি, মানু মনে-মনে আমার ওপর একটা অভিমান পুষে রেখেছে। সে ভাবে আমি বাধা দিলে এই অবস্থা তার হত না। প্রতাপের ছেলেমেয়ের বিয়েথার ব্যাপারে আমি যে কী করে হাত দিই আমি তা বুঝে উঠতে পারি নি। তার অধিকার কাড়তে গেলে মনোমালিন্য হত। আমাদের দুই ভাইয়ের সম্পর্ক নষ্ট হতে পারত। আমি বাধা দেবার সাহস পাই নি, জোর পাই নি। কিন্তু পরে আমার মনে হয়েছে, আমার ভুল হয়েছিল। আমি নিঃসন্তান। প্রতাপের ছেলেমেয়েরাই আমার সন্তান। আমি আপত্তি করতে পারতাম। প্রতাপ আমায় অমান্য করত এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

পায়চারি শেষ করে শোবার ঘরে ফিরে এলাম। কাজকর্ম সারা হয়ে গেছে বাড়ির। দরজা-টরজা বন্ধ হবার শব্দ আসছিল। কার্তিক তার কাজ সারছে। মানুর গলার সাড়া পাওয়া গেল। ভেতর ঘরের আলোটালো নিবে এল।

শুয়ে পড়ার সময় অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবতে-ভাবতে আমার একটা গান মনে এল। মণির যখন মনটন খুব খুশী থাকত তখন গুনগুন করে গাইত। গানটার পদ আমার ঠিক খেয়াল নেই, তবে ভাবটা আমার মনে আছে। আকাশের তারা কখন বুঝি হারিয়ে যাবে সেই ভয়ে আমি চোখের পাতা বুজতে পারি না। মণির এ-গান কার উদ্দেশে তা আমি জানি না। তার দেবতার উদ্দেশেও হতে পারে। মণি আমায় বলে নি। কিন্তু আজ আমার নিজেরই মনে হয়, আমারও সেই এক অবস্থা, আমিও সেই বসে থেকে চেয়ে আছি, আজও চোখের পাতা বন্ধ করা গেল না। কিন্তু আমি কোন্ আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি?

বিছানায় শুয়ে পড়ার আগে বাতিটা নিবিয়ে ছোট টর্চটা নিয়ে নিলাম। মশারি সরিয়ে বিছানায় শুতে গিয়ে দেখি, আমার বাঁ পাশের জানলাটা বাতাসে

ঠকঠক করে কেঁপে আবার থেমে যাচ্ছে। বাইরে তবে হঠাৎ দমকা বাতাস এসেছে। এই বাতাস আসতে-আসতে একদিন মেঘ উড়ে আসবে, তার আর দেরি নেই, বর্ষা নেমে যাবে।

আমি, আমার মণি, আমাদের পিতৃপুরুষ, এই পরিবার—প্রতাপ, তার বউ, মানু, খোকা, আনু—সব যেন আমার মধ্যে মিশে আছে। এই বাড়িকে শুধু বাড়ি হিসেবে আমি ভাবতে পারি না; এর যেখানে যাকিছু সবই আমার জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছে। মণির মতন আমি মায়ায় জড়িয়েও নিজের জন্যে একটা দরজা খুলে রাখতে পারি নি। আমার কাছে এটা মোহ, মায়া নয়।

এই মোহ কেন? বাবা-মার জ্যেষ্ঠ সন্তান হয়েও আমি এ-বাড়িতে কর্তৃত্ব করি নি, সে ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি আমাদের পরিবারের সম্মান-মর্যাদা বাড়াতে পারি নি, সে সাধ্য আমার ছিল না। সাধও নয়। আমি বিপত্নীক হয়েছি অনেককাল। আমার নিজের কোনো সন্তানাদি ভগবান দেন নি। তবু এ মোহ কেন?

মণিকে একবার আমি বলেছিলাম; ঠাকুর-দেবতার দয়া চেয়ে কেউ কেউ ছেলেপুলে পায়। তুমি কি কোথাও মানত করবে?

মণি মাথা নেড়ে বলেছিল, না।

তোমার জন্য আমার যে বড় কষ্ট হয়, মণি?

আমার কোনো কষ্ট নেই তো! তোমার যদি কষ্ট থাকে তুমি কষ্ট করে কাঁদতে যাও, আমায় বাপু কাঁদাতে এস না।

আমার কষ্ট ছিল না, কিন্তু নিজের অক্ষমতার জন্যে লজ্জা ছিল। আমার বাবা ডাক্তার। আমি পরে শুনেছি, বেশী বয়সে আমার সাধারণ একটা রোগ হয়—মাম্পস্। তার হঠাৎ আসা হঠাৎ যাওয়ার মধ্যে শঙ্কার কোনো কিছু ছিল না; কিন্তু ভেতরে-ভেতরে সে কোথায় আমাকে অক্ষম করে গেল তা কেউ জানল না। মণির সন্তানাদি হল না। সে পরে এটা শুনেছিল, কিন্তু কাঁদতে বসে নি। আমায় বলেছিল: তুমি মিথ্যে-মিথ্যে মন খারাপ করো না; কত মানুষের কত কী হয়, কে কত দুঃখ পায়, কত রোগভোগ সয়। ভগবানের কাছে সব চাইতে নেই, তিনি যতটুকু দিয়েছেন ততটুকু নিয়ে তৃপ্তি পাবার চেষ্টা করো। তুমি তো কত কিছু পেয়েছ, নিজের দুটো ছেলেপুলে না থাকলেই মন খারাপ করতে হবে! কেন করবে? মানু, খোকন—এরাও তো তোমাদেরই রক্ত।

আমি মণির কথা বর্ণে বর্ণে মানি। আমার নিজের সন্তান থাকলেও মানু খোকা আনুর চেয়ে আমার নিজের হত না। আমার মনকে আমি হাজারবার করে বুঝিয়েছি, সংসারে অনেক প্রাপ্তি দৈবের সহায় ছাড়া হয় না; কিন্তু মানুষ হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে পারে; সেটা স্বেচ্ছায় হয়। কথায় বলেছে, দাও অ্যাক্সেপ্‌ট্ অ্যান্ড দাও রিজয়েস। আমরা বলি, গ্রহণের দ্বারাই সুখ।

আমি গ্রহণ করব, যা আমার হৃদয়কে পর্যাপ্ত করবে, প্রসারিত করবে, যা আমার মানববৃত্তিকে তৃপ্ত করবে—সেই গুণগুলি আমি গ্রহণ করব। গ্রহণ দ্বারাই চিত্ত শোধিত হয়।

আমার যিনি ঈশ্বর তাঁর কাছে আমার আর কিছু প্রার্থনা নেই। জীবনের শেষটুকু আমি এইভাবেই কাটাতে চাই। আমার এই সংসারের সকল পরিজনের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে। আমি চঞ্চল হলে ওরা চঞ্চল হবে, আমি নিরাশ হয়ে পড়লে ওরাও হতাশ হবে। ওরা আজও তাদের জ্যাঠামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

চোখ বুজে কয়েক দণ্ড শুয়ে থাকতে-থাকতে আমার শচির কথা মনে পড়ল। ছেলেটা মনে-মনে কী স্থির করবে কে জানে! কাল তার আসার কথা। না আসা পর্যন্ত আমার দুশ্চিন্তা। শচি বড় আশ্চর্য ছেলে, আমি বরাবরই দেখলাম—সে মাথার ওপর খাঁড়ার দুঃস্বপ্ন দেখেই ছুটে বেড়াল। এই দুঃস্বপ্ন দেখার কারণ যে নেই তা নয়, তবু ভাবি শচি যদি অতটা বিহ্বল না হত ছেলেটা কিছু সুখশান্তি পেত। আমার মনে-মনে ইচ্ছে ছিল, মানুর সঙ্গে শচির বিয়ে হয়। কথাটা এ-বাড়িতে একবার উঠেও বরাবরের মতন বন্ধ হয়ে গেল। প্রতাপ রাজী হল না। সে অরাজী হল, আমিও তখন অরাজী হলাম। প্রতাপ ভেবেছিল, অন্যের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তার মেয়ের ভাগ্য জড়াবে না। সে জানত না, ভাগ্যটা যদি বিশ্বাস করতেই হয় তবে সে হল ভগবানের হাতে, মানুষের হাতে নয়। মানুষ যেটুকু হিসেব করতে অভ্যস্ত তার বাইরে একটা বেহিসেব না থাকলে ভাগ্য বলে কিছু থাকে না। মানুর সঙ্গে শচির বিয়ে হলে ওরা দুজনেই জীবনের কিছু সুখশান্তির স্পর্শ পেত। দুজনেই তা থেকে বঞ্চিত হল।

শচিও আমার আর-একটা মায়া। আমার ঘরের মায়া, আমার বাইরের মায়া এসব মিলিয়েই হয়ত আমার মনের আকাশে কয়েকটা তারা এখনও জ্বলছে। আমি চোখ বুজতে পারি না, কী জানি কে কখন হারিয়ে যায়। কিংবা আমি নিজেই আর চোখের পাতা খুলতে না পারি।

আমি সেই ভয়ে মুদি না আঁখি,
পাছে তারাহারা হয়ে থাকি।

মোহিনী

আজ নয় কাল নয় করে শেষে আজ আমি অবিনকে চিঠি লিখতে বসলাম। কাগজ-কলম সাজিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আমি অবিনকে চিঠি লিখতে বসেছি—বাইরে নতুন বাদলার বাতাসের সংগে টিপটিপে বৃষ্টি পড়ছে, বাড়ির মধ্যে কোথাও কোনো সাড়া নেই, যে যার ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে, রাত হল অনেকটা—এসব কেউ দেখলে-শুনলে ভাববে মোহিনী পাগল হয়েছে। আমায় কেউ দেখছে না এই যা রক্ষে, ঘরের বাতিটার চোখ থাকলে ও শুধু দেখছে, আমি কলমের ডগায় আঁচড় কেটে-কেটে একটিও দাগ ফুটোতে পারি নি, কালি ফুরিয়ে গেছে, গালে কলম ঠেকিয়ে বসে আছি। কালি না থেকে কলমটা আমায় বাঁচাল; অবিনকে আজও আমার চিঠি লেখা হবে না; এখন আবার কালি ভরার গা আমার নেই। বরং এই যে বাধাটুকু শেষে পড়ল এতে আমি আপাতত বাঁচলাম।

এখান থেকে ফিরে গিয়ে অবিন আমায় এই নিয়ে তিনটে চিঠি লিখল। তার প্রথম চিঠিটা আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে চাই নি। ভেবেছি, চিঠির তাগিদটা ছিল সৌজন্যের; বাকিটুকু যা লিখেছে সেটা তার স্বভাব। আমি সাতপাঁচ ভেবে পালটা এক জবাবও দিয়েছিলাম ছোট করে। ভেবেছি, অবিন যদি ওখানে থেমে যায়! সে থামে নি। আবার চিঠি এল। আমি আর জবাব দিই নি। তার উৎপাত প্রশ্রয় পাবে এই ভয় আমার ছিল। চিঠির জবাব না পেয়ে অবিন চুপ করে আছে দেখছিলাম, তারপরই আবার চিঠি এল।

চিঠিটা এসেছে আজ পাঁচদিন হয়ে গেল। অবিন তার আগের চিঠির জবাব পায় নি বলে যে এটা লিখেছে তা ঠিক নয়। বার-বার পড়ে আমার মনে হয়েছে, আমি হয়ত এ-চিঠিতে উপলক্ষ, শচিদাই উদ্দেশ্য। অবিন আমায় যে-কথাটা বোঝাতে চেয়েছে তা হল—জ্যাঠামশাই যদি কোনো কারণে শচিদাকে কলকাতায় পাঠাতে না পারেন—আমি যেন সে-ব্যাপারে চেষ্টা করি। শচিদার অসুখ-বিসুখ নিয়ে যেসব কথা উঠেছে অবিন আমায় তা মোটামুটি জানিয়ে দিয়েছে। চিঠির মধ্যে বাকিটুকু যা—তা হল ওর পাগলামি। অবিন যে অবিনই এটা অন্তত আমার আর জানতে বাকি নেই।

ভেবেচিন্তে আমার মনে হচ্ছিল, এবারকার চিঠির জবাবটা আমার দেওয়া উচিত। জ্যাঠামশাই এতদিন চুপ করে বসে নেই, অবিনকে যে চিঠি দিয়েছেন তা আমি বুঝতে পারি। তবু আমারও হয়ত একটা জবাব দেওয়া দরকার।

শচিদা কলকাতায় যেতে রাজী হয়ে গেছে। প্রথম-প্রথম হচ্ছিল না। তারপর রাজী হল।

শচিদা কাল বিকেলেও এ-বাড়িতে এসেছিল। তার আগেও এসে জ্যাঠা-মশাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে। জ্যাঠামশাইয়ের মুখ থেকেই আমি শুনলাম, কলকাতায় যাওয়া ঠিক করে ফেলেছে শচিদা। কাল যখন শচিদা এল, কথা বলতে-বলতে আমি আবার তার কলকাতায় যাওয়ার প্রসঙ্গটা তুললাম।

আমি বললাম, "তুমি তা হলে কবে যাচ্ছ?"

শচিদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল তো থাকলই, কথাও বলে না, চোখের পাতাও ফেলে না। কেমন এক বেখেয়ালে চেয়ে আছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী হল তোমার?"

শচিদা হুঁশ পেয়ে বলল, "আমার কেমন যেন হয়ে গেল, কথা বলব-বলব ভাবছি, বলতে পারছি না।"

"অদ্ভুত তো! এ-রকম তোমার প্রায়ই হয় নাকি আজকাল?"

"না।" মাথা নাড়ল শচিদা।

"কবে যাবে ঠিক করেছ?" আমি শুধোলাম।

"শীঘ্রি।"

"দু-চার দিনের মধ্যে?"

"না। অত তাড়াতাড়ি পারব না। আমার ছোটখাটো ক'টা কাজ রয়েছে এখানে; সেরে তারপর যাব।"

"তোমার কাজ সারার সময় পাবে, পরে সেরো; তার আগে কলকাতা ঘুরে এস। এটা আগে দরকার।"

শচিদা আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকল, তারপর দেখি তার রোগা-রোগা, তামাটে, ডান হাতটা কপালের কাছে ছুঁইয়ে রাখল। বলল, "আমি আর আসব না, মানু।"

শচিদার কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। দুঃখে মানুষের বুক টনটন করে, ভয়ে কাঁপে, দিশেহারা হলে থমকে যায়। আমার যে কী হল বুঝতে পারলাম না—বুকটা মোচড় দিয়ে কেঁপে থমথম করতে লাগল। আমার মুখও হয়ত শুকিয়ে গিয়েছিল। কোনো রকমে সামলে নিয়ে বললাম, "তুমি কী করে জানলে তুমি আসবে না!"

কথার জবাব দিল না শচিদা। আমি তার দিকে চেয়ে থাকলাম।

অনেকক্ষণ পরে শচিদা বলল, "চলো একটু বাইরে গিয়ে বসি।"

ঘর থেকে আমরা বাইরে এলাম। কমলা তখন ঘরে-ঘরে আলো দিচ্ছে; আয়না ঠাকুরঘরে সন্ধ্যের প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে। অভ্যেসবশে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে পলকের জন্যে চোখ বুজলাম।

বাগানে এসে ঘুরে-ঘুরে আমরা পুবদিকে হরীতকীতলায় এসে দাঁড়ালাম। গাছটা আমি আজন্ম দেখছি। পুরনো গাছ, কবে যেন ইটপাথর দিয়ে তলাটা

বাঁধানো হয়েছিল গোল করে। সেসব আর নেই প্রায়, রোদে জলে ভেঙেচুরে গেছে, কিছু ভাঙা ইট, মাটি, গাছের পাতা আর শেকড় মিলেমিশে একটা ঢিবি হয়ে রয়েছে।

হরীতকী গাছটা একেবারে বুড়ো হয়ে গেছে। তার ডাল মরে গেছে, একটি দুটি শুকনো মতন ডালপালায় অল্প ক'টি পাতা, দু-পাঁচটি ফল বড় জোর। আমরা কিছু ভেবেচিন্তে এই গাছটার কাছে আসি নি, হাঁটতে-হাঁটতে চলে এসেছি, একেবারেই অন্যমনস্কভাবে। গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আচমকা আমার খেয়াল হল, এক সময় শচিদার এই জায়গাটা খুব পছন্দ হত। আমরা এর তলায় বসে কত রকম গল্প করতাম। তখন গাছটার ডালপালা ভরাতি হয়ে থাকত, অজস্র পাতা ছিল, হরীতকীতলায় কত ফল ঝরে পড়ত।

আমার ইচ্ছে হল না এখানটায় দাঁড়াই। শচিদাকে বলতেও পারলাম না।

শচিদা নিজেই বলল, "বসি।" বলে ঢিবির একপাশে বসে পড়ল।

আমি বললাম, "জায়গাটা পরিষ্কার নেই; এখানে বসলে?"

"গাছের পাতায় কী হবে, বসো।"

সদ্য পূর্ণিমা গিয়েছে। আকাশ জুড়ে জ্যোৎস্না থাকার কথা। ময়লা-ময়লা আলো ফুটছিল তবুও জ্যোৎস্না নেই; মেঘ জমে আছে মাথার ওপর, ঘন করে নয়, সকাল থেকেই আসছে, যাচ্ছে, আবার আসছে। পশ্চিমের দিকে পাহাড়টার মাথা কালচে হয়ে আছে সারাদিন। বর্ষার প্রথম মেঘ ভেসে আসছে।

আমি বসলাম একপাশে।

শচিদা বসে থেকে-থেকে বলল, "তুমি তখন কী বলছিলে?"

আমি বললাম, "বলছিলাম, তুমি আগে থেকেই অমঙ্গল গাইছ কেন? অসুখ করলেই কি তার খারাপটুকু ভাবতে হয়? কোনো কিছু না জেনেই তুমি আগের থেকেই গাইতে বসেছ, তুমি আর আসবে না। এসব আবার কী কথা?"

শচিদা এবার তার গলার কাছে পাঞ্জাবির বোতামটা খুঁটতে-খুঁটতে আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, "আমার মন যে বলছে মানু।"

"তোমার মনের কথা বাদ দাও। ও তো কতকাল ধরে বলছে—"

"তুমি মানু অনেক কিছু বিশ্বাস কর না, আমি করি।"

"ওটা তোমার বিশ্বাস নয়, মনের ভয়।"

"আমার ভয় বলো ভাবনা বলো তা তো মিছিমিছি নয়। আমি শরীর খারাপ, অসুখ-বিসুখ নিয়ে আগেও ভুগেছি। কিন্তু এরকমভাবে বলি নি। এবার বলছি।"

শচিদার মন সত্যি না মিথ্যে বলছে তা আমি জানি না। তবে এবার ফিরে আসার পর তাকে দেখলে ভয়টাই হয়। অবিন আমায় যতটুকু লিখেছে তা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি, ভয় পাবার মতনই অবস্থা দাঁড়িয়েছে; শচিদাকে এভাবে ফেলে রাখা যায় না।

আমি চুপ করে রয়েছি দেখে শচিদা নিজেই আবার বলল, "পুজো পর্যন্ত এবার এখানে থাকার আমার খুব ইচ্ছে ছিল মানু; খুব ইচ্ছে ছিল। আমার আর থাকা হল না।"

চোখে জল ভরে এলে যেমন টলটল করে শচিদার গলার স্বর বেদনায় যেন সেই রকম টলটল করছিল। বড় মায়া লাগে কথাগুলো শুনলে। মুখটি বড় বিষাদভরা।

আমি বললাম, "তোমার ইচ্ছে মিটবে শচিদা। তুমি আগে থেকে অত ভেব না।"

শচিদা অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বলল, "আমার কোন ইচ্ছেটা মিটেছে?"

কথাটা এত আচমকা এত সহজভাবে বলল শচিদা যে আমি প্রথমটায় তেমন কান দিতে চাই নি; তারপরই তার রোগা, দুর্বল, দুঃখমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে কোথায় যেন ঘা খেলাম। শচিদা স্পষ্ট করে না বললেও আমি বুঝতে পারলাম সে কোন্ কথাটা বলতে চাইছে। শচিদাকে আমি আমার জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত দেখে আসছি। তার জীবনের যতটা আমার জানা, এতটা বোধ হয় অন্য কারও নয়। যতদিন সে এখানে থেকেছে ততদিন তার নাড়িনক্ষত্র আমি জেনেছি। তারপর সে আমায় হয়ত অনেক কিছু জানতে দেয় নি। আমিও জেনে নিতে চাই নি।

আমি চুপ করে থাকলাম।

শচিদাও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমার জীবনটা ভগবান কেন যে এমন করে গড়লেন আমি বুঝতে পারি না। সব সংসারেই দুঃখকষ্ট, শোক আছে। কিন্তু আমার বেলায় সেই যে চোদ্দ-পনেরো বছর থেকে শুরু হয়েছে তার আর শেষ নেই। দেখে-দেখে আমার মনে হয়েছে, আমার ওপর আক্রোশটা ভগবানের যেন বড় বেশী। কেন যে তা তো বুঝলাম না।"

আমার বুক জুড়ে দুঃখ জমে উঠছিল। বেচারী শচিদা। সে যা বলছে তার একটি কথাও মিথ্যে নয়। কী ভাগ্য নিয়েই যে এসেছিল মানুষটা, সংসারে কোথাও একটু সুখশান্তি পেল না। ছেলেবেলা থেকেই সে ঘা খাচ্ছে। ওকে দেখলে মনে হয় ভগবানের নিষ্ঠুরতার শেষ নেই। সীমাও নেই। আমি একসময় ওর ভাগ্যের দিকে তাকিয়ে বুক বেঁধেছি। অত ঘা খেয়েও তার সহ্যশক্তি ছিল। মানুষের কত আর শক্তি থাকে? শচিদাকে বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না. কিন্তু আমি জানি, তার আর সে শক্তি নেই।

"মানু—!" শচিদা ডাকল।

"উঁ!"

"তোমায় একটা কথা বলব?"

শচিদার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। দেখি, শচিদার চোখের পাতা স্থির হয়ে আছে। কী বলবে সে বুঝলাম না।

শচিদা বলল, "আমি জ্যাঠামশাইকে বলেছি, তাঁকে আর আমার সঙ্গে কলকাতা যেতে হবে না। আমি একলাই যাব। উনি রাজী হচ্ছেন না। তুমি ওঁকে বলো, ওঁর যাবার কোনো দরকার নেই।"

আমি ভেবেছিলাম শচিদা অন্য কিছু বলবে। বললাম, "জ্যাঠামশাইকে আমি বলেছি, উনি শুনছেন কই! তাছাড়া আয়নাকে এবার উনি নিয়ে যাচ্ছেন।"

"আয়না আমার সঙ্গে চলুক।"

"তোমার সঙ্গে যেতে তো পারে অনায়াসেই, কিন্তু আয়না ওখানে গিয়ে থাকল, জ্যাঠামশাই গেলেন না তাতে কোনো কাজ কী হবে! জ্যাঠামশাইয়ের ইচ্ছে আয়নাকে দেখাবেন, নিজেও ছেলে দেখবেন, বাড়ির লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন।"

শচিদা খানিকটা চুপ করে থেকে বলল, "জ্যাঠামশাই তাই বলছেন। কিন্তু—"

আমি তাকিয়ে থাকলাম।

শচিদা কিছু যেন ভেবে আস্তে করে বলল, "তুমি এখানে থাকবে!"

"আমি আর কোথায় যাব!" বলে উঁচু মুখে তাকাতেই দেখি ঘুটঘুটে একটা মেঘ মাথার ওপর এসে গেছে। বেশ অন্ধকার হয়ে গেল। বড় করে নিশ্বাস ফেলে শচিদার দিকে তাকালাম। তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হল, শচিদা বোধ হয় বলতে চাইছিল, আমি কি কলকাতা যেতে পারি না?

কথাটা আমার মনে হল আচমকাই। তারপর কতক্ষণ ধরে শচিদাকে নজর করে বোঝবার চেষ্টা করলাম, শচিদা কি মনে-মনে চাইছে আমি তার সঙ্গে যাই? অন্ধকারের জন্যে শচিদাকে অস্পষ্ট করে যা দেখলাম তাতে কিছু বোঝা গেল না। সে আমায় তার সঙ্গী হতে ডাকবে কেন? যখন তার সময় এসেছিল তখন সে ভয়ে ডাকতে পারে নি; আজ তার ডাকার কোনো কারণ নেই। আমি নিজেই শূন্য হয়ে আছি; সে আমায় আর কোন ফাঁকার মধ্যে নিয়ে যাবে!

হরীতকীতলায় আর আমার বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। কবে, কোন-দিন এর নীচে দাঁড়িয়ে আমাদের ছেলেমানুষী ভাবনা নিয়ে খেলা করেছি তার কথা আজ মনে করে লাভ নেই। এই বয়েসে ওসব মনে করে আমার কী হবে! আমায় নিষ্ঠুর ভাবলে ভাব, আজ আমি ছড়ানো কড়ি খুঁজতে পারব না।

"শচিদা— ?"

"বলো।"

"চলো উঠি, কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে, এই লতাপাতার মধ্যে আর বসে থাকা উচিত না।"

আর একটু বসে শচিদা উঠল।

বাগান দিয়ে আসতে-আসতে শচিদা বলল, "আমার পুরনো কিছু জিনিসপত্র ঘাঁটতে গিয়ে তোমার একটা জিনিস পেলাম।"

"আমার জিনিস? কী?"

"দেখলেই বুঝতে পারবে। যাবার আগে দিয়ে যাব।" বলে শচিদা একটু হাসল।

আমি অনেক ভেবেও বুঝতে পারলাম না কী জিনিস। জানতে চাইলে শচিদা হয়ত বলত। আমার ছেলেমানুষী করতে ইচ্ছে হল না। কৌতূহল থাকল খানিকটা, তা নিয়ে মাথা ঘামালাম না।

বারান্দায় জ্যাঠামশাই শচিদার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন; ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে।

কাল রাত্রিটা আমার ভাল কাটে নি। ছেঁড়াছেঁড়া ঘুম হয়েছে। শেষ রাতে বৃষ্টি নেমে গেল। বিছানায় উঠে বসে দেখি, ঘুটঘুটে অন্ধকার, ভীষণ করে মেঘ ডাকছে, বাজ পড়ছে আর তোড়ে বৃষ্টি নেমেছে। অল্প করে উসকোনো আড়াল দেওয়া বাতিটা নিবে গেছে। বাতি জ্বালাবার উপায়টুকুও ছিল না। অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে জানলা বন্ধ করে দিয়ে আয়নার জন্যে ভাবনা হল। সে কি ঘুম ভেঙে জানলা বন্ধ করেছে? আয়না অবশ্য এমনিতেই জানলা-টানলা খুলে শোয় না বড়। যদি ভয় পেত তবে আমায় দরজা ধাক্কা দিয়ে ডাকত।

কী করি কী করি ভেবে শুয়ে আবার তন্দ্রা মতন এল। তন্দ্রার মধ্যে দেখি আমার ঘরে অবিন এসে ঢুকেছে, ডাকছে। চোখ মেলতেই আবার সেই অন্ধকার, আর কানে বৃষ্টির শব্দ।

দিনের বেলায় বৃষ্টি থামল। রোদ উঠল না। মেঘ ঘুরে-ফিরে আকাশেই জমে থাকল। আয়না তার সেলাই, বই পড়া, শোয়াবসা নিয়ে সকালটা কাটাল। তারপর দুপুরে-দুপুরে ছাতা মাথায় করে গেল বিনুর বাড়ি। ফিরল বিকেল শেষ করে। রাতারাতি মেয়েটা যেন কত বেড়ে গেছে। ওর বিয়ে হবে এই ভাবনাতেই কি ওর এত বদল হচ্ছে!

বিকেলের পর আবার বৃষ্টি এল। এখানে বর্ষা নামার ধরনটাই এই। প্রথম দফায় তার কোন বিরাম থাকে না। দু-তিনদিন একনাগাড়ে বর্ষা চলে। তারপর আবার শুকনো। নতুন করে নামতে দশ পনেরোটা দিনও কেটে যায়, শেষে সেই যে নামে আশ্বিন পেরিয়েও তার জের চলে।

সন্ধেবেলায় একবার মনে হয়েছিল, অবিনের চিঠির জবাবটা লিখে রাখি। বসি-বসি করেও বসতে পারি নি। একবার ভাবি, লিখব না; আবার ভাবি—দুটো কথা লিখতে দোষ কী! অন্তত এবারের চিঠির জবাব দিতে আমার সঙ্কোচের কী আছে!

কলকাতায় ফিরে গিয়ে অবিন যে-চিঠিটা দেয় সেটা আয়নার হাত হয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমি বড় লজ্জায় পড়েছিলাম। অবিনের ওপর রাগ হয়েছিল খুব। তুমি সুহাসের বন্ধু, ফিরে গিয়ে ভদ্রতা করে একটা চিঠি দিতে হয় তো জ্যাঠামশাইকে দাও। তেমন চিঠি তুমি জ্যাঠামশাইকে না দিয়েছ এমনও

নয়, আয়নাকেও দিয়েছ। তবু সময় নিয়ে আবার আমায় দেওয়া কেন?

প্রথমটার জবাব দেবার সময় আমার মনে হয়েছিল, হয়ত ভুল করলাম: ভয়ও হয়েছিল। দেখলাম, যা ভেবেছি ঠিক তাই। দেরী করে হলেও পালটা জবাব এল অবিনের। এবার ডাক পিয়নের অনেক সুমতি, কার্তিকের হাতে চিঠিপত্র দিয়ে গিয়েছিল, কার্তিক দিল আমার হাতে।

চিঠি পড়ে আমার গায়ে যেন জ্বর এল। ঘরে কেউ থাকলে কী দেখত, কী ভাবত জানি না। আমি কতখানি হুঁশ হারিয়েছিলাম তা পরে বুঝতে পারলাম, কমলা যখন জোরে-জোরে ডাকল। চিঠিটা আমার হাতের মুঠোয় থাকলেও এলো আঁচলের আড়াল থাকায় কমলা কিছু বুঝতে পারে নি। তাকে ঘর থেকে সরিয়ে দরজা ভেজিয়ে শুয়ে থাকলাম খানিক। তারপর উঠে কলঘরে গিয়ে চোখমুখ ধুয়ে নিজের কাজে গেলাম।

চিঠিটার জবাব দিই নি। দেব না ঠিকই করেছিলাম। সব জিনিসের সীমা আছে। তুমি, সুহাসের বন্ধু, তুমি যদি এ-বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাও তবে সেইভাবে রাখো যা সৌজন্য সম্ভ্রম নষ্ট করে না। সুহাসের আরেক বন্ধু কমলেশ তো এ-বাড়ির সঙ্গে তেমন সম্পর্ক রেখেছে। তবে তোমার এতটা স্পর্ধা কেন? আমার কাছে সত্যি মনে হল, অবিন বড় বেশী স্পর্ধা দেখাচ্ছে। সে যখন এখানে ছিল তখন আমার অশান্তি দিন-দিন বাড়িয়েছে। তাকে আমার বিশ্বাস হত না, ভয় হত।

অবিন কলকাতায় ফিরে গেলে আমি নিশ্বাস ফেলেছি। স্বস্তির নিশ্বাস! কিন্তু সেই প্রথম আমার যেন দীর্ঘশ্বাসও পড়েছে।

আয়না আমায় একদিন বলেছিল, "দিদি, অবিনদা যাওয়ার পর বাড়িটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে, তাই না?"

আমার জিবের ডগায় 'হ্যাঁ' এসেছিল—অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বললাম, "তোর বুঝি লাগছে?"

আয়না মাথা হেলিয়ে সরলভাবে হেসে বলল, তার লাগে। আয়নার সঙ্গে আমি চালাকিটুকু করলাম বটে, নিজের তরফে কিছু বললাম না, তবু আমারও যে কোথাও কিছু না লাগছে এমন কথা বলি কী করে। যে ক'টা দিন অবিন এখানে ছিল আমি যেন অনবরত ভেতরে-ভেতরে উদ্বস্ত্য হয়ে থাকতাম, ভয়ে কেমন এক অস্থির ভাব থাকত, মনে হত অসাবধান হলেই আমার কী এক সর্বনাশ ঘটে যাবে। অবিন চলে যাবার পর আমার সাবধান হবার কিছু নেই, কিন্তু বেশ বুঝতে পারি, আমার এই পড়ন্ত বয়েসে কিসের এক এলোমেলো বাতাস এসে আমার বিব্রত করে রেখেছে।

প্রথম চিঠিতে অবিন এক জায়গায় লিখেছিল: 'এক সময় আমাদের দেশে মেয়েদের ঢাকঢোল পিটিয়ে সতীদাহ করতে নিয়ে যাওয়া হত, আপনি তাদেরও হার মানালেন। আমার হাতে সমাজের কাঁসরঘণ্টা থাকলে আমিও আপনার জন্যে বাজিয়ে দিতে পারতাম। জয়জয়কার হত আপনার।'

অবিন যে কি বোঝাতে চেয়েছিল তা আমি বুঝেছি। আমায় সে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ যতই করুক আমি আমার জায়গাটুকু ছেড়ে যেতে পারি না। আমাদের এই সংসার আমায় মস্ত এক মিথ্যে সম্ভ্রম দিয়ে আমায় চিতায় তোলার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে আর আমার চারপাশে এ-বাড়ির সংস্কার, সম্মান, ভালমন্দ বোধ, স্নেহ, ভালবাসা ঢাকঢোল পিটিয়ে আমার গৌরব জানাচ্ছে এটা আমি বিশ্বাস করি না। মানুষের নিজের মধ্যে মেকী থাকতে পারে না, যেটা বাইরের সেখানে থাকে। যাদের সঙ্গে আমার এ-জীবন আজ জড়িয়ে গেছে তাদের কেউ আমার বাইরে লোক নয়, সকলেই নিজের। তারা কেন ঢাকঢোল বাজাবে! অবিন এদের স্পষ্ট করে বোঝে নি।

প্রথম চিঠির জবাব আমি ছোট করে দিয়েছিলাম। ভদ্র করে মানুষ যেভাবে মানুষকে দেয়। মুশকিল হয়েছিল অন্য জায়গায়। অবিনকে আমি 'আপনি' করে লিখতে পারি নি, 'তুমি' করেও নয়। সুহাসের কোনো বন্ধুকেই আমি কোনোদিন আপনি করে বলতে পারি নি। অবিন যখন এখানে ছিল তখন আমি কথা বলার সময় খুব সাবধানে সম্বোধন বাঁচিয়ে যেতাম। ওকে 'তুমি' বলতেও আমার সঙ্কোচ হত। তাকে ঘনিষ্ঠ হবার কোনো সুযোগ দিতেই ভয় করত আমার। চিঠির জবাবটাও হল সেইভাবে, তাতে সরাসরি কিছু থাকল না, নিজের কোনো কথাও নয়।

চিঠিটা পাঠিয়ে ভেবেছিলাম অবিন এবার নিরস্ত হবে। তাকে আমার বিশ্বাস ছিল না তবু ভেবেছিলাম।

বেশ কিছুদিন পরে দ্বিতীয় চিঠি এল। পড়ে দেখি, তার অবিনয় না থাক বিনয়টুকুও বেশী নেই। সম্বোধনে 'আপনি'-টুকু সে রেখেছে মাত্র, বাকি যা তাতে তার সেই সর্বনেশে ভাব।

রাগে, ক্ষোভে, লজ্জায় আমার সারাটা দিন কী দুর্ভোগে না কেটেছে। পরে মাথা ঠাণ্ডা হলে ভেবে দেখেছি, যার লজ্জা বলে কিছু নেই, যে দু-কান কাটা, যার মাথার বাহাদুরি দেখাবার ঘটা রয়েছে, বোধবুদ্ধি নেই তাকে আমি কী বোঝাব! সে বুঝেও বুঝবে না। সুহাসরা ঠিকই বলে, অবিন গণ্ডারের মতন একদিকেই গোঁ নিয়ে ছুটে যায়, আশেপাশে তাকায় না। আমার সাধ্য নেই এমন মানুষকে আমি অন্য পথ দেখিয়ে দিই।

অবিনের চিঠির আমি কোনো জবাব দিই নি। তুমি নিজের মাথা নিয়ে যা খুশি করো আমায় পাগল করতে এস না। তোমার কথার চমকে যারা চমকে ওঠে আমি তো তাদের দলে নই। আমি তোমার বন্ধু নয়, আত্মীয় নয়, তোমার...।

আমি চুপ করে থেকেছি। চিঠি দুটোই আমার আলমারিতে পড়ে থেকেছে। তবু এক একদিন আচমকা মনে হয়েছে, কোন্ এক পূর্ণিমার টানে যেন কেমন জোয়ার এসে আমার বুকে ছলাৎ ছলাৎ ঘা দিচ্ছে স্রোতের। তখন আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠেছে। বাগানে দাঁড়িয়ে একা-একা আকাশ দেখেছি, ভাঁড়ার

ঘরে বসে আঁচলের চাবিটা আর খুঁজে পাই নি, বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে নিজেকে কতবার করে সাবধান করে বলেছি, মোহিনী তুমি মরতে যেও না।

তারপর এল অবিনের তৃতীয় চিঠি। মানুষটা আমার কাছে আবার কেমন অন্যরকম হয়ে গেল। এ-অবিন যে আবার অন্যমানুষ। মিথ্যে বলব না, এই চিঠি পড়ে আমার দু-চোখ ভরে জল জমেছিল।

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে ভববাবু বলে একজন আসতেন। জ্যাঠা-মশাই আর বাবার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। বাবারই বন্ধুর মতন, জ্যাঠামশাইকে দাদা বলে ডাকতেন। আমরা বলতাম, ভবকাকা। ভবকাকা ছিলেন রেলের গার্ড, মালগাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হত। এদিকে কোথাও মালগাড়ি এসে আটকে গেলে ভবকাকা আমাদের বাড়িতে এসে জিরিয়ে স্নান খাওয়া করে আবার তাঁর গাড়িতে ফিরে যেতেন। ভবকাকার গার্ডসাহেবের সাজপোশাক ছাড়াও বগলে থাকত গুটোনো লাল সবুজ ফ্লাগ, আর হাতে ঝুলোনো থাকত গার্ডসাহেবের বাতিটা। বিকেলের দিকেটিকে ভবকাকা এলে ফেরার সময় তাঁর বাতিটা নিয়ে আমায় খেলা দেখাতেন। এই ছিল লাল, তারপর হয়ে গেল সবুজ; আবার লাল, আবার সবুজ। আমি খুব অবাক হয়ে, নিবিষ্ট মনে দেখতাম, আর অবাক হতাম। ভবকাকা আমায় বলতেন, নে তুই এবার কর দেখি। আমার ছোট হাতে অতটা শক্তি ছিল না যে আমি রঙ পালটে ফেলি। ভবকাকা চাকরি থেকে ছুটি নেবার পর রাজগীরের দিকে বাড়ি করে থাকতেন, সেখানেই মারা যান।

খুব ছেলেবেলায় ভবকাকার হাতের লণ্ঠনটার রঙ পালটানো আমায় যেমন অবাক করত, অবিনের স্বভাব-চরিত্র এই বয়েসে আমায় যেন সেইরকম অবাক করে। সে যে সত্যি কী, কোন্ স্বভাবের, তা আমার কাছে স্পষ্ট হল না। এখানে এসে প্রথম-প্রথম সে আমায় বার বার চমকে দিয়েছে; আমি তার ভয়ে তটস্থ থেকেছি, তারপর অকারণ ভাবিয়ে মেরেছে; শেষে তার জিবের ধার আমার যখন সহ্য হয়ে এল তখন আমায় কত রকমভাবেই না কুণ্ঠায় ফেলেছে। কলকাতায় ফিরে গিয়েও সে আমায় স্বস্তি পেতে দিল না। প্রথম চিঠিতে তার হাসিঠাট্টা ছাড়াও যা ছিল—তা হল স্তব, যদিও হালকা করে। অবিন নিজেই তাকে স্তুতি বলেছে। সেই অবিন তার দ্বিতীয় চিঠিতে দেখি, মশাল হাতে ডাকাতের মতন বেরিয়ে পড়েছে, তার খেয়ালই নেই ওই আগুনে কে জ্বলল বা কোথায় কার ঘরখানা জ্বলে উঠল। আমি সেই চেহারা দেখে ; এর সাহস তো কম নয়, ওর মত্ততা থামাবে কে! আর তৃতীয় চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে দেখলাম, শচিদার সঙ্গে যেন ওর এক জন্ম-জন্মান্তরের

সম্পর্ক যে শচিদার অসুখে অবিনের ব্যগ্রতার শেষ নেই। চিঠিটা যতবার পড়ি ততবার ভাবি, এ কেমন করে হয়? শচিদার জন্যে আমাদের গোটা পরিবারের যে-সমবেদনা, দুঃখ, উদ্বেগ—অবিন যেন তার চেয়ে অনেক বেশী সহানুভূতি ও বেদনা বোধ করছে। ভবকাকার সেই লণ্ঠনের মতন অবিনকে চোখের সামনে যে-রঙে দেখছিলাম, হঠাৎ দেখি তা বদলে গেছে।

আমি ভাবি, মানুষটা তাহল সত্যিকারের কোন স্বভাবের? আমায় যে অক্লেশে লিখতে পারে : 'খানিকটা আগে কানে এল পালিতবাবুর হাত-রেডিয়োয় 'কপালকুণ্ডলা' পালা হচ্ছে। মেসের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আধখানা চোখ বুজিয়ে বাকি আধখানা জানলার খড়খড়ির গা দিয়ে অন্ধকারে চেয়ে থাকতে-থাকতে দেখি হালদারদের বাড়ির ছাদে আলসে ঘেঁষে আপনি এসে দাঁড়িয়েছেন। ওটা আমার স্বপ্ন, না মায়া না মতিভ্রম তা জানি না। আপনাকে টেনে আনার সুতোটা যেন আমার মনে জড়ানো ছিল: হালদার বাড়ির ছাদ থেকে যখন মোহিনীকে আমার চোখের সামনে টানতে-টানতে নিয়ে এলাম, আপনি আমার স্তম্ভিত অবস্থা দেখে মতিবিবির মতন করেই বললেন, 'কখনও কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই?' আমি, মেসের অবিন, অবিকল নবকুমারের মতন বললাম, 'স্ত্রীলোক দেখিয়াছি; কিন্তু আপনার মতন সুন্দরী দেখি নাই।' শুনে আপনি দু-মুহূর্ত আমায় দেখলেন। তারপর দেখি হঠাৎ উধাও হয়ে গেছেন। আমি হোহো করে হেসে উঠে দেখলাম আমার পাট খোলা জানলার খড়খড়ির গায়ে বাঁধা দড়িতে রমাপতিদার গামছাটা ঝুলছে।'

অবিনের চিঠিতে এইসব কথা পড়লে মাথা ঠিক রাখা মুশকিল। আমার মাথায় আগুন ধরে গিয়েছিল। কী নির্লজ্জ, বেহায়া, অসভ্য ছেলে! আমি কি তোমার মতিবিবি? তুমি যে স্ত্রীলোক সত্যি সত্যি দেখো নি তা আজ আমি বুঝতে পারি। যে স্ত্রীলোক দেখেছে তার চোখ তোমার মতন নয়।

চিঠিটা পড়তে-পড়তে মনে হয়, দ্বিধা করাটা অবিনের প্রকৃতি নয়, দুঃসাহস দেখানোটাই তার স্বভাব। মানুষের বোধ থাকলে সে দ্বিধা করে, যার বোধ নেই অথচ বচনক্ষমতা আছে সে অবিনের মতন সাহসটা বাড়াবাড়ি করে দেখাবে। নয়ত ওই অবিনই কী করে আমায় লেখে যে, 'যে-নদী পাড় ভাঙে না, কূল ভাঙে না, যার বর্ষার জল দুই তীর ডুবিয়ে দেয় না, সে-নদী নিতান্তই মানুষের হাতে কাটা খাল, তার জল আটকাবার কৌশল আছে কারিগরের হাতে. মানুষের ফাঁদে ধরা দেয় নি এমন নদীর দিকে তাকালে তার চরিত্রটা বোঝা যায়। সে স্বাভাবিক। তার জল বাড়লে সে কোনো কিছুকেই রেহাই দেয় না। আপনি নিজেকে অন্যের কৌশলের কাছে ধরা দিয়ে বসে থাকবেন একথা ভাবতে আমার গা রিরি করে ওঠে। সংসারে যে কারা তপস্যা করে আপনাকে এই মর্ত্যভূমিতে এনেছিল পাপী তাপী উদ্ধার করতে তা আমি জানি না। আপনি ভাগীরথী নন, অথচ সেই পুণ্যের লোভে বসে আছেন।'

অবিন যে কতটা স্পর্ধা দেখাতে পারে এইসব কথাগুলোই তার প্রমাণ'

আমার নিজেরই গা রিরি করে উঠেছিল। কাছে থাকলে বলতুম, আমার পুণ্য! আমি বুঝি তুমি তার হিসেব করার কে? আমি কোথায়, কোন্ কৌশলের কাছে ধরা দিয়েছি তার জন্যে আমার যদি দুঃখ না থাকে তবে তোমার এত গরজ কেন? যে-নদী পাড় ভাঙে, তার পাশে তোমার বাড়ি হলে বুঝতে দুঃখটা কোথায় লাগে।

আবার এই অবিনকে দেখলাম, শেষের চিঠিতে একেবারে অন্যরকম। কোথায় তার সেই বেঁকা কথার ধার, নাটুকে ঢঙ, সেই স্পর্ধা! মনে হবে না, এই অবিন আর আগের চিঠির অবিন একই মানুষ। যে-মানুষটা ভাবে, ঘোড়া ছুটলে খুরের শব্দে চারপাশ কাঁপবে তবেই সেটা ছোটার মতন ছোটা হল—তাকেই দেখলাম পায়ের খুর ভোঁতা করে বসে আছে।

অবিন এখানে থাকার সময় আমি তার সঙ্গে শচিদার মেলামেশা খানিকটা লক্ষ্য করেছি। শচিদাকে যে অবিনের খুব পছন্দ হয়েছিল তা আমার মনে হয় নি। বরং শান্তশিষ্ট গোবেচারী শচিদাকে অবিন যখন তার কথা দিয়ে বিঁধত আমার রাগ হত খুব। সুহাসরা হল অবিনের বন্ধু; তারা আর শচিদা এক নয়। সেই শচিদাকে সে অনর্থক জ্বালাবে এটা আমার পছন্দ হত না। কিন্তু অবাক হয়ে দেখতাম, শচিদার সঙ্গে অবিনের আলাপটা জমে উঠেছিল। এটা নেহাতই শচিদার গুণে বলে আমার মনে হত। কোনোদিন মনে হয় নি, অবিন এমন আন্তরিকভাবে শচিদাকে বুঝবে।

শচিদার কথা বলতে গিয়ে অবিন লিখেছে, 'আপনার কাছে প্রথমেই স্বীকার করি, আমি আপনাদের শচিপতিবাবুর ভক্ত নই। তাঁর প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ কিছু নেই, বিরাগও নয়। মানুষটি বড় ভাল, শিষ্ট, সরল। শিষ্টতা, সরলতার ওপর আমার কোনো মোহ নেই। তবু আজ শচিবাবুর জন্যে আমি বিশেষ উদ্বেগ বোধ করছি। মানুষের কাছে মৃত্যু কোনোদিনই সহজ নয়। অন্তত সেই মানুষটির কাছে যিনি বছরের পর বছর শুধু ওই বিষয়টাই চিন্তা করে চলেছেন। মৃত্যুকে ভয় পাওয়া মানুষের স্বভাব, পশুরও সেই একই স্বভাব। কিন্তু শচিপতিকে আমি বোঝাতে পারলাম না, বেঁচে থাকা আরও ভয়ের। উনি বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকার মধ্যে অহরহ যে-ভয় আছে তা বোধহয় কোনোদিন ভেবে দেখার চেষ্টা করেন নি। আপনি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন সে-ভয় আপনার আছে। জ্যাঠামশাইয়ের আছে। সুহাসের আছে। শচিপতিবাবু জীবনের ভয়টাকে এড়াবার জন্যে মৃত্যুর ভয় মাথায় নিয়ে বসে আছেন। এ-ধরনের মানুষকে আমার পছন্দ হয় না। আমি বলি এঁরা হলেন সেই গোত্রের মানুষ যাঁরা দাঁড়িপাল্লার ওজনটা সিধেভাবে করেন না, একদিকে ঝুলিয়ে রাখেন। শচিপতিকে আমি যতটুকু জেনেছি তাতে আমার মনে হয়েছে, তিনি সকালে ঘুম থেকে উঠে মাথার বালিশের তলা থেকে যে-চশমাটা চোখে পরে নেন, সেটা হল ওই মৃত্যুর। শোক, মৃত্যু, ব্যাধি এই তিনের চিন্তা নিয়ে সকালে গাত্রোত্থান করলে জীবনে নাকি অনেক সৎকর্ম করা যায় বলে শুনেছি।

আপনাদের শচিদা বোধহয় রোজই এই ভাবনা মাথায় নিয়ে জেগে ওঠেন; কিন্তু তিনি কোন্ কর্ম করেন তা আমি জানি না। আপনাকে স্পষ্ট করেই বলছি, আমি শচিপতিবাবুর একেবারে উলটো মুখে দাঁড়িয়ে; তিনি যদি পূবদিকে মুখ করে আছেন, আমি তবে পশ্চিম দিকে। ওঁর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, মনেরও মিল নেই। তবু ওই মানুষটিকে কলকাতায় আনাবার জন্যে আমি আপনাদের শরণাপন্ন। আপনি হয়ত ভাববেন, আমার স্বার্থ কোথায়? আমার স্বার্থ নিতান্তই সাধারণ, তার বেশী কিছু নয়। সমান্যমাত্র কর্তব্য বোধ করছি, তার বেশী আর কী!'

অবিন যতই বলুক তার কোনো স্বার্থ নেই, তবু আগাগোড়া চিঠিটা পড়লে বোঝা যায়, শচিদা বাঁচবার কোনো চেষ্টা না করেই সংসার থেকে চলে যাবে এটা তার পছন্দ নয়। এই বোকামির কোনো অর্থ অবিনের কাছে নেই।

আরও অনেক কথা লিখেছে অবিন, আমি তার সবটুকু হয়ত বুঝতেও পারি নি। তবে এটা বুঝতে আমার কষ্ট হয় নি, অবিন যতটা সর্বনেশে ততটাই আবার কোমল। ও হল সেই ধরনের মানুষ যার হাতের কাছে আগুন রাখলে আগুন নিয়েই খেলায় মাতবে, আবার কাদা রাখলে তাই নিয়ে মাটির পুতুল গড়তে বসবে। কী জানি আমি ওই অদ্ভুত মানুষটিকে স্পষ্ট করে বুঝতে পারলাম না।

আমার জীবনে পুরুষমানুষকে আমি তেমন করে চোখ খুলে দেখার সুযোগ পাই নি। তাদের রূপের যে হেরফের আছে এটা আমার খুব বেশী করে জানাও নয়। আমার বাবা ছিল পুরোপুরি গৃহী মানুষ, ঝুঁকি নিয়ে মস্ত করে ব্যবসা ফাঁদতে গিয়ে সর্বসান্ত হলে মানুষ যেমন করে আছড়ে পড়ে, বাবা সেইভাবে আছড়ে পড়েছিল। জ্যাঠামশাই হলেন দেবতার মতন মানুষ, অসীম সহ্য আর স্নেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এখনও। ওঁদের কথা বাদ দিলে যে-পুরুষটিকে আমি প্রথম নিজের মতন করে চোখ মেলে দেখেছিলাম, সে হল শচিদা। আজকের শচিদা সে নয়। আমার সদ্যোযৌবনের মুখে সকালের মতন সে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার রূপ ছিল নির্মল, শান্ত। তার আলোয় তেজ ছিল না; দুর্বল ও স্নিগ্ধ ছিল। আজ এই বয়েসে এসে জীবনের সেই সকাল বেলার দিকে তাকালে মনে হয় ওই বেলাটুকু চোখ চাইতে-চাইতে যেন কেটে গেছে। বুঝতে পারি, ওটা থাকার নয়, রাখারও নয়।

একটা দিনের কথা আমার মনে আছে। শচিদা আর আমি স্টেশন পাড়ার কালীপুজো দেখে ফিরছিলাম। রেলফটক পর্যন্ত দেওয়ালীর আলো ছিল, তারপর রাস্তাঘাট অন্ধকার। দূরে যা বাতি জ্বলছে পথ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

সেবারে কালীপুজোতে বেশ শীত পড়ে গিয়েছিল। আগে কদিন বৃষ্টি-বাদলা গেছে। দুজনে অন্ধকারে হেঁটে-হেঁটে আসছি, আমার খুব শীত ধরে গিয়েছিল। গায়ে আমার গরম কিছু ছিল না। শচিদা একটা চাদর জড়িয়ে

রেখেছিল।

আমি বললাম, "তোমার চাদরটা একটু দাও, শীত করছে।"

শচিদা বলল, "নাও।" বলে তার চাদরটা আমায় দিয়ে দিল।

আমি বললাম, "সবটা কেন, তুমি অর্ধেকটা নাও।"

আমরা এক চাদরে গা ঢেকে দুজনে গায়ে-গায়ে হয়ে ফিরছি, ফিরতে-ফিরতে হঠাৎ কী মনে করে আমি বললাম, "শচিদা, আমরা এখন জোড় না বিজোড়?"

"বিজোড়।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "জোড়।"

শচিদা বলল, "না, বিজোড়।"

আমি বললাম, "ধ্যাত—জোড়।"

আমরা জোড় না বিজোড় করতে করতে অনেক হেঁটে এলাম। ছেলেমানুষীর কি শেষ ছিল! কত কী বলেছি তখন। শেষে শচিদা বলল, "এবার থেকে বাইরে বেরুবার সময় তোমার গায়ের শাল নিয়ে বেরিয়ো, মোহিন।" তখন শচিদা আমায় আদর করে 'মোহিন' বলত।

"কেন?" আমি বললাম।

"যা বলছি তাই করো। এই সব জোড়-বিজোড়ের খেলা আর করা যাবে না।"

আমি তখন বুঝি নি। কয়েকদিন পরে জানলাম, শচিদা আমাদের জোড়ের সম্পর্কটা ভেঙে যাওয়ার কথা জানে।

শচিদার পর আমার জীবনের অন্য যে-পুরুষ এল তার সঙ্গে আমার ছাদনাতলায় চার চোখের মিলন হলেও সেই পুরুষটিকে আর আমার দেখার ইচ্ছে থাকল না। তার কথা মনে এলেও আমার সারা গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

শচিদা, আর আমার এক-সময়ের স্বামী—এই দুই পুরুষকে আমি জীবনে দেখেছি। একজনের জন্যে আমার খানিকটা মায়া আছে, মমতাও আছে—কিন্তু তার বেশী কিছু নেই। অন্যজনের জন্যে আমার কোথাও কিছু নেই। শচিদা অক্ষম পুরুষ, তার না আছে সাহস, না তেজ, না উদ্যম। সে সংসারে এসেছে দুর্বলের মতন। দুর্বলের মতন থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে চিরটাকাল মাথা নুইয়ে থেকেছে। তাকে দেখে মেয়েদের মায়া হতে পারে, মন ভরে না। আর যে-মানুষটার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল তার মতন পুরুষকে আমি কোনো দাম দিই না।

আর এখন দেখছি এই অবিন। এ যে কোন্ ধরনের পুরুষ আমি বুঝতে পারছি না। অবাক হয়ে দেখছি। ওর যেন সবটাই বিচিত্র। আমি তার সম্মানীয়, তবু সে আমায় কমলেশদের মতন সম্মান করে না; তার সম্মানের ধারণাটাই আলাদা। আমায় সে মর্যাদা দেয় অথচ সেই মর্যাদা আমার এতদিনের পাওয়া মর্যাদার মতন এক ধাতুর নয়। তার চোখে আমি বিমুগ্ধ ভাব দেখেছি,

কিন্তু সে আমায় ভান করে স্তব করতে বসে নি। আমি জানি না ওর স্বভাবে কী আছে—?

পুরুষমানুষের মধ্যে একটা স্বভাব আছে যা কোনোদিকে তাকায় না. কর্তব্য প্রেম স্নেহমায়া বোধবুদ্ধি কোনো কিছুই তাদের পথে কাঁটা হয় না; তারা আমার সেই স্বামীর মতন একটা ক্ষিধে নিয়ে জন্মেছে। তাদের মুখে অরুচি বলে কিছু নেই। এরা হল ইন্দ্রের জাত, মেয়েদের সব শান্তি ভেঙে দেয়। এই জাতটাকে আমি ঘৃণা করি। অবিন সে-জাতের পুরুষ নয়। তার চোখে আমি সে দৃষ্টি কোনোদিন দেখি নি।

মাঝে-মাঝে আমার মনে হয়, অবিন যতখানি বেগে ঝড়ের হাওয়ার মতন ছুটে আসে, ততটা প্রলয় করতে পারে না। তার বেগ আছে, কিন্তু নিষ্ঠুরতা নেই। সে দক্ষযজ্ঞ বাঁধানোর মানুষ নয়। তার মধ্যে যেটা খেয়ালিপনা সেটা ভর করলে তাকে কোথায় যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে বলা মুশকিল, কিন্তু অবিন যখন তার মতি ফিরে পায় তখন সে বড় সুন্দর হয়ে ধরা দেয়। শচিদার বেলায় যেমন দিয়েছে।

আজ আমার এক-এক সময় আচমকা মনে হয় অবিন কি সত্যি-সত্যি নির্লোভ-নির্লিপ্ত কোনো পুরুষ? তার মুখে যতটা অবিনয়, মনেও কি তাই? আমি বুঝি না!

অবিনও আমায় বোঝে না। তার বোঝার ঝোঁক আছে, আমার নেই। তবু এই যে সারাদিনের মধ্যে আমি থেকে-থেকে অন্যমনস্ক হয়ে যাই, হঠাৎ কোথাকার এক ভয় এসে আমার বুক কাঁপায়, রাত্রে শুয়ে-শুয়ে অন্ধকারে নিজের জীবন-টাকে বার-বার দেখি, এই যে আমি এতটা রাত করে প্রথম বর্ষার ঝিপঝিপে বৃষ্টির মধ্যে অবিনকে চিঠি লিখতে গিয়েও পারি না—এসবই যেন আমার কী এক লজ্জা হয়ে উঠেছে। দুঃখও। কোথাও এক শূন্য হয়ে যাবার বেদনা-দুঃখ আজ আমার মধ্যে ভরে উঠছে।

অবিন

আজ সন্ধ্যেবেলায় সুহাস এল। সংগে যতীন।

সাদরে অভ্যর্থনা করে বললাম, "এসো এসো; মাথাটা একটু বাঁচিয়ে এসো।"

সুহাস ভেতরে এসে আমার ঘরটা দেখতে লাগল; আর যতীন তার জিরাফের মতন লম্বা গলা আরও লম্বা করে চৌকাটে দাঁড়িয়ে দরজার মাথাটা মাপতে শুরু করল।

ঘর দেখে সুহাস বলল, "এটা তোমার বৈকুণ্ঠ-নিবাসের চেয়ে ভালই হয়েছে অবিন; আর-একটু বড় হলে হাত-পা ছড়াতে পারতে আরাম করে।"

যতীন ততক্ষণে ঘরে এসেছে। বলল, "তোর ঘরের বাইরে একটা লোহার টুপি রাখিস অবিন, এভাবে আর মাথা বাঁচিয়ে ঢুকতে পারব না।"

আমি বললাম, "টুপির দরকার কী! আমি বরং ভাবছি বাইরে একটা বোর্ড ঝুলিয়ে দেব 'মাথা লইয়া সাবধান'। বড়লোকরা বাজে ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা এড়াবার জন্যে কুকুর দেখায়, আমি দেখাব মাথা।"

যতীন বলল, "সেটা আর নতুন কী, ওটা তো তুই বরাবরই দেখাচ্ছিস। ইচ্ছে হয়, আরও দেখাতে পারিস। তবে তোর কাছে এসে ওই জিনিসটা আমাদেরও ঠিক রাখা মুশকিল।"

সুহাসরা হেসে উঠল। আমি হাসলাম।

"অবিন, তোমার এই হোটেলটা আমার খুব কাছাকাছি হল—" সুহাস আমায় বলল, "একটা রিকশা করেও আমার বাড়িতে চলে যাওয়া যায়।" ...বলে একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি গত রবিবারেই উঠে এসেছ?"

"হ্যাঁ। তিন চার দিন হয়ে গেল।"

"কেমন লাগছে?"

"চমৎকার। ওপরের ছাদ দিয়ে একটু আধটু জল চোয়ায়, নয়ত দেখছ না—চিলে কোঠার মতন এই ঘরটা একেবারে ফাঁকায়, দুদিকে ছাদ, আলো বাতাসের ছড়াছড়ি।"

যতীন বলল, "বর্ষায় তো তোর জানলা দরজা দিয়ে জল ঢোকে রে, যা বাহার দেখছি—!"

"ঢোকে, তবে ওসব আমি গ্রাহ্য করি না। তোদের মতন অত জল-বৃষ্টি রোদের খুঁতখুঁতোনি আমার নেই, যতীন। তোরা কলকাতার ফিনফিনে বাবু,

মাথায় রোদ লাগলে পিত্তি বমি করিস, দু-ফোঁটা জল গায়ে পড়লে থ্রোট লজেন্স খাস। আমার ধাতটা আলাদা।"

যতীন চোখ টিপে বলল, "তুই শালা মানুষ নয়, ধাতু।...নে, চা-টা বলে আয়।"

এটা আমাদের সেই মেস নয় যে, ঘরে বসে শুয়ে-শুয়ে হাঁকডাক করে কিছু পাওয়া যাবে! নীচে নেমে চেল্লাতে হয়। দোতলায় ম্যানেজারের ঘর। ভদ্রলোকের পুরো চেহারাটা বুড়ো বুলডগ ধরনের, নাকভরা নস্যি, চোখ দুটো অনবরত ছলছল করে। দাঁতের বাঁধানো পাটি দুটো দেখি জলের গ্লাসে ডোবানো থাকে। কথা বলার সময় ভাঙা গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলেন ভদ্রলোক, জিবের লালায় যেন জড়ানো থাকে অর্ধেক কথা। আমার আদপেই বরদাস্ত হয় না ম্যানেজারকে। হোটেলের মালিকের সঙ্গে ঘটনাচক্রে পরিচয়ের সুবাদে ওপরের ঘরটা আমি পেয়ে গিয়েছি এতেই আমার খুশী থাকা উচিত। সেই খুশী নিয়ে রয়েছি আপাতত। ম্যানেজারকে আমল দিই না।

তেতলায় নামতে ভানুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাকে চায়ের কথা বলে ওপরে ফিরে এলাম।

ফিরে এসে দেখি, সুহাস আমার ক্যাম্বিসের চেয়ারটায় বসে, যতীন বিছানায় পিঠ টান করে শুয়ে পড়েছে।

আমার এই নতুন ঘরটা লম্বায় মাঝারি, চওড়ায় কিছুটা ছোট। গোটা তিনেক জানলা, একটু বেঁটে-খাটো বেখাপ্পা ধরনের জানলার পাল্লায় অ্যাসবেসটাসের সিট আঁটা। মাথার ছাদটা কড়ি বরগার। বাইরে অনেকটা খোলা জায়গা, ছাদের অন্য পাশে জলের ট্যাঙ্ক, টিনের শেড করা হোটেলের একটা গুদোমখানা মতন।

আমি ঘরে ঢুকতে সুহাস বলল, "হোটেলটার নীচে দেখলাম দোকান?"

"নীচে দোকান; দোতলা-তেতলায় বোর্ডার; ছাদের চিলে কোঠায় আমি। সর্বোচ্চে অধিষ্ঠান করছি।" বলে হাসলাম।

"কত লোক থাকে?"

"জনা ত্রিশবত্রিশ হবে। সবাই পার্মানেন্ট বোর্ডার।"

"তোকে কত দক্ষিণা দিতে হয়, অবিন?" যতীন জিজ্ঞেস করল।

"প্রায় একশো পঁচাত্তর।"

"বলিস কী! ...হোটেল ছেড়ে দে অবিন, আমার বাড়িতে চলে আয়—তোকে পেয়িং গেস্ট করে রাখব।"

কয়েকটা এলোমেলো হালকা কথার পর সুহাস বলল, "শোনো অবিনবাবু, তোমায় যে-খবরটা দিতে এলুম—, কাল জ্যাঠামশাই আসছেন।"

"কাল?"

"শচিদা, আয়না, জ্যাঠামশাই—; দল বেঁধে আসছে।"

মেস ছেড়ে চলে আসার আগে আমি জ্যাঠামশাইয়ের চিঠি পেয়েছিলাম।

তিনি আসবেন জানিয়েছিলেন। কবে নাগাদ আসতে পারবেন সঠিক করে জানাতে পারেন নি। মোহিনীর চিঠি পেয়েছিলাম তারও পর। তিনিও নির্দিষ্ট করে কিছু জানাতে পারেন নি। লিখেছিলেন, জ্যাঠামশাইরা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি আসবেন।

সুহাস বলল, "কাল বিকেলে আমায় হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে। তারপর লটঘট নিয়ে আসা, বেশ ঘাবড়ে যাচ্ছি।"

যতীন বলল, "সংসারধর্ম না করলে এই রকমই হয়। তুই তিনটে অ্যাডল্ট লোককে সামল্যতে পারিস না, আর আমরা বউফউ বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে যত্রতত্র ঘুরি, কত বায়নাক্কা সামলাই। সংসারের ঝামেলা সামলাবার একটা ট্রেনিং নে সুহাস; বিয়েটা করে ফেল, দেখবি সাগর লঙ্ঘনের মতন শক্ত কাজটাও করে ফেলতে পারবি।"

আমি হেসে বললাম, "হনুমান কি বিয়ের পর সাগর ডিঙিয়েছিল?"

"সে আর বলতে! হনুমান তো ছেলেমানুষ! রামের মতন সাধাসিধে মানুষটাকে লঙ্কা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে লড়াই বাধাবার কোনো দরকার ছিল না। বিয়ে না করলে বেচারীকে রাবণের সঙ্গে অমন লড়াইটাই লড়তে হয় না। সাতকাণ্ড রামায়ণ দু-তিনটে কাণ্ডতেই শেষ করে ফেলা যায়। অথচ য্যায়সা বিয়ে ত্যায়সা বউয়ের বায়নাক্কা। নে শালা, বনবাসে নিয়ে চল। বুঝলি অবিন, বিয়ে করলেই কাণ্ড বাড়ে।"

"বুঝলাম," আমি হেসে বললাম। "কাণ্ডটাই বাড়ে, জ্ঞানটা নয়।" সুহাসও হাসল।

একটু পরেই চা এল। চায়ের সঙ্গে কিঞ্চিৎ খাদ্য।

চা খেতে-খেতে সুহাস বলল, "অবিন, কাল থেকে আমার নানা ঝঞ্ঝাট বাড়ল। এর খানিকটা দায় তোমায় বইতে হবে। তুমি চারদিক থেকে ঝামেলা টেনে এনে জড় করেছ, মাইণ্ড দ্যাট।"

আমি বললাম, "তুমি শচিবাবুর কথা বলছ?"

"আবার কার কথা বলব?"

"বেশ তো, আমি হাওড়া স্টেশনে যাচ্ছি।"

"তারপর?"

"তারপর কী?"

"আপাতত শচিদা আমার ওখানে এসে উঠল। কিন্তু তারপর?"

"একটা হাসপাতালের খোঁজ আমিও পেয়েছি।"

"যতীন অন্য কথা বলছে। কী যতীন?" সুহাস যতীনের মুখের দিকে তাকাল।

যতীন মুখের খাবার শেষ করে বলল, "প্রথমেই হাসপাতালে ঢুকিয়ে দিলে ভদ্রলোকের হয়ত নার্ভ ফেল করবে। আমি বলছিলাম, একজন কাউকে দেখানো হোক, বড় ডাক্তার কাউকে। অমিয়র দাদাকেও আনা যেতে পারে।

আমারও চেনাশোনা একজন আছেন। বুড়ো মানুষ। খানিকটা খেপাটে ধরনের।, কিন্তু ভেরী গুড ফিজিশিয়ান। চেহারাটাও বেশ সৌম্য। পেশেন্টের কনফিডেন্স হয়।"

"বাড়িতে কী ব্যবস্থা হবে?" আমি বললাম।

যতীন বলল, "না হবার কিছু নেই। আমি যা শুনছি তাতে হুড়মুড় করে একটা লোককে কলকাতায় এনে হাসপাতালে ঢুকিয়ে দেওয়াটা ভুল হবে। ডাক্তার দেখুক, ক্যানসার বললে, ক্যানসার হয় না। লেট দি ডক্টর সী অ্যান্ড জাজ্...। যদি ডাক্তার মনে করে ইমিডিয়েট, তাহলে হাসপাতালে ভরতি করো, আগেভাগে কেন একটা আধমরা লোককে চিতায় চড়াতে যাচ্ছ?"

যতীনের সাংসারিক বোধ বুদ্ধি প্রখর। তার মাথা ঠাণ্ডা। ভেবেচিন্তে কাজ করাই তার স্বভাব। যতীনের কথায় আপত্তি করার মতন কিছু নেই। আমি সুহাসের দিকে তাকিয়ে বললাম, "যতীন তো ঠিক বলছে।"

যতীন বলল, "হাসপাতালের জন্যে ভাবনা কী! সুহাস মোটামুটি একট অ্যারেঞ্জমেন্ট করেই রেখেছে।"

"কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

যতীন কিছু বলল না, শুধু সুহাসকে আড়চোখে দেখিয়ে দিয়ে মুচকি হাসল।

সুহাস বলল, "আমার বাড়ির উলটো দিকে একজন মেয়ে-ডাক্তার থাকেন। তাঁর সঙ্গে অ্যাকসিডেন্টালি আলাপ হয়েছিল একদিন। মাঝে-মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁকে বলেছিলাম একবার, ডিরেক্টলি ঠিক নয়, ইনডিরেক্টলি।"

চায়ে চুমুক দিয়ে যতীন ঠাট্টা করে বলল, "সুহাসের অর্ধেকটা জীবন ইনডিরেক্টলি করে-করেই কেটে গেল, অবিন। আমি বলি, লেডী ডাক্তারটির নাম ইন্দু, মিস ইন্দুমতী হালদার। বাঙালী কৃশ্চান। দেখতে ভাল, কিন্তু শ্বেতীর দাগ আছে। সুহাসকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে চা খাইয়েছে। ইন্দুমতী সদ্য ডাক্তারী পাশ করে হাসপাতালে হাউস সার্জন হয়ে আছে। কোন ডিপার্ট-মেন্টে রে সুহাস?"

সুহাস হেসে বলল, "জেনারেল ওয়ার্ডে।"

"ওখানে বেশিদিন থাকবে না; পার্সোন্যালে চলে আসবে।"

আমরা হেসে উঠলাম।

যতীন সিগারেট ধরাল। আমরাও সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

সুহাস বলল, "আমি সত্যি বলছি ভাই শচিদাকে ফেস করতে আমার কেমন ভয় করছে। সাম হাউ আমার মনে হচ্ছে, মানুষটা যেখানে ছিল সেখানেই বাকি ক'টা দিন শান্তিতে থাকতে পারত। কলকাতায় টেনে এনে হয়ত ভুল করলাম।"

আমি বললাম, "সুহাস, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই বোকার মতন কোনো কিছু না জেনেই মরে; জানলে তাদের মরা কিছুটা আটকাত;

অজ্ঞতা জিনিসটাকে আমরা আশীর্বাদ বলে ধরে নিয়ে যতটা আত্মতৃপ্তি পাই ততটা তৃপ্তি পাবার কোনো কারণ নেই।"

সুহাস আমার কথাটা ভাল করে শুনল না, নিজের মনেই বলল, "একদিকে শচিদাকে নিয়ে ডাক্তার-হাসপাতাল, অন্যদিকে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে চিন্তা; আমার মাথাটাথা খারাপ হয়ে যাবে। এসব কাজ আমি জীবনে কোনোদিন করি নি। আমার ভাল লাগছে না।"

সুহাস যে সংসারের কোনো দায়-দায়িত্ব কাঁধে নেয় না, তা আমি জানি। ঝঞ্ঝাটকে ও বরাবর এড়িয়ে থাকতে চায়। শচিবাবুকে নিয়ে তাকে কত না হুজ্জোত-হাঙ্গামা পোয়াতে হবে, জ্যাঠামশাইকে নিয়ে কী পরিমাণ উদ্বেগ বোধ করতে হবে—যতই সুহাস এইসব ভাবছে ততই তার ভয় বাড়ছে।

আমি হেসে বললাম, "তুমি কিছুই করবে না, তুড়ি মেরে দিন কাটাবে—তা তো হয় না সুহাসবাবু; সংসারের জ্বালা একটু-আধটু বোঝ।"

আমার কথায় সুহাস যে চটে গেল তা নয়, তবে রাগের মতন করে বলল, "লেকচার মেরো না; তুমি আমায় রেসপনসিবিলিটি শেখাবে? মোস্ট ইরেসপনসবল ম্যান......"

আমি হেসে ফেলে বললাম, "আমার তো ভাই সংসার নেই। আমি একলা।"

যতীন বলল, "তোর বাগাড়ম্বরটা তাই বেশী।"

আমি বললাম, "আড়ম্বর জিনিসটা সকলকে মানায় না, যতীন; বড়কেই মানায়। যেমন দেখ বর্ষার মেঘ। যখন আসে তখন তার আড়ম্বরখানা দেখেছিস! ওটা সেইরকম। আমায় মানায়।"

"তুমি কে হে হরিদাস?"

"আমি অবিন। তোর যদি বুদ্ধি বলে কিছু থাকত দেখতে পেতিস, জাত বলে একটা কথা আছে; তোরা হলি বেগুনের জাত, মাথায় বাড়বি না, দামে চড়বি না, মাঠে ঘাটে মাটি কুপিয়ে তোদের চাষ হবে। আমার জাত আলাদা। আমি রেয়ার স্পেসিসের মধ্যে। হাটেবাজারে আমায় পাওয়া যায় না।"

যতীন মুখ খারাপ করে বলল, "শালা, রেয়ার স্পেসিস্।"

তিনজনেই হেসে ফেললাম।

আরও দু-পাঁচ কথার পর যতীন উঠল। সে বেহালার দিকে থাকে। রাত হয়ে আসছে। বৃষ্টি আসারও সম্ভাবনা রয়েছে। বাইরে মাঝে-মাঝে বিদ্যুত চমকাচ্ছিল। যাবার সময় যতীন বলে গেল, কাল সে খোঁজ নেবে সুহাসের। যদি ঠিক করে ফেলা যায় তবে সে তার চেনাশোনা বড় ডাক্তারের খোঁজ খবর করে পরশু দিনই তাঁকে সুহাসের বাড়িতে আনতে পারে।

যতীন চলে যাবার পরও সুহাস আবার একটা সিগারেট ধরাল। বলল, "বাড়ি ছেড়ে সবাই চলে আসছে; একলা দিদি থাকবে আমার ভাল লাগছে না।"

শচিপতিকে কলকাতায় পাঠাতে বলার পরিণাম যে এমন দাঁড়াবে আমিও

আগে বুঝিনি। পরে জ্যাঠামশাইয়ের চিঠি থেকে বুঝেছি, তিনি আসছেন নিজের তাগিদে। শচিপতিকে একা পাঠাতে তাঁর ভরসা হয়নি। আয়না তাঁর সঙ্গে আসতে পারে লিখেছিলেন, কিন্তু ওর বিয়ের ব্যাপারে আসছেন তা আমায় লেখেন নি। মোহিনীর চিঠিতে বরং তার উল্লেখ যেন দেখেছি।

আমি বললাম, "সুহাস, জ্যাঠামশাই আয়নার বিয়ের ব্যাপারেও কিছু কথাবার্তা বলতে চান নাকি?"

সুহাস আমার দিকে দু-মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়ল। "জানি না।"

"জান না?"

"ও আর হবে না," বলে সুহাস অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বসে থাকল। তার বাঁ হাতটা চেয়ারের মাথার দিকে হেলানো। ওকে অন্যমনস্ক, ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছিল।

আমি বললাম, "যতীন কী বলল?"

"যতীন কী করবে! ওর নিজের ব্যাপার নয়। ওর ফ্যামিলি হলেও কথা ছিল তবু বেচারী অনেক চেষ্টা করেছে; তার পিসিমাকে বুঝিয়েছে। ভদ্রমহিলা রাজী হচ্ছেন না।" সুহাস কেমন বিরক্ত হয়ে চুপ করে গেল। বসে থাকতে-থাকতে আবার একটা সিগারেট খেল। "আমি তো যতটা সম্ভব খোলাখুলি জ্যাঠামশাইকে সবই লিখেছি। ওর বেশী কিছু লেখা যায় না। আফটার অল চিঠির ব্যাপার কোনো রকমে দিদির চোখে পড়লে অবস্থাটা কী হবে বুঝতে পার?"

না বোঝার কারণ নেই, বুঝতে পারি। সামান্য চুপচাপ থেকে বললাম. "যতীনের সেই পিসতুতো ভাই কী বলে?"

"সে কী বলবে?"

"বিয়েটা সে করবে। তার মতটাই আসল।"

সুহাস বিরক্ত হয়ে বলল, "জানি না তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।...ওকে আমার দরকারটাই বা কিসের?"

আমি বললাম, "ও যদি রাজী থাকে তবে বিয়েটা হতে পারে।"

সুহাস অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। "মানে?"

"বিয়েটা ও করে ফেলুক।"

"অবিন, তামাশা করো না।"

"না, তামাশার কী দেখলে! ছেলেটা যদি বিয়ে করতে রাজী হয়ে থাকে— তবে তাকে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে দাও।"

"তারপর?"

"তারপর আবার কী!"

"ওর বাড়ি নেই। মা, দাদা নেই? বিয়ে করে বউ নিয়ে কি তাঁবু খাটিয়ে থাকবে? তুমি যে কী রাবিশ বলো অবিন!" সুহাস রীতিমত বিরক্ত ও অবাক হচ্ছিল।

আমি হেসে বললাম, "দেখো সুহাস, আমি তোমাদের এই বিচিত্র সমাজ আর সামাজিকতা বুঝি না। যতীনের ভাই যদি বিয়ে করতে রাজী হয়ে থাকে তবে তাকে ডেকে বলো। এ-রকম বিয়ে আজকাল হয় না? কান্তি সেদিন করল না এরকম বিয়ে? তবে? ওর মা দাদাকে নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাবার কিছু নেই।" বলে আমি একটু চুপ করে থেকে সুহাসের ভাবগতিক লক্ষ্য করলাম। সে আমার কথাগুলো গ্রাহ্য করছিল না। তার বিরক্তি দেখে বললাম "কথাটা আমি হালকা করে বললাম বলে তুমি ভাবছ, আমি ঠাট্টা করছি। তাহলে তোমায় সত্যি করে বলছি, ব্যাপারটা আমার যদি হত, আমি ছেলেটাকে সরাসরি ডেকে বলতাম, কী হে আমার বোনকে বিয়ে করতে রাজী? সে যদি বলত, রাজী, তবে তার মা মাসি দাদার মুখ চেয়ে আর বসে থাকতাম না। বিয়েটাকে তোমরা বারোয়ারী পুজোর মতন করে তুলেছ। বারভূতে না নাচলে তোমাদের বিয়ে হয় না। সেখানে ছেলেমেয়ের ব্যাপারটা চাপা পড়ছে; তাদের পরিবারের মা পিসি বাবা দাদার দিকেই তোমাদের চোখ। লোক জড়ো করার এই তামাশা আমার পছন্দ হয় না।

সুহাস অসন্তুষ্ট হয়ে হাত নেড়ে বলল, "তুমি ফ্যামিলির মধ্যে থাকো নি অবিন; তুমি বড় সংসারের মধ্যে মানুষ হয়ে ওঠো নি। একলা থেকেছ, একলা বড় হয়ে উঠেছ, তুমি আমাদের সমাজের পরিবারের ব্যাপারটা বুঝবে না।"

"বুঝব না?"

"না। তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। বিয়েটা ব্যক্তিগত হতে পারে; কিন্তু সংসারের মধ্যে তার জায়গা। আলাদা করে আমি ওটা ভাবতে পারি না। আমার মা জ্যাঠাইমা, বাবা জ্যাঠামশাইকে আমি না দেখলে কথা ছিল...!"

ওকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, "তোমাদের মতন মানুষকে নিয়ে বড় মুশকিল, সুহাস। আমি কী বলছি সেটা তুমি বুঝছ না। যতীনের ভাই যদি এই বিয়েতে রাজী হয়ে থাকে তবে তার মার আপত্তির জন্যে এখন অরাজী হওয়াটার মানে কোথায়?...যাক্ গে, আমার অন্য কথা শোনো; আমি বলব, এই বিয়ে তোমরা দিও না।"

সুহাস তর্কের সুরে বলল, "কেন?"

"কেন দেবে! যে-পরিবারের লোকজন তোমাদের গোড়াতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, তারা তোমাদের বিশ্বাস করবে না। ওদের মনে নানান সন্দেহ ফেনাচ্ছে, সেটা যে বাড়বে না এমনও নয়। সে-বাড়িতে আয়নাকে কেন দেবে? তুমি কি জোর করে বলতে পার—এই অশান্তি আয়নাকে বরাবর ভোগ করতে হবে না!"

সুহাসের চোখমুখ দেখে মনে হল এবার সে আমার কথা শুনছে। চুপচাপ বসে থেকে বলল, "আমারও নিজের ইচ্ছে নেই আর। আমি যতীনকে সব বলেছি। একদিন ওর সঙ্গে ভদ্রমহিলার কাছে গিয়েছিলাম। ভাল লাগে নি।

উনি বোধ হয় আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না।"

"সেটাই স্বাভাবিক। ওঁরা হলেন বিশুদ্ধ হিন্দু সমাজের মেয়ে, গোবর জল ছিটিয়ে সংসারকে শুদ্ধ করতে জন্মেছেন।"

"কিন্তু জ্যাঠামশাই—! উনি যদি সত্যিই ছেলেদের বাড়িতে দেখা করতে যেতে চান?"

"যাবেন না।"

"যাবেন না?"

"যাওয়া উচিত হবে না। তুমি ওঁকে সব বুঝিয়ে বলো।"

"বলব! কিন্তু জ্যাঠামশাইকে মাঝে-মাঝে আমার কেমন মনে হয়, অবিন; উনি যেন আজকাল বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বাবা মারা যাবার পর থেকে আরও এটা দেখছি। কী জানি হয়ত মাথা নোয়াতে তাঁর আটকাবে না।"

"আটকাবে। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না, জ্যাঠামশাই আয়নাকে ঠিক ওই জন্যে কলকাতায় আনছেন। আয়না কলকাতায় আসবার জন্যে মাঝে মাঝে আমাকেও বলত। হয়ত ক'দিনের জন্যে বেড়াতে নিয়ে আসছেন। কিন্তু সেটা ওখানে বলা যেত না বোধ হয়। খানিকটা লুকোচুরি বুড়ো বয়েসে তাঁকে খেলতে হচ্ছে সুহাস, উপায় কী! কেন, তা তুমি জানো।"

সুহাস বিষন্ন মুখে বসে সিগারেটটা শেষ করল। আবার চুপচাপ। হাই তুলল ছোট করে। তারপর গা তুলে বলল, "আমি যখন আমাদের পরিবারের কথা ভাবি অবিন, কেমন যেন হয়ে যাই। অদ্ভুত এক অবস্থা হয়েছে আমাদের। কোথায় যেন এসে আটকে গিয়েছি। দিদি, আমি, আয়না—সকলেই। জ্যাঠামশাইও কিছু করতে পারছেন না। পারবেন না। আমরা যে কোথায় আটকে গেলাম—তোমায় বোঝাতে পারব না।"

আমি কোনো কথা বললাম না। সুহাসকে এখন বিষণ্ন দেখাচ্ছিল, যেন সত্যিই ও কোথাও আটকে পড়েছে।

"তুমি কিছু বলতে পার?"

"আমি কি পারব, সুহাস! তবু বলি। আমার মনে হচ্ছে, তোমাদের পরিবারের মধ্যে একটা ক্ষয় এসে দেখা দিয়েছে। যাকে চলতে হয় তাকে ক্ষইতে হয়। তোমরা এই সত্যিটা স্বীকার করত চাও না। আমার রামদাস বলত, ধুতিকোর্তা পরনে থাকলে তা দিনে-দিনে জীর্ণ হবে, তারপর ছিঁড়ে খুঁড়ে ফালা ফালা হবে। জগতের এই ক্ষয়ের হিসেবটা মাথায় না রাখলে আফসোস করতে হয়। যদি ওটা মানতে পার, দুঃখ থেকে খানিকটা বাঁচবে।"

সুহাস আমার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মুখ ফিরিয়ে নিল। তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কানে গেল।

সুহাস শেষে উঠে দাঁড়াল। বলল, "চলি। কাল তুমি আসছ তাহলে!"

"যাব। নিশ্চয় যাব।"

"হাওড়া স্টেশনেই আসবে। ওই যে-ট্রেনটায় তুমি ফিরেছিলে, সেইটেতে

ওরা আসছে।”

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি আকাশের কোণে বিদ্যুতের চমক আরও বেড়েছে ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে।

সুহাস বলল, “যেতে-যেতে বৃষ্টি এসে যাবে না তো?”

আমি বললাম, “আসতে পারে।”

সুহাসকে হোটেলের নীচে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আবার যখন উঠে এলাম, মনে হল খোলা ছাদে অন্ধকারে আমায় যেন কেউ ডাকল। তাকিয়ে দেখলাম না। ডাকটা কানে শুনতে পাবার মতন নয়। মোহিনী আমায় যখন ডাকেন—এমন করেই ডাকেন।

মোহিনী আমায় কেন স্মরণ করেছেন বুঝতে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না। আমি হলাম সেই দাগী চোর, কোতোয়ালিতে ডাক পড়লেই যে বুঝতে পারে কোথাও কিছু খোয়া গিয়েছে। মোহিনীর সামনে হাজির হতেই তিনি ভর্ৎসনা করে বললেন সুহাসের কানে এই সব কুমন্ত্রণা দেওয়া তিনি পছন্দ করছেন না। ‘কে বলেছে আমাদের পরিবারের মধ্যে ক্ষয় ধরেছে? ওটা মিথ্যে কথা, মনগড়া কথা।’

মোহিনীর ক্ষুব্ধ মূর্তিটি আমি স্পষ্টই যেন মনে-মনে দেখছিলাম। কোতোয়ালিতে চোরদের হাসতে নেই; বিনয় করে বললাম, অপরাধ মার্জনা করুন, আপনারা অক্ষয়।

রাগ করে মোহিনী যেন আমার সামনে থেকে তরতরিয়ে চলে গেলেন। ছাদে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বাতাসের ঝাপটা খেতে খেতে আমি মোহিনীর উষ্মাটুকু অনুভব করলাম। আকাশটা কালো করে মেঘ জমেছে; বিদ্যুত চমকাচ্ছে ক্ষণে-ক্ষণে; আশেপাশের বাড়ির খোলামেলা জায়গায় আলোগুলো যেন মুখ বাড়িয়ে বর্ষা আসার অপেক্ষা করছে।

ঘরে ফিরে দেখি বাতিটা দপদপ করছে। সামান্য সময় নিববে, কি নিববে না, করে বাতিটা নিজেকে সামলে নিল। আমি ক্যাম্বিসের চেয়ারটায় হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে শুয়ে পড়লাম।

জগতে এক ধরনের নির্বোধ থাকে যারা কোনো কিছু হারাতে রাজী নয়। স্বাভাবিকভাবে যেটা যায় তাও তারা হারাতে চায় না। এরা হল কথাসরিৎসাগরের সেই মূর্খ রাজার মতন—যে যথাসাধ্য ভোগ-সুখ করেও বয়সকালে ভেবেছিল ভোগের জন্যে যৌবনটাকে ধরে রাখার নিশ্চয় কোনো পার্থিব উপায় আছে। যেটা সত্য সেটা সে বিশ্বাস করে নি, যা মিথ্যে তা বিশ্বাস করে এক শঠের

হাতে পড়েছিল। এমন মূর্খের ভাগ্যে যা জোটার তাই জুটেছিল, সে না পেয়েছিল নব-যৌবন না প্রবীণত্বের সান্ত্বনা। যযাতিও যৌবন-ভিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে মূর্খ বলি না, মানুষের ভোগের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার জন্যে কবি তাঁকে অকালে জরাগ্রস্ত করেছিলেন। কাব্যের কৃপায় যতটা ভোগসুখ যযাতির বেড়েছিল তা না বাড়লেও বিশেষ কোনো ক্ষতি ছিল না। সত্য হিসেবে তাঁর ভিক্ষাটুকুই বেঁচে আছে—বাকিটুকু নেই।

মোহিনীকে আমি বুদ্ধিমতী বলেই মনে করি। কিন্তু অনেক সময় তিনি বুদ্ধিকে শাসন করে চলেন। ফলে বুদ্ধিটা আর মাথা তুলতে সাহস পায় না। সুহাসকে আমি যখন বললাম, তাদের পরিবারের মধ্যে ক্ষয় ধরেছে তখন সুহাস চমকে ওঠে নি, আপত্তি জানায় নি, চুপ করে শুনেছিল। সে যে এ-সব কথায় দুঃখ পায় তা আমার অজানা নয়। তবু আমার কথায় নতুন করে তার দুঃখ জাগে নি, এ-দুঃখ সে যেন আজকাল বোধ করে। সুহাসকে যখন আমার অভিমতটা বলছি, তখনই আমার মনে মোহিনীর উদয় ঘটেছিল। আমি জানতাম, কথাটা মোহিনীর কানে উঠলে তিনি না-না করে ছুটে আসবেন।

মোহিনী সাধারণ একটা কথা বুঝতে চান না। যা গড়ে তোলা যায় তার গড়ন একটি নিজস্ব আকার পেলেও গড়নের মধ্যে নানাদিকে নানান কারিকুরি থাকে। অমন যে মাটির প্রতিমা তার মধ্যেও এই কারিকুরি। যন্ত্রের বেলায় এটা যেমন উন্মুক্ত, নেহাত অন্ধেও দেখতে পায়, মানুষের বেলায় তা নয়। সুহাসের ঠাকুরদা অনেক সাধ করে যে-পরিবার গড়ে তুলেছিলেন সেটা নেহাত ইটকাঠের আশ্রয় নয়। তিনি হয়ত ভেবে দেখেন নি, তাঁর দুই ছেলে, ছেলের বউ, নাতি নাতনীদের নিয়ে যে-পরিবার গড়ে উঠবে তাতে প্রত্যেকটি মানুষের একটি নিজস্ব সত্তা থাকবে; কেউ হবেন জ্যাঠামশাই, কেউ হবেন সুহাসের বাবা; সেখানে সুহাসের মণিমা যেমন থাকবেন, তেমনই থাকবেন মোহিনী। মানুষ তো আর কড়ি বরগা নয় যে তাকে মাপ মতন কেটে যে-বাড়িতে বসানো হবে সেখানেই সে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকবে। মানুষ তার নিজের মতন বাড়ে। নিজের মতন সরে যায়, নিজের মতন কাছে আসে। মোহিনীদের পরিবারে যাঁরা ছিলেন, যাঁরা এখনও রয়েছেন তাঁদের চার কোণে খুঁটি করে বসিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার যত চেষ্টাই থাক—ভেতরে-ভেতরে এদের প্রত্যেকের নিজের সত্তার চাপে মাটিতে অনেক আগেই চিড় ধরে গিয়েছিল। সেটা যে আরও বাড়ছে এটা মোহিনীরা দেখতে চান নি। এখনও চান না। তাঁকে এ-কথাটা বোঝানো মশুকিল, সংসারের ভাঙনটুকু তার ছাদের তলাতেই লুকিয়ে-লুকিয়ে বেড়ে ওঠে।

একদিন কথায়-কথায় মোহিনীকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনারা সবাই মিলে যে-জিনিসটা ধরে রেখেছেন সেটা কী?"

মোহিনী বুঝতে পারেন নি। অবাক চোখ করে তাকিয়ে ছিলেন।

আমি বলেছি, "আপনাদের এই বাড়িটার ভিত থেকে শুরু করে তার

যতগুলো দেওয়াল সব ওই ছাদটাকে মাথার ওপর ধরে রেখেছে। কিন্তু আপনারা, এই ক'জন মিলে কোন জিনিসটা ধরে রেখেছেন আমার বলুন তো?"

মোহিনী আমার কথায় সন্তুষ্ট হন নি। বলেছিলেন, "ওটা আমাদের বলার কথা নয়।"

"তবু শুনি।"

"সুহাস বলবে। আমি জানি না।"

মোহিনী আমাকে এড়াতে চাইছিলেন। না এড়িয়ে তাঁর কোনো উপায় ছিল না; আমি জানি তিনি আমায় স্পষ্ট করে কোনো জবাব দিতে পারতেন না। আমরা অনেক কিছু না জেনেও জানার মতন গ্রহণ করি। মোহিনী তাঁদের পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি, আভিজাত্য, মর্যাদা, তাঁদের পরস্পরের প্রতি স্নেহপ্রীতির বন্ধনকে অশেষ মূল্য দেন। আমি বলি না, তার কোনো মূল্য নেই; কিন্তু ভাবের ঝোঁকে ঠাকুরের পায়ে বেশী মূল্য ধরে দিলেই দেবতার মূল্য বাড়ে না। মোহিনীদের পারিবারিক বন্ধনের পাশাপাশি যে-কয়েদখানা তৈরী হয়ে গিয়েছে তার দিকে তাঁর নজর দিতে আপত্তি কেন? মানুষ হিসেবে তাঁরা কে কতটা খর্ব হয়েছেন, হচ্ছেন এই হিসেবটা কোথায়? হিসেবটা মোটামুটি করে ধরলেও মোহিনী বুঝতে পারতেন, যাদের নিয়ে এই পরিবার—সেই মানুষগুলির পৃথক-পৃথক চরিত্র থেকে স্বাভাবিক একটা বিরোধ এসেছে। সেটাকে জোর করে বরাবর অস্বীকার করা যায় না।

আমি এই ঢাক-পেটানো সভ্যতার সঙ্গে নেচে বেড়াই না। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমার ঝগড়াটা এইখানে। তারা আমায় বোঝাতে চায়, মানুষ লাফ মেরে মেরে কতটা এগিয়ে এল আমি নাকি সেটা চোখে দেখেও স্বীকার করতে পারি না। আমি তাদের স্পষ্টই বলি, জগৎসুদ্ধ মানুষের যদি লাফাবার ক্ষমতা থাকত তবে আমার কথা ছিল না; দু-দশটা মানুষ পা তুলে লাফাতে পারে, বাকিগুলো হয় খোঁড়া না হয় বেতো, তারা পা সোজা করে হাঁটতেই পারে না, দশটা লোকের লাফ নিয়ে জগৎসুদ্ধকে লম্ফবান ভাবলে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। তোমাদের দু-একটা বুদ্ধ যীশুকে দেখিয়ে সবই যদি বুদ্ধত্ব চাও তবে আমি নাচার। বুঝলে যতীন, সক্রেটিস হাসিমুখে বিষ খেয়েছিলেন বলে তুমি, বিপিন—সব্বাই তোমরা নীলকণ্ঠের বংশ নাকি? তাহলে বলব, তোমরা মহা ভণ্ড।

এই ভণ্ডামি নিয়েই সংসারটা চলে আসছে। মানুষের দৌড় শুরু হবার পর যে-দু-পাঁচ বা দশজন বড় রকম দৌড় দিয়ে ছুটে অনেকটা চলে যেতে পারল তারা সাধারণের মধ্যে নয়, ওরা অসাধারণ—মানুষ হয়েও অতি-মানুষ, সুপারম্যানদের গোত্র। সেই সেই অতি-মানুষদের নিয়ে এই সাধারণ মানুষের বিচার করো না। সাধারণরা তাদের হামাগুড়ি-পর্ব এখনও শেষ করতে পারে নি।

বন্ধুদের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে আমি এই কথাটা বারবার বোঝাতে চেয়েছি।

আমার বিশ্বাস, আমাদের একটা বড় অনর্থ এইখানে ঘটে যাচ্ছে। সুহাসকে সেদিনও বলেছি, আমরা যাকে সভ্যতার মস্ত-মস্ত কীর্তি বলি সেগুলো অতিমানবের কীর্তি, তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগ ছিল কিঞ্চিৎমাত্র। অথচ এই মানুষগুলোকে আজ তোমরা নেহাতই মহৎ সভ্যতার রথ ঠেলাতে ধরে এনেছ। বেচারীরা না পারছে রথে চড়তে না পারছে পালাতে।

মোহিনীকে আমি এবারকার চিঠিতে লিখেছি : "মানুষের পক্ষে এটাই হয়েছে সবচেয়ে বিড়ম্বনা। সমাজ সংসার তার সামনে কর্তব্য অকর্তব্যের এমন একটা বৃহৎ ফর্দ ধরে দিয়েছে যে, বেচারী সেই যজ্ঞের ফর্দ মিলিয়ে বাঁচতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। এই ফর্দ তার মেনে নেবার কোনো দরকার ছিল না, কেননা সেটা তার সাধ্যাতীত। কিন্তু সমাজ এমনই পদার্থ যা আমাদের ক্ষমতা অক্ষমতা, মরজি, স্বাধীনতাকে পরোয়া করার জন্যে বসে নেই। সে বসে আছে রাজাসনে, আমরা তাকে সেলাম দেব এটাই তার ইচ্ছে। মানুষকে বাঁধবার এমন ষড়যন্ত্রকে আমি ঘৃণা করি। মানুষের পক্ষে এটা মুক্তি নয়, আনন্দ নয়। এ-হল দাসত্ব।"

মোহিনীকে চিঠি লিখতে বসলে আমার ভেতরকার একরোখা অবিনটা যে বেজায় ক্ষেপে যায় আমি তা বুঝতে পারি। মনে হয়, মোহিনী আমার প্রতিপক্ষ, শত্রু। তিনি প্রায় মুখ বুজে আমার বিরোধিতা করছেন। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁর পরিবার এবং সংসারকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে, নিজের জীবনের ব্যর্থতাকে সহ্য করে, তাঁর ভালমন্দ নীতিজ্ঞান নিয়ে আমায় স্পর্ধার সঙ্গে দেখাতে চাইছেন, তিনি স্বাভাবিক সত্য। মোহিনীর এই অহঙ্কার আমার সহ্য হয় না।

আমি তাঁকে বলি, "আপনি জানেন না মানুষ হিসেবে মুক্তির আনন্দ কোথায়। আপনাকে চীনা উপকথা থেকে একটা গল্প শোনাই। এক নদীর ধারে একটা ষাঁড় এবং শুয়োর ছানার মধ্যে ভাবসাব হয়েছিল। তারা রোজই এক জায়গায় চরতে আসত, এসে গল্পগাছা করত। ষাঁড়ের বড় দুঃখ ছিল তাকে মানুষ অনাদর করে। একদিন তার কপাল ফিরল, কিছু মানুষজন এসে ষাঁড়টাকে খাতির করে ধরে নিয়ে গেল। শুয়োর ছানাটা পালিয়ে গিয়ে দূর থেকে শুধু দেখল, ষাঁড় বাবাজী হাসতে-হাসতে মানুষদের সঙ্গে চলে যাচ্ছে। কিছুদিন পরে সেই ষাঁড়টাকে খাইয়ে দাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট করে, স্নান করিয়ে লোকগুলো আবার তাকে নদীর ধারে নিয়ে এল। এবার অবশ্য দড়িতে বেঁধে। তারপর দেখা গেল, নদীর ধারে এনে তাকে হাড়িকাঠে চাপানো হচ্ছে। আর, খানিকটা দূরে নদীর কাদায় সেই শুয়োর ছানাটা নিজের মনে গড়াগড়ি খাচ্ছে। হাড়িকাঠে যাবার চেয়ে ওই শুয়োর ছানাটার কাদায় গড়াগড়ি দেওয়াটা যে অনেক সৌভাগ্যের এটা হয়ত আপনি স্বীকার করবেন। আমি নিজে শুয়োর ছানার মতন জন্মজন্ম কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে বেঁচে থাকতে রাজী, তবু মানুষের খাদ্যের উপকরণ হতে রাজী নয়।..."

মোহিনী এক সাজানো মিথ্যে নিয়ে বেঁচে আছেন। তিনি চেয়ে দেখছেন না তাঁর অন্দরমহলে যে-কুকুরটা বাঁধা আছে সেটা আয়নার টোপর জাতীয় জীব নয়। মোহিনী যে-জীবটাকে বেঁধে রেখেছেন তাকে শুধু শেখানো হয়েছে বাইরের লোক ঘরে পা দিলেই চেঁচাতে। চোর ধরার শিক্ষা পেয়ে কুকুরটা শুধু চেঁচাতেই শিখেছে, তার জ্ঞান নেই কে চোর, কে অতিথি। মোহিনী নিজের মধ্যে এই রকম একটা নীতিকে বেঁধে রেখেছেন, সে শুধু চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে নিজেকে জাহির করে, তার মনিবকে বোঝায় চোর এসেছে। মনিব বোঝে না, সব শব্দই চোরের পায়ের নয়।

মোহিনীকে আমি লিখেছি, মেয়েদের চরিত্র হল, তারা নৌকোর মতন ভাসতে পারে। নিতান্ত ঝড়েঝাপটায় কাবু না হলে তারা জলের তলায় ডোবে না। আপনি সংসার তরঙ্গে অনন্তকাল ভেসে থাকুন তাতে অন্যদের আফসোস হবে না। আমি বেচারী এই আফসোসে মরব, হায় হায়, আপনি চিরটাকাল ঘাটেই শুধু বাঁধা থাকলেন, না পারলেন স্রোতে ভেসে যেতে, না পারলেন ডুবতে। আমার যদি সাধ্যে কুলোয় বাঁধা দড়িটা খুলে দিয়ে বলব, হয় নৌকোটাকে জলের টানে ভেসে যেতে দিন, না হয় জলের তলায় ডুবুন, দয়া করে আর ভেসে থাকবেন না। ওটা আর আমি দেখতে পারি না।

মোহিনী আমার চিঠিপত্রের ধরনটা তেমন পছন্দ করছেন না। তাঁর জবাব থেকে আমি বুঝতে পারি, আমার মতন বর্বর জীবটিকে নিয়ে তিনি সমস্যায় পড়েছেন। আমায় তিনি রুখতে পারছেন না, তাঁর নাগালের মধ্যে এমন কোনো অস্ত্র নেই যা দিয়ে তাড়া করে আমায় দূরে সরাবেন। তিনি নিজের অন্তরমহলকে সামলাবার জন্যে জানলাটা দরজাটা ভেজিয়ে ছিটকিনি তুলে দেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আমি যে তাঁর মাথার ওপরের আলো আসার পথ দিয়ে ঢুকে পড়েছি তা বুঝতে পেরে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। উনি মনকে বোঝাচ্ছেন, আমি নিতান্তই চকমকি। এক সময়ে 'অবিন মার্কা' দেশলাইয়ের ব্যবসা ফেঁদে লোকসান খেয়েছি এইটেই বোধ হয় তাঁর সান্ত্বনা। আমি ভাবছি, আবার যদি নতুন করে কোম্পানী খুলি তবে সেই দেশলাইয়ের নাম হবে 'মোহিনী'। তার আগুনের ফুলকি দেখে আমি আত্মহারা হয়ে বলব, সাবাস মোহিনী দেশলাই, তোমারই জিত হল অবিন।

আমি হোহো করে হাসছি, দেখি বাইরে থেকে হুড়মুড় করে বৃষ্টি ঢুকে পড়েছে, বাতাসের দমকায় জলের ছাট এসে বিছানা ভিজিয়ে দিচ্ছে। জানলা বন্ধ করতে-করতে দেখলাম ঘরের আলোটা আবার সেই রকম দপদপ করতে শুরু করেছে। মোহিনীর অবস্থা হয়েছে বাতিটার, জ্বলবে কি নিববে বুঝতে পারছে না।

রাত্রে শুয়ে-শুয়ে কি কথা ভাবতে-ভাবতে কালকের কথা মনে পড়ল।

শচিপতিরা কাল আসছেন। শচিপতি আসার পর তাঁকে নিয়ে আমাদের ব্যস্ততা কতটা বাড়বে তা অনুমান করা যাচ্ছে না। যতীনের পরামর্শই ভাল। হয়ত আমাদের এত উদ্বেগের কোনো সঙ্গত কারণ আর থাকবে না। কিংবা সে-উদ্বেগ আরও বাড়বে। আপাতত কিছু বলা যায় না। সবই অনিশ্চিত।

জ্যাঠামশাইয়ের কলকাতা আসার কতটা প্রয়োজন ছিল আমি বুঝতে পারছি না। তিনি আমাকে তেমন করে কিছু লেখেন নি, শুধু লিখেছিলেন, শচিপতির সঙ্গে তিনিও আসবেন। একেবারে অনর্থক যে তিনি আসবেন এমনও আমার মনে হয় না। শচিপতিই তাঁকে টেনে আনছেন কি-না আমি জানি না। বা এমনও হতে পারে জ্যাঠামশাইয়ের মনে হয়েছে, শচিপতির হাত ধরে পেঁৗছে দিয়ে যাওয়াই তাঁর কর্তব্য।

আয়নার কলকাতায় আসার বড় সাধ ছিল। সে আসছে আসুক। কিন্তু তার এই সময়ে এসে কী লাভ হবে জানি না। সুহাসদের বাড়িতে মোহিনী একা পড়ে থাকলেন, অন্যরা চলে এলেন, আমারও যেন এ কেমন ভাল লাগছিল না। মোহিনীও এলে পারতেন। জ্যাঠামশাই হয়ত অন্য কিছু ভেবে আসছেন। কলকাতায় তিনি বেশীদিন থাকবেন এমন হয়ত স্থির করেননি। শচিপতিকে পেঁৗছে দিয়ে কয়েক দিন থাকবেন মাত্র, তারপর ফিরে যাবেন।

আয়না আমায় মাঝে-মাঝেই চিঠিপত্র দেয়। তার চিঠি থেকে বুঝতে পারি, বাড়িতে সে বড় একা একা বোধ করে। ইদানীং তার দু-একটা চিঠি পড়ে আমার ধারণা খানিকটা পালটে গেল। আয়নার মধ্যে যে-ছেলেমানুষী ছিল সেটা যেন সরে গেছে। সে দেখছি, হঠাৎ বেশ গম্ভীর হয়ে চিঠিপত্র লিখতে পারছে। আয়না মোহিনী নয়; তার সরলতা, চঞ্চলতা গোপন করার কোনো চেষ্টা আমি আগে দেখি নি। কলকাতায় ফিরে এসে তার প্রথম দিককার চিঠিগুলো পড়তে গিয়ে আমি অট্টহাস্য হাসতাম। একেবারে হালে দেখলাম আয়নার লেখার ভাষা পালটেছে। সে আর সরল করে কিছু লেখে না, তার উচ্ছ্বাসের মাত্রা খুবই কমে গিয়েছে। মোহিনী যে তাকে কিছু নীতি-শিক্ষা দিয়েছেন, এমন ধারণা আমি করছি না, কিন্তু আয়না যে মেয়ে এই বোধটা যেন সে আবিষ্কার করে ফেলেছে। আমার কাছে তার সঙ্কোচের কোথাও কোথাও কারণ থাকলেও সে লিখেছে, 'অবিনদা, এখানে আমার আর ভাল লাগে না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকি। দিদি তার নিজের মতন কাজকর্ম নিয়ে থাকে, জ্যাঠামশাই থাকেন নিজের ঘরে, আর আমি সারা বাড়ির মধ্যে একা-একা মুখ বুজে বসে থাকি। আমার বন্ধু বিনু এলে তার সঙ্গে একটু গল্প করি। বিনুও চলে যাবে এবার। কলকাতায় গেলে আমি বেঁচে যাব। এখানে আমার আর একেবারেই ভাল লাগে না। মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। আপনি আবার ঠাট্টা করবেন। তা নয়, অবিনদা। মোটেও তা নয়।'

কলকাতায় আসার আগে-আগে আয়না আমায় কোনো চিঠি দেয় নি। ভেবেছে, চিঠি দিয়ে আর কী লাভ, সে আসছেই।

আমি ভাবছি, কলকাতায় এসে আয়না কী দেখবে? দেখবে, তার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেছে। কেন ভেঙেছে জানতে তার আটকাবে না। তার দিদির জন্যে সে-বেচারীর বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে এতে তার খুশী হবার কথা নয়। কেনই বা সে খুশী হবে? সুহাসরা তাকে ছোটোর আদর আতিশয্য দিয়ে নাবালিকার মতন করে রাখলেও সে সাবালিকা। তার নিজের একটা জীবন আছে, সাধ-স্বপ্ন আছে। তার বয়েসটা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে মেয়েরা অবলম্বনই খুঁজে বেড়ায়। সেটাই স্বাভাবিক, সহজ নিয়ম। আয়না যে-জাতের মেয়ে সে-জাতের মেয়েরা ঘরের মধ্যে বেশী মানায়। ও হল গৃহস্থের বাগানে বেড়ে ওঠা ফলের মতন, সংসারের ভোগে লাগবে বলেই সে নরম খোসা গায়ে নিয়ে বেড়ে উঠেছে। সুহাসরা তাকে শৌখিন করে সাজিয়ে রেখে-রেখে তার স্বভাব-টাকে ফুলের মতন করতে চেয়েছে হয়ত, কিন্তু আয়না ফুলের জাত নয়! আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, আয়নার মাথায় তাদের পরিবারের চাপা অহংকার বোধটা নেই। সে যে খুব একটা কিছু বোঝে তাও নয়, সংসারের অন্য পাঁচজনের মধ্যে থেকে থেকে একটা সমীহের ভাব এসেছে, তার বেশী নয়। তার দোষ হল, সে চারদিক থেকে চাপা পড়ে গিয়ে একটু ভীতু ধরনের হয়ে গিয়েছে। নিজেকে মেলে দিতে পারে নি। আমার মনে হয়, আয়না খুব সাধারণ, তার যেটুকু চাওয়া তার মধ্যেও অসাধারণত্ব নেই। সে তার নিজের অংশটুকু সহজ সংসারের মধ্যেই খরচ করে বাঁচতে চায়। তার এই সাধ অপূর্ণ থাকলে সে কী করবে আমি জানি না। মোহিনী যে এমন করে তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে আয়না হয়ত ভাবতে পারে নি। যখন বুঝতে পারবে, তখন কোন্ চোখে তার দিদিকে দেখবে কে জানে।

সুহাসকে আমি আয়নার বিয়ের কথা খুব কিছু জিজ্ঞেস করিনি। যা বলার সে নিজেই বলে।

আমাদের সমাজে মেয়েদের অবস্থাটা হল ব্যবহার্য সামগ্রী হিসেবে। আমরা তাকে ব্যবহার করি, স্বতন্ত্র করে মূল্য দিই না। এটা সর্বত্রই চলেছে, এখানে কিছু বেশী। মেয়েদের নিয়ে আমাদের যত হইচই তার আড়ালে যে আমাদের স্বার্থটুকু গোপনে কাজ করে চলেছে তা আজকাল চোখে পড়ার উপায় থাকে না। কিন্তু যাদের চোখ আছে তারা বুঝতে পারে, ভগবান মেয়ে জাতটাকে আলাদা আকার দিয়ে গড়েছেন বলে বেচারীদের নিয়ে কত তামাশাই করি। কতরকম ফন্দি করে কাজে লাগাই তাদের—হায় রে!

আমার মাকে আমার মনে পড়ে। পুণ্যবালা—আমার মা তাঁর স্বামীর কাছে নারী হিসেবে কোনো মূল্য পায় নি, বাবার চার পাশে ছড়ানো সরকারী অফিসের নিতান্ত তুচ্ছ একটা ফাইলও যতখানি নজর কাড়ত আমার মা বোধ হয় তাও নয়। বাবা তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের কতক আচার পালন করার জন্যে যেন মাকে এনেছিলেন। মা শুধু সেইটুকু পালন করত। আমার ধারণা, বাবা এবং মার মধ্যে কোনো হৃদয়-সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, বাবা ছিলেন নিজের কৃতিত্ব

নিয়ে ব্যস্ত আর মা থাকত নিজের জীবনের বেদনা নিয়ে আড়ালে। আমার সঙ্গে মার সম্পর্কটাও কেমন খাপছাড়া ছিল। আমি ঠিক জানি না, মা তার স্বামীর সংসার করতে এসে কী ধরণের অবহেলা এবং আঘাত পেয়েছিল, যার ফলে মার মন থেকে সন্তানের জন্যেও কোনো আকুলতা তেমন করে ফুটত না। মা যেন নিজের মধ্যে একটা আশ্চয জগৎ গড়ে নিয়েছিল। সেখানে স্বামী তো নয়ই, ছেলেরও পা রাখার জায়গা ছিল না। আমার সেই মাকে আমি বুঝতে পারতাম না। মনে হ'ত, বাবা এক জগতে বেঁচে আছেন, মা অন্য জগতে। আমার বাবা রাশভারী, রাগী প্রকৃতির মানুষ হলেও স্ত্রীর সঙ্গে অসভ্য আচরণ করতেন না। আমি কোনো দিন বাবাকে মার সঙ্গে ঝগড়া করতে শুনিনি। তিনি বোধ হয় ধরেই নিয়েছিলেন, অফিসে বাবার যে-মর্যাদা বাড়িতেও সেই একই মর্যাদা, বেয়ারা পিয়নের মতন মার সঙ্গে অসদাচরণ তাঁর মতন পদস্থের শোভা পায় না। বাবা পদস্থ হবার ঝোঁকে ক্রমশই ওপরে উঠছিলেন, আর মা ক্রমাগত দূরে সরে গিয়ে নিজের সম্ভ্রম বাঁচাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মা যেন নির্বাসিতা হয়ে থাকল।

আমার মা, পুণ্যবালা অসুন্দর ছিল না। মার চোখ ছিল বিষণ্ণ আলোর মতন, কপালটি শুভ্র, নাকটি জোরালো। মার গলার স্বর ছিল নরম, মৃদু। শুভ্র বসন ছিল মার প্রিয়। মাকে দেখলেই মনে হত, মা একা-একা নিজের মনে বেঁচে আছে। 'আমি থাকি নিজ মনে।'

মার এই নিঃসঙ্গতা কেমন এক মোহ হয়ে দাঁড়াল। হয়ত মার মৃত্যুও সেই মোহবশে।

মোহিনী আমার মার মতন নন। আমার মা বিধাতার কাছে বর চেয়ে একটি আশ্চর্য শান্ত নম্র নিরাসক্ত হৃদয় পেয়েছিল। সেই হৃদয় মাকে নিঃসঙ্গতার মধ্যেও ম্লান করেনি। মোহিনী সে-বর পান নি।
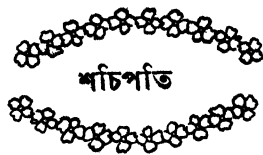
সকালে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, আমাদের পুরনো বাড়ির দক্ষিণের ফাঁকা বাঁধানো উঠোনে সংকীর্তন বসেছে। তুলসীতলার দিকে একটা হ্যাজাক বাতি, সেটা যে কত লম্বা বোঝাও যাচ্ছে না, দাউ দাউ করে জ্বলছে, আসরের মাঝখানে সাজিতে রাখা ফুলের মালা, ফুল; ধূপ-ধুনোও যেন জ্বলছিল কোথাও, চারদিকে বাবা, মেজকাকা, ছোটকাকা, মা-কাকিমারা বসে। মেয়েদের মাথায় কাপড়, ছোটকাকির হাতে একটা পাখা; বাবা দু-হাতে খঞ্জনি নিয়ে বসে আছেন, মেজকাকার সামনে খোল। সবাই মিলে কীর্তন গাইছে। আর আমি, কোথায় যে ছিলাম জানি না, হঠাৎ দেখি ছোটকাকা আমায় আসরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, আমি হেলেদুলে নাচতে-নাচতে গাইতে শুরু করেছি। গাইতে-গাইতে দেখছি, বাবা মা কাকা কাকিরা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে। বাবা খঞ্জনি বাজাচ্ছেন। ক্রমেই চারদিক থেকে ঘন হয়ে এসে ওরা এক সঙ্গে ভীষণ জোরে-জোরে গাইতে শুরু করে দিয়েছে। গাইতে-গাইতে আমি যত আত্মভোলা হয়ে পড়ছি, ওরা তত চারদিক থেকে আমার কাছে জড় হয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে। শেষে আমার পা রাখার মতন জায়গাও আর পাই না, পায়ের তলায় আমার বাবা মা কাকা কাকি, আর দেখি সেই আমার খুড়তুতো বোন শান্তা। হ্যাজাক বাতিটা ক্রমেই লম্বা হয়ে যাচ্ছে; তার আলো কমে আসছে। খানিকটা পরে সব অন্ধকার হয়ে এল, আমি মাথার ওপর তাকিয়ে দেখি ঘুটঘুটে আকাশ, অনেক তারা, সব কেমন থমথম করছে; আর পায়ের তলায় আমার বাবা মা কাকা কাকি বোন—সবাই মিলে অদ্ভুত এক নীচু স্বরে গাইছেঃ 'বল হরি, হরিবোল; বল হরি, হরিবোল।'

স্বপ্নটা ভেঙে গেল কখন আমি জানি না। আমি স্বপ্নেই থাকলাম। অনেকক্ষণ ধরে এক নাগাড়ে গান গেয়ে, নেচে আমার সমস্ত শরীর যেন ঘেমে-ঘেমে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, গা মাথা টলছিল, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল বড়। তখনও আমি শুনছিলাম, আমার চারপাশে 'বল হরি, হরিবোল' হচ্ছে, খুব মৃদুস্বরে, মনে হচ্ছিল শ্মশানের কাছাকাছি এসে সবাই যেন বড় ক্লান্ত হয়ে গেছে।

এরপর ঘুমটা ভাঙল। কাক ডাকছে। সকালে কাকরা যেমন করে ডাকতে পারে, বেলা বেড়ে গেলে আর তেমন করে ডাকতে পারে না। শুয়ে-শুয়ে আমি এক কানে কাকের ডাক শুনছি, অন্য কানে ক্ষীণ করে 'বল হরি,

হরিবোল'। অবশেষে হরিবোল ধ্বনিটা দূরে কোথাও মিলিয়ে গেল।

চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলাম। আমার মাথার দিকে বাঁ পাশে জানলা। জানলাটা পুরোপুরি ভেজানো ছিল না। অন্য জানলাটা পায়ের দিকে। সকালের আলোর রঙ দেখে মনে হল, আজ আকাশ পরিষ্কার, মেঘটেঘ বোধ হয় নেই। আরও একটু শুয়ে থাকলাম। ভোর বেলার স্বপ্নটা মাথার মধ্যে জড়িয়ে ছিল, বাবার চেহারাটা আমার মোটামুটি মনে থাকলেও মেজ কাকার মুখ একেবারেই অস্পষ্ট। ছোটকাকাকেও ভুলে আসছি। মেজকাকিকেই আমার সবচেয়ে বেশী মনে আছে। মা যেন গরদের শাড়িটা পরে বসেছিল। ছোটকাকিকে বিধবার থানে দেখেছি, না শাড়িতে, আর আমার মনে পড়ছিল না। ওদের মুখ গান গাইতে-গাইতে শেষের দিকে কেমন লম্বা-লম্বা হয়ে গিয়েছিল। ওরা সবাই আমার দিকে মুখ তুলে এমন করে গাইছিল যে সকালে যেন আকাশে গোল চাঁদ দেখে লম্বা-লম্বা মুখ করে জীবজন্তুর মতন কাঁদছিল। হ্যাজাক বাতিটাও কেমন অদ্ভুতভাবে লম্বা হয়ে যাচ্ছিল, রবারের মতন। শেষে যখন সব অন্ধকার, আমি মাথার ওপর আকাশ আর তারা দেখছি—তখন আমার বেশ মনে হল, বাবা কাকা মা কাকিমাকে আমরা যেভাবে পথ হেঁটে-হেঁটে উঁচুনীচু মাঠ ভেঙে নদীর পাড়ে শ্মশানে নিয়ে যেতাম, ধুনুরির তুলো ধোনার মতন শব্দ হত : 'বল হরি, হরিবোল—বল হরি, হরিবোল'—সেইভাবে হরি ধ্বনি হচ্ছিল। আমার মৃত আত্মীয়স্বজন সকলেই আমার চারপাশে ভিড় করে বসে আমায় নিয়ে কীর্তন করছে এটা বুঝতে পেয়ে আমার ভয় দুঃখ হল না। কিন্তু ছোট কাকি এখনও বেঁচে, রাঁচিতে পাগলা হাসপাতালে, কাকি বেঁচে থেকেও বেঁচে নেই অবশ্য, তবু কাকিকে ওদের মধ্যে দেখে আমার একটু অবাক লাগছিল।

স্বপ্নটা মনে মনেই থাকল। বিছানায় উঠে বসলাম। বাড়িতে সবাই জেগেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। জ্যাঠামশাই হয়ত জেগে বসে আছেন। সুহাস বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। আয়নারও দেরী করে ওঠা অভ্যেস। বাড়ির মধ্যে যেটুকু শব্দ হচ্ছিল তাতে কেউ কেউ উঠেছে বোঝা যায়।

বিছানা ছেড়ে উঠে মাথার দিকের জানলাটা খুলে দিলাম। যা ভেবেছি, আকাশ পরিষ্কার, মেঘ নেই। আমরা কলকাতায় পা দিয়েছি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। বেশ বৃষ্টি ছিল গোটা দিন। তারপর আকাশ শুকিয়ে দু-তিনটে দিন খটখটে থাকল। আবার মেঘলা শুরু হল। মেঘলায় মেঘলায় দুটো দিন কাটল। তারপর এল বৃষ্টি। খুব বৃষ্টি চলল দিন দুই। কালও থেমে থেমে বৃষ্টি হয়েছে। আজ আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদ-রোদ ভাব হচ্ছে দেখে আমার ভাল লাগছিল।

জানলা দিয়ে কলকাতা দেখতে-দেখতে আমার মনে পড়ল, খুব ছেলেবেলায় একবার কলকাতায় এসেছিলাম। মার সঙ্গে। কোথায় উঠেছিলাম আমার কিছু মনে নেই। মার কোনো ভাইয়ের বাড়িতে, খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই হবে। বিয়ে-থা উপলক্ষে এসেছিলাম। আমাদের ওপর তলায় একটা ঘরে থাকতে

হত। সরু, ছোট মতন ঘর; একেবারে মেঝে ছুঁয়ে লম্বা মতন জানলা, কাচের শার্সি আর খড়খড়ি। জানলার বাইরে ছিল লম্বা-লম্বা সাবুগাছ, তার ওপাশে পুকুর, ঝোপঝাড়। রাত্রে মার শুতে আসতে দেরী হত। আমি আগাগোড়া মাথা মুড়ে শুয়ে থাকতাম, জানলাটা থাকত বন্ধ। সাবুগাছের মাথায় জড়ানো অন্ধকার দেখলে আমার ভয় করত। সকাল বেলায় সেই ভয় কিন্তু থাকত না, তখন সাবুগাছগুলো ভালই লাগত। বিকেল থেকেই মন খারাপ হয়ে আসত, ভয় জমতে শুরু করত। প্রথম দেখা সেই কলকাতার ভয় এখনও যেন আমার থেকে গেছে।

বড় হয়ে কলকাতায় এসেছি আরও একবার। মাস খানেকেরও বেশী ছিলাম। তখন আমার ওঠার জায়গা হয়েছিল শম্ভুদের বাড়ি। শম্ভুরা থাকত বউবাজারে। শম্ভুর সেই বাড়িতে একটা আস্তাবল ছিল, নীচের তলার উঠোনে সকাল-বেলায় কত যে রিকশা ধোওয়া হত। সে বড় বিচিত্র বাড়ি, আলো ঢোকার জায়গা ছিল না।

কলকাতা আমার তখনও ভাল লাগে নি। এরপর হুট করে এক আধদিনের জন্যে কলকাতায় যদিবা কারও সঙ্গে এসেছি, পরের দিনই আবার ফিরে গিয়েছি। এই শহর, লোকজন, হট্টগোল, ধুলো ময়লা নোংরা আমার ভাল লাগত না।

আজ আবার আমায় কলকাতায় আসতে হয়েছে। সুহাসদের পাড়াটা খারাপ নয়। তার বাড়িটাও বেশ। তবু আমার ভাল লাগছে না। আমি এসে পড়ায় সুহাসের এই ছোট বাড়িতে খানিকটা অসুবিধেই হচ্ছে। তার শোবার ঘরে জ্যাঠামশাই আর আয়নার জায়গা হয়েছে, বসার ঘরে আমার খাট পড়েছে, আর সুহাস গিয়েছে বাড়তি একটা ঘরে, তাতে কোনরকমে থাকা যায়। সুহাসদের কাছে এসে ওঠার পর ওদেরই অসুবিধে বেড়েছে, আমার নয়। জ্যাঠামশাই এভাবে থাকতে কোনোকালেই অভ্যস্ত নন, তাঁর যে অসুবিধে হচ্ছে এটা বোঝা যায়, মুখ ফুটে তিনি তা বলেন না; বরং তাঁর কথাবার্তায় মনে হয়—তিনি বেশ আছেন। সুহাস একা বাড়িতে ছিল; এখন তাকে একপাশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, বেচারী তার ঘরে রাতটুকু কোনোরকমে কাটাতে পারছে এই যথেষ্ট। আয়নার দেখছি কলকাতা মন্দ লাগছে না। তবে সে যতটা আশা নিয়ে এসেছিল তা মিটছে না। সবই আমার জন্যে। আমাকে নিয়ে এই বাড়িটায় হুলস্থুল চলছে।

আকাশে রোদ এল। রাস্তার ময়লা তোলা শুরু হয়ে গেছে। একটা লোক শেকলবাঁধা কুকুর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। দু চারজন করে মানুষ হাঁটছে পথে, রিকশা দেখছি।

স্বপ্নটা চোখের তলায় আবার পাতলা ধোঁয়ার মতন ভেসে গেল। মনে পড়ল, বাবা যখন আমার দিকে তাকিয়ে গান গাইছিলেন তখন তাঁর দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। বাবা পুরুষ মানুষ হয়েও মেয়েদের মতন কথায় কথায় কাঁদতেন। কাঁদা তাঁর স্বভাব ছিল। খুব দুর্বলচিত্ত মানুষ ছিলেন।

মা বাবার চেয়েও শক্ত ছিল। সবচেয়ে শক্ত দেখেছি আমার মেজকাকিকে। মেজকাকিকে দেখেছি, বজ্রাঘাতে মেজকাকা মারা যাবার পর কাকি সকলের সঙ্গে শ্মশানে গিয়েছিল, গরুরগাড়িতেও উঠতে চায় নি। মেজকাকি আমায় শেষ পর্যন্ত বুক দিয়ে আগলে ছিল। পিতৃপুরুষের ভিটে থেকে আমায় টেনে বার করে আনল কাকি বাঁচাবার জন্যে। আমায় দিয়ে আলাদা ঘর তোলালো। কাকি তো ভগবান নয়, আমি কার বরাতে এতদিন বেঁচে থাকলাম তাও জানি না। এবার ওরা আমায় ডাকছে। আমায় নিয়ে যাবার জন্যে চারিদিকে জড় হয়েছে।

হঠাৎ নিজের শরীরের দুর্বলতা অনুভব করলাম। ঘুম যেটুকু শক্তি জুগিয়েছিল, সেই শক্তি যেন ফুরিয়ে আসার মতন হয়েছে। মাথা ঘুরে টলে পড়ার মতন কোনো দুর্বলতা নয়, তবু খানিকটা ক্লান্ত লাগল। কালও অনেকটা রক্ত গিয়েছে শরীর থেকে। এসে পর্যন্ত ঠিক যে কতটা রক্ত দিলাম বুঝতে পারছি না। বার তিনেক, নিশ্চয়। আমায় এখন রোজই কিছু একটা দিতে হচ্ছে শরীর থেকে। শরীরটাকে তন্নতন্ন করে ওরা ঘাঁটছে।

এই জিনিসটা আমি চাই নি। আমি চেয়েছিলাম, আমার যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেইটুকু নিয়ে চলে যেতে। সুহাসরা আমায় যখন যেতে দেবে তখন আমার কতটুকু আর থাকবে, কে জানে!

দরজায় খুট খুট শব্দ হল।

সাড়া দিয়ে দরজা খুলতে দেখি আয়না দাঁড়িয়ে।

"আপনি কতক্ষণ উঠেছেন, শচিদা?"

"অনেকক্ষণ।"

"ঘুম হয় নি?"

"হয়েছে। ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গেল।"

"আমি তাই ভাবলাম।"

"জ্যাঠামশাই উঠেছেন?"

"কখন। জ্যাঠামশাইয়ের বোধ হয় সারা রাত ঘুমই হয় না।"

"ছটফট করেন?"

"না। আমি বুঝতে পারি। উসখুস করেন।"

"তুইও ঘুমোস না?"

আমি ঘুমোই। মাঝে মাঝে ভেঙে যায়। আপনি তা হলে মুখটুক ধুয়ে নিন, শচিদা। আমি আপনার খাবার তৈরী করি।"

মুখ ধুয়ে ফিরে আসার পর বেশ দুর্বল লাগছিল। পা দুটো ঝিমঝিম করছে, হাত দুটো যেন ভেতরে ভেতরে কাঁপছিল। একবার আমার আশ্চর্যভাবে মনে হল, ভোরের স্বপ্নের সঙ্গে আমার এই দুর্বলতার কোনো যোগ রয়েছে, হাত তুলে গা দুলিয়ে অনেকক্ষণ সঙ্কীর্তনের নাচ নাচতে হলে হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

ঘরের জানলায় রোদ এসেছে সবে। ক'দিন পরে মেঘলা কেটে রোদ ফোটার জন্যে সকালটি দেখতে ভাল লাগছিল। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া চলতে শুরু করেছে, মানুষজন হাঁটছে, নানা ধরনের সাড়াশব্দ আসছিল। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকার ইচ্ছে হলেও আমি কাছাকাছি বিছানায় এসে বসে পড়লাম। কলকাতায় আসার আগেও আমার শরীর এত দুর্বল লাগত না। এই আট দশ দিনের মধ্যে কেমন হয়ে গেলাম। শরীরটার ওপর ডাক্তারদের পীড়ন চলছে বলেই হয়ত। কাল সকালে অনেকক্ষণ বমি-বমি ভাব ছিল, আজ এখন পর্যন্ত সে-রকম কিছু বুঝছি না। কিন্তু ক্লান্ত লাগছে।

আয়না আমার জন্যে অল্প কিছু খাবার নিয়ে এল। সবই নরম, পাতলা জিনিস : পাতলা সুজির পায়েস, তার চেয়েও পাতলা চা, জলের মতন। এর পর আসবে হরলিকস, তারপর ফলের রস। আমার খাওয়াদাওয়া এখন ধরাকাটা করে চলছে। ওষুধপত্রও নানা রকম, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খেয়েই যাচ্ছি।

জ্যাঠামশাই এলেন।

"আজ কেমন লাগছে, শচি?"

"একটু দুর্বল লাগছে।"

"তা লাগতে পারে—" জ্যাঠামশাই আমার চোখ-মুখ ভাল করে দেখতে লাগলেন। তাঁর মুখে আমি যতটা উদ্বেগ আগে দেখেছি এখন তার চেয়ে বেশী উৎকণ্ঠা দেখতে পাই। তিনি সেটা প্রকাশ করতে চান না। আমি তাঁর চোখের দিকে তাকালে স্পষ্টই কিন্তু বুঝতে পারি, জ্যাঠামশাই ভেতরে ভেতরে কতটা বিষণ্ন।

"তুমি আজ খুব সকাল সকাল উঠেছ?" জ্যাঠামশাই বললেন, "রাত্রে কোনো কষ্ট হয় নি তো?"

"না", আমি মাথা নাড়লাম। রাত্রে আমার কষ্ট হয়েছে। পেটের সেই যন্ত্রণা অনেকক্ষণ কষ্ট দিয়েছিল। তারপর জ্বালা ভাবটা থাকতে থাকতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কখন। ওঁকে এসব কথা বলতে চাই না।

জ্যাঠামশাই বসলেন।

ভোরবেলার স্বপ্নটা আবার আমার মাথায় ছেঁড়া-ছেঁড়া তুলোর আঁশের মতন উড়ে এসে জড়িয়ে গেল।

"জ্যাঠামশাই?"

"বলো।"

" আপনি তো আমায় কলকাতায় সুহাসের কাছে পেঁৗছে দিয়েছেন। ডাক্তার-টাক্তারও দেখা-শোনা করছে। আপনি এবার নিশ্চিন্তে ফিরে যেতে পারেন।"

জ্যাঠামশাই আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন। কলকাতায় আসার পর ওঁর দৃষ্টি কখনো-কখনো কেমন এলোমেলো হয়ে যায়, উনি যে দিশেহারা হয়ে পড়েন এটা বোঝা যায়। "এই তো"—উনি বললেন, "এবার

ফিরে যাব। তোমার একটা ব্যবস্থা হলেই আমায় ফিরতে হবে।"

"আমার জন্যে আপনি কতদিন কলকাতায় পড়ে থাকবেন? মানু একলা আছে।"

"মানুর জন্যেও তো ভাবছি, শচি", জ্যাঠামশাই মাথা নুইয়ে নেড়ে আস্তে আস্তে বললেন, "মেয়েটা একলা আছে বাড়িতে; কার্তিক কমলা রয়েছে, হরিমোহনকে বলে এসেছি, তবু রোজই ভাবনা হয়। দেখি আর ক'দিন। আজ বিকেলে একটা রিপোর্ট পাওয়া যাবে তোমার।"

"আজ?"

"আজই শুনলাম। সুহাসরা বিকেলে ডাক্তারের কাছে যাবে।"

আমি কোথায় কোন্ দিকে তাকাব ভেবে না পেয়ে যেন বিছানার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সুহাস উঠে পড়েছে। বাইরে বারান্দায় সে আয়নাকে ডাকছিল। আচমকা আমি বললাম, "ডাক্তাররা কী বলছে, জ্যাঠামশাই?"

জ্যাঠামশাই খুব সাবধানে আমার দিকে চেয়ে আছেন বুঝতে পারলাম। সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "পুরনো রোগ, চট করে ধরা মুশকিল। দেখছ না, কত রকম পরীক্ষা করছে। আমার তো মনে হচ্ছে শচি, তুমি শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে খুব অবহেলা করেছ। কোনো নিয়ম মানো নি; খাওয়া-দাওয়ার যত্ন নাও নি; তোমার পেটে ঘা-টা হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, আলসার। আলসার রোগটা শুনতে আজকাল তেমন একটা মনে হয় না; কিন্তু রোগটা ভালো না। খুব খারাপ। বড় ভোগায়। অযত্ন করলে ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।"

"আজ বিকেলের পর আমার অসুখটা জানা যাবে?" এবার আমি জ্যাঠামশাইয়ের দিকে তাকালাম।

জ্যাঠামশাই যেন খানিকটা বিভ্রান্ত বোধ করলেন। বললেন, "সব রোগ সরাসরি বোঝা যায় না শচি, জটিল ব্যাধি ধরা খুব কঠিন। ডাক্তাররা ভগবান নন, তাহলে মানুষের ভোগ বলে কিছু থাকত না। তোমার অসুখটা ধরতে পারলে চিকিৎসা শুরু হবে। এখন ঠিক রোগের চিকিৎসা হচ্ছে না, শরীরটাকে ঠেকো দেওয়া হচ্ছে।"

আরও খানিকটা বসে থাকলেন জ্যাঠামশাই, অন্য পাঁচটা কথা বললেন।

"আয়নার কী হল?" আমি কথা পালটে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি যেতে পারছি না।"

"সুহাস বলছিল—"

"হ্যাঁ; ওই সম্বন্ধটা ভেঙেই গিয়েছে একরকম। আমারও যেতে মন উঠছে না, শচি। ভাবছি কী করব! আয়নাকে এখানে রেখে দিই কিছুদিন। কী বলো?"

"থাক্ না। পুজো পর্যন্ত থাক।"

জ্যাঠামশাই খানিকটা পরে চলে গেলেন। আমি আর-একবার উঠে জানলায়

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাস্তাময় লোক, দোকান পশার খোলা, রোদ লুটোচ্ছে রাস্তায়, একটা তিন চাকার গাড়ি একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, চাকা খোলা। কোথাও কি বিয়ে হচ্ছে নাকি? সানাইয়ের সুর ভেসে আসছিল।

জানলায় দাঁড়িয়ে থাকার সাধ থাকলেও সাধ্য আমার নেই। মাথাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। পা দুটো আবার ঝিমঝিম করছে।

বিছানায় এসে বসে থাকতেও ভাল লাগছিল না। শুয়ে পড়লাম। পেটের কোথাও টানটান লাগছিল।

শুয়ে থাকতে-থাকতে আমার চোখের ওপর সকালের স্বপ্নটা আবার জলের ঝাপটার মতন এসে লাগল। চোখের পাতা বন্ধ করেও তাকে এড়ানো গেল না, চোখের তারায়, পালকে যেন লেগে থাকল, চোখ ভিজিয়ে রাখল।

আমি অনেকদিন ধরেই দু-একটা জিনিস ভেবে আসছি। ছেলেবেলা থেকেই আমার মাথা খুব পরিষ্কার নয়, বুদ্ধি আমার কম। আমার স্বভাবটা বাবারই মতন। বাবা সাত-পাঁচ ভেবে কাজ করতে পারতেন না। বাবাকে নিয়ে বাড়িতে একটা হাসিঠাট্টা ছিল—কাকা, মা, এমন কি কাকিমাদের মধ্যেও। বিয়ে বাড়িতে কিছু কিছু কর্মকর্তা থাকে যারা কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় নয় কিন্তু তাদের হাঁকডাক বাড়িটাকে জমজমাট করে রাখে। আমার বাবা সম্পর্কে বাড়িতে এই রকম একটা ধারণা ছিল। বাবা কোনো কাজই পারতেন না, হাত দিয়ে মাঝখানে ফেলে রাখতেন। শেষটা কাকাদের সামলাতে হত। তিনি ছিলেন হাঁকপাঁক করা মানুষ; সবই করতে ছুটতেন, তারপর রাজ্যের ঝঞ্চাট ভাইদের ঘাড়ে চাপিয়ে পালিয়ে আসতেন। সরল, নিষ্কর্মা মানুষ আর কি! অল্পেতেই অধীর, অধৈর্য হতেন, ভেঙে পড়তেন, হাউমাউ করে কাঁদতেন। বাবার সঙ্গে আমার মিল হল, আমি তাঁরই মতন অকর্মণ্য, তাঁরই মতন কাতর-স্বভাব। আমার সঙ্গে বাবার চরিত্রগত মিল আর কিছু নেই। আমার চেহারাতেও মার ছাপ বেশী। কাকাদের মধ্যে ছোটকাকার আমি সবচেয়ে আদরের ছিলাম। আমার মেজকাকি আর ছোটকাকাই আমায় মানুষ করেছে। আমার মার একরকম পক্ষাঘাত রোগ হয়, পা থেকে কোমর পর্যন্ত পড়ে যাচ্ছিল। মা বেশীর ভাগ সময়টা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটাত। মেজকাকি আমায় সবচেয়ে বেশী দিন যেমন আঁকড়ে ছিল সেই রকম আমার স্বভাবটাকেও কুঁকড়ে দিয়েছে। কাকি কত কী মানত, বিশ্বাস করত। আমিও অনেক কিছু মানি, মানতে ইচ্ছে করে।

আমাদের পরিবারে যখন একটার পর একটা অঘটন শুরু হল, ছোটকাকা ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল, মা গেল, মেজকাকা ঝড়বৃষ্টির দিনে বজ্রাঘাতে পুড়ে গেল, বাবা আত্মহত্যা করলেন, ছোটকাকি আগুনে পুড়ে মরতে গিয়ে শেষে পাগল হয়ে গেল—তখন আমার এমন একটা বয়েস নয়। আমি চার-পাশে একটার পর একটা অঘটন ঘটতে দেখে ধরে নিয়েছিলাম, আমাদের সংসারের বেলায় এই অস্বাভাবিক কাণ্ডটা ঘটে যাবার নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। এটা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হতে পারে না। তা হলে কি হতে

পারে? ভগবানের রোষ? ভগবান একেবারে অকারণে আমাদের ওপর রুষ্ট এটা বিশ্বাস করতে পারলে ভাল ছিল। আমি ভগবানের ওপর রুষ্ট হতে পারতাম। তা পারিনি। আমি ভাবতাম, কোনো ভয়ংকর পাপ কোথাও ঘটে গেছে। কী পাপ আমি জানি না।

মেজকাকি আমায় বলত, মানুষ তার কর্মফল ভোগ করে।

বাবা, কাকারা কোন্ পাপে এই দণ্ড ভোগ করল আমি বুঝি নি। কিন্তু মনে-মনে একটা ভয় থেকে গেল। আমি তখন থেকেই ভয়ের মধ্যে বাঁচতে লাগলাম। আমার দিন কাটত ভয় নিয়ে। যে-কোনো মুহূর্তে আমার জীবনেও কিছু ঘটতে পারে।

ভয় নিয়ে কতদিন বাঁচা যায়!

ভয় ভাঙার একটা বড় উপায় ভয়ের বস্তুটাকে জানা। যেখানে অন্ধকার, পা ফেলতে ভয় করে সেখানে আলো ফেললে বোঝা যায় রাস্তায় ভয়ের কিছু পড়ে আছে কিনা! কিন্তু মৃত্যুকে আলো ফেলে দেখা যায় না। সে কখন, কবে, কোন চেহারা নিয়ে আসবে কেউ জানে না। মেজকাকা যেদিন বজ্রাঘাতে মারা গেল, সেদিন সকালেও আমি কাকার সঙ্গে মাছ ধরতে যাব বলে ছিপ তৈরী করছিলাম। আমার সেই ছোট ছিপখানা আমার হাতে ধরা থাকল, মেজকাকা অন্য ছিপের টানে নিজেই ধরা পড়ল।

মৃত্যু নিয়ে আমার যে উৎকণ্ঠা তার কারণ এই নয় যে, আমি মরব; আমার প্রশ্ন, আমি কেন অসঙ্গত ভাবে মরব? আমার সঙ্গে মৃত্যুর রেষারেষি তখন থেকেই। তাকে আমি আলো ফেলে দেখতে চাই, অথচ পারি না। সে আড়ালে থাকে, লুকিয়ে থাকে।

আমি তাকে আমার সাধারণ বোধ-বুদ্ধি দিয়ে খুঁজতে চেষ্টা করেছি। পারি নি।

একজন আমায় বলেছিলেন, মানুষের জীবন হল দড়িতে বাঁধা আর্তজীবের মতন, পাহাড়ের চুড়ো থেকে ঝুলছে। যে-কোনো সময়ে সেটা ছিঁড়ে যেতে পারে। তোমার করবার কিছু নেই। চেষ্টা করো, কোথাও যদি পা রাখার মতন জায়গা পাও, তাতে দড়িটা দুলবে কম, টান পড়বে আরও কম।

আমায় যিনি একথা বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল এক ছোট স্টেশনের ওয়েটিংরুমে। শীতের রাতে তিনি কাঠের আগুন জেবলে নিজেকে শীতের হাত থেকে বাঁচাচ্ছিলেন, আর গুনগুন করে তুলসীদাসের দোঁহা গাইছিলেন। সন্ন্যাসী মানুষ, কিন্তু পথেঘাটে দেখা সন্ন্যাসী নয়। আমি তাঁর পাশে বসে আগুন সেঁকতে-সেঁকতে কখন যে হাঁটুতে মাথা রেখে ঢুলে পড়েছি জানি না; ভোর রাতে দেখি, আগুনটা তখনও ছাই চাপা পড়ে অল্প-অল্প জ্বলছে, তিনি নেই। কুয়াশা আর হিমে ভেজা বিশাল একটা মাঠ সামনে

পড়ে, তিনি যেন সেই পথ দিয়ে চলে গেছেন আমাকে না ডেকে।

তারপর থেকে আমি হাতড়ে যেটুকু জায়গা পেয়েছি, সেখানে পা রাখার চেষ্টা করছি। এ-জায়গাটুকুই আমার সম্বল। আমার বিশ্বাস।

সুহাস এসে বসল। হাতে চায়ের কাপ। সকালে অফিস যাবার তাড়ার মধ্যেও সে খানিকটা সময় আমার ঘরে এসে কাটিয়ে যায়। চা খেতে-খেতে কথা বলে, খবরের কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নেয়।

ঘরে এসেই সুহাস বলল, "কাল একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে, শচিদা। তোমার জন্যে একটা ওষুধ ছিল, রাত্রে খাবার কথা, শোবার আগে। ওষুধটা এনেও আমি পকেটে রেখে দিয়েছি, একেবারে ভুলে গেছি বলতে। যখন মনে পড়ল, অনেকটা রাত; তুমি শুয়ে পড়েছ, আর তোমায় ওঠাতে ইচ্ছে হল না। আজ থেকে শুরু করে দাও, ভাতটাত খেয়ে একটা খাবে, আর রাত্রে শোবার আগে আগে। আয়নাকে বলে দিয়েছি।"

কলকাতায় এসে পর্যন্ত সুহাসকে যা দেখছি তাতে আমার মনে হচ্ছে ওর অবস্থাটাই সবচেয়ে কাহিল, বিরক্তিকর। ছেলেবেলা থেকেই ও পরের হাতে গুছোনো। যখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে তখনও নিজের হাতে বড় একটা খেত না, জ্যাঠাইমা খাইয়ে দিতেন; ওকে জামা কাপড় জুতো মোজা তাও হয় জ্যাঠাইমা না হয় কাকিমা পরিয়ে দিতেন, মানু হিংসে করে বলত, 'রাজপুত্তুর রে'। সেই সুহাস বড় হয়েও অন্যের হাতে তার বারো আনা ছেড়ে দিয়েছিল। বেচারীর স্বভাবটাই হয়ে গিয়েছে ওই রকম, পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কলকাতায় ও অনেককাল ধরে আছে, কিন্তু ওর থাকাটা অন্যর ওপর যতটা নির্ভর করে নিজের ওপর ততটা বোধ হয় নয়। আমি সুহাসকে দেখি আর ভাবি, কী ঝঞ্ঝাটেই না জড়িয়ে পড়েছে বেচারী। আমার জন্যেই ওর কত ছুটোছুটি। অস্বস্তি হয়। বলতে পারি না। বলতে গেলে দুঃখ পাবে।

"আজ কেমন লাগছে তোমার?" সুহাস জিজ্ঞেস করল।

"ভাল না", আস্তে করে বললাম।

"ভাল না—" সুহাস আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

"তোরা আমায় ধরে বেঁধে কলকাতায় নিয়ে এলি। আমার মনটাই বসছে না, শরীরটাতে জুত পাব কী করে?"

"তুমি খানিকটা মন বসাবার চেষ্টা করো", সুহাস একটু হেসে বলল।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, হাসিটা পরিষ্কার নয়, ঝরঝরে নয়; আমায় যেন ভোলাবার চেষ্টা করছে।

আমি বললাম, "কলকাতা আমার ভাল লাগে না, তুই জানিস।"

"তুমি একেবারে বুড়ো হয়ে যাচ্ছ শচিদা, জ্যাঠামশাই ও-সব বললে মানায়, তোমার ভাল লাগে না বললে হয় না। যাক্‌গে, একটু বসিয়ে নাও। ও দু-চার দিন আরও থাকতে-থাকতে ঠিক হয়ে যাবে।"

ওর কথা বলার ধরন থেকে মনে হল, কলকাতায় আমার অন্নজলের দিন ফুরিয়ে আসার কোনো লক্ষণ আপাতত নেই। কথাটা আমি নিজে যে না ধরতে পেরেছি তা নয়, কলকাতায় আসার আগে থেকেই বুঝতে পেরেছি। সুহাসরা ভাবে, আমি বুঝি নি। আমায় হালকা করে কথা বলে ভুলোতে চায়। কিন্তু ওটা যে মিথ্যে এটা ধরতে কোনো অসুবিধে হয় না।

চায়ের পেয়ালা সরিয়ে রেখে সুহাস বলল, "আজকের কাগজ দেখেছ?"

"না।"

"কাগজটা আনাই।" সুহাস আয়নাকে ডাকতে লাগল।

আমি বললাম, "আজ তোদের কি রিপোর্ট আনার কথা আছে ডাক্তারের কাছ থেকে?"

সুহাস আমার চোখের দিকে তাকাল। "হ্যাঁ, আজ বিকেলে যাব। কেন?"

"জ্যাঠামশাই বলছিলেন।"

"যতীনের ডাক্তার, মানে আমাদের ডক্টর সামন্ত আজ দেখা করতে বলেছেন। কালকের ব্লাড রিপোর্টটা আজ সকালে উনি পেয়ে যাবেন। অফিস থেকে বেরিয়ে আমি আর অবিন ওঁর চেম্বারে চলে যাব।"

আয়না ঘরে এল।

"কাগজটা কোথায় রে?"

"আনো নি? টেবিলে পড়ে ছিল।"

"দিয়ে যা।"

আয়না কাগজ আনতে গেল।

আমি সুহাসকে দেখছিলাম। কাগজটা এলে সে মুখ আড়াল করতে পারবে।

"সুহাস!"

"বলো।"

"আজ ডাক্তারের রিপোর্ট পাবার পর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে তো?"

সুহাস কেমন শঙ্কিত হয়ে আমার চোখের দিকে তাকাল। সে ভয় পেয়েছে বোঝা যায়। "হেস্তনেস্ত—! মানে?"

"আমার অসুখের একটা হদিশ পাওয়া যাবে কিনা বলছি?"

সুহাস খানিকটা থমকে গেল। তারপর বলল, "তুমি শচিদা দিনদিন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছ। সামান্য একটা টাইফয়েড রোগ ধরতে এখনও ডাক্তারদের পাঁচ-সাত দিন কেটে যায়, আর এটা সবচেয়ে ডিফিকাল্ট জায়গার ব্যাপার। পেটফেটের রোগ ধরাই পড়তে চায় না। এই তো সেদিনই আমাদের অফিসের এক কোলিগ্‌, বছর খানেক ভোগার পর, ট্রপিক্যালে ভরতি হয়েছে। মাসখানেক

থাকতে হবে। একটা কোলাইটিসেই মাসখানেক, আর তুমি এক হপ্তার মধ্যেই এরকম একটা কমপ্লিকেটেড কেসের ডায়গনসিস চাও।"

আয়না কাগজ নিয়ে এল। সুহাস কাগজটা টেনে নিয়ে চোখ নামাল।

জানলার দিকে তাকাল আয়না; রোদ ঘরে এসে পড়েছে।

"শচিদা, তোমার ওষুধটা দিয়ে যাই।"

আমার পায়ের দিকের জানলা দিয়ে তাকালে দূরে একটা পুরনো বাড়ির মাথার গম্বুজ দেখতে পাই। তার চারপাশে অনেক পায়রা ওড়ে সারাটা সকাল। আমি জানলায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখেছি ক'দিন। বর্ষায় ওরা যেন মন খুলে উড়তে পারছিল না; আজ আবার দেখছি ঝাঁক বেঁধে উড়তে শুরু করেছে।

ওষুধটা খাওয়া হয়ে গেলে আমি সুহাসের দিকে তাকালাম। সে কাগজ দেখছে।

"অবিনবাবু আজ আসবেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সুহাস মুখ না তুলেই বলল, আসার তো কথা, আসবে নিশ্চয়।

সুহাস আর মুখ তুলবে না সহজে। আমি বিছানায় আস্তে-আস্তে শুয়ে পড়লাম।

বেলা হয়ে গেল অনেকটা। সুহাস অফিস চলে গেছে। জ্যাঠামশাই শুনলাম চিঠিপত্র লিখছিলেন। চিঠি লেখা শেষ করে জিরিয়ে স্নান করতে গেছেন। আমি বিছানায় শুয়ে থাকতে-থাকতে তন্দ্রার মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভাঙার পর জেগে আছি, রোদটা আমার বিছানার পায়ের তলা দিয়ে সরে যাচ্ছে। পা জ্বালা করছিল। আষাঢ়ের রোদে তাত রয়েছে বেশ। পাখাটা ধীরে-ধীরে চলছে। দুটো মাছি উড়ে এসেছে বিছানায়। ঘরদোর পরিষ্কার করার পর হয়ত কোনো কোণা থেকে উঠে এসেছে।

পা টেনে নিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকতে-থাকতে আমার মনে হল, শরীরটা এখন ভালই লাগছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে যেমন লাগছিল তেমন আর নয়। বোধ হয় সকালের স্বপ্নটাই আমায় কেমন দুর্বল করে তুলেছিল। এরকম স্বপ্ন আগে আমি আর দেখি নি। অন্যভাবে কখনো মেজকাকি, কখনো বাবা কিংবা ছোটকাকাকে, বা আর কাউকে হয়ত দেখেছি। কিন্তু এমন নয়। আমার খুড়তুতো বোন শান্তাকে কিছুদিন আগেই একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম, শান্তা স্নান করে উঠোনে দাঁড়িয়ে চুল ঝাড়ছে। শান্তাকে আমি খুব ভালবাসতাম। শান্তা আর আমার মধ্যে বয়েসের তফাত ছিল কম। বছর চারেকের। আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা ভাই-বোনেরও বেশী—বন্ধুর মতন ছিল; পরস্পরকে আমরা সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ও অবলম্বনের পাত্র করে নিয়েছিলাম। যে-পরিবারে সবই অনিশ্চিত, যখন তখন দমকা বাতাসের মতন মৃত্যু এসে এক-এক করে সকলকে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে আমরা একই

পরিবারের দুটি ছেলেমেয়ে যে পরস্পরকে অবলম্বন করব এটা স্বাভাবিক। শান্তা একটা ভাল কথা বলত। বলত: 'দেখ্ দাদা, আমরা হলাম এক জোড়া ইঁদুর; এ বাড়িটায় প্লেগ লেগেছে, ধাড়িগুলো সব মরে গেল; এবার তোর আর আমার পালা; নেঙটি দুটো ভয়ে ছোটাছুটি করছি।' শান্তা ঠিকই বলত। আমরা তখন জোড় বেঁধে থাকতাম, জোড় বেঁধে ছোটাছুটি করতাম।

শান্তার গড়ন ভাল ছিল না। বড় রোগা ছিল। রঙ ছিল কালো। মাথাতেও বেশ লম্বা। কিন্তু তার মুখটি ছিল বড় সুন্দর। অমন প্রতিমার মতন চেরা-চেরা চোখ আমি আর অন্য কোনো মেয়ের দেখি নি। বাবার আত্মহত্যার পর শান্তার মাথায় কি যেন বাতিক ঢুকল, সে খুব ছটফট করতে লাগল। আমায় বলত 'আর নয়; চল্ আমরা পালিয়ে যাই।'

আমি বুঝতে পারতাম না আমরা কোথায় পালিয়ে যাব! শান্তার খুব বিশ্বাস ছিল, আমাদের ঘরবাড়ি, শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলে আমরা বেঁচে যেতে পারব। সে আমায় লক্ষ বার বলেছে, 'এখানে আর থাকিস না চল পালাই।' সে আমায় অনেক করে বুঝিয়েছে, এইভাবে বসে থাকলে আমরা মরব। আমি জানতাম না, কোথায় পালাব। মেজকাকি তখনও বেঁচে, ছোটকাকি পাগল। আমার পালাবার পথ কোথায়!

শেষে শান্তা একদিন বলল, তুই মানুর জন্যে পালাতে পারছিস না। তা হলে থাক বসে, দেখব কেমন তোর মানু তোকে বাঁচায়।

ভূপতি বলে একজন আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করত। সম্পর্কে আত্মীয়। শান্তার সংগে তার আড়ালে কিছু মেলামেশা হল। শান্তাই বোধ হয় গা করেছিল। তারপর ওদের বিয়ে হয়ে গেল। আমার বরাবর ধারণা, শান্তা এ-বাড়ি থেকে পালাবার জন্যে এমন পাগল হয়ে উঠেছিল যে কোনো বাদবিচার করে নি। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে সে বিয়ে করে ভূপতির সংগে অন্য জায়গায় চলে গেল, তার গোত্র বদল হল, কিন্তু ভাগ্য নয়, বেচারী ছেলে হতে গিয়ে মারা গেল। শান্তা মারা যাবার পর আমি স্বপ্ন দেখতাম, দুটো ইঁদুর সারাবাড়ি ভয়ে ছুটোছুটি করতে করতে একটা ইঁদুর সদর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। অথচ তার পালানো হল না, একটা বেড়াল এসে খপ করে ধরে ফেলল।

শান্তার একটা কথা হয়ত ঠিক। আমার কাছে মানুর তখন খুব মূল্য। মানুকে আমি ভালবাসতাম। আমার চারপাশে যখন অত অপঘাত আর মৃত্যু, তখন সেই আতঙ্ক থেকে নিজেকে ভোলাবার ওই একটি স্বপ্নই দেখতে পারতাম। কতদিন আমি ঘরের মধ্যে জানলা খুলে বসে-বসে ভেবেছি, আমার অত ভয়ের কী আছে—মানু আমায় বাঁচাবে। সাবিত্রীর মতন। মানু আর আমি ঠাট্টা তামাশা করে সাবিত্রী-সত্যবানের কথাও বলেছি কতবার। মানু—মোহিন হেসে বলত: 'তোমায় অত হাসতে হবে না, যখন সাবিত্রীর দরকার হবে, দেখতে পাবে।' আমার যে কোনো জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না, তা নয়, সংসারে অনেক অবিশ্বাস্য মানুষ এক-এক সময় বিশ্বাস করে নিতে চায়। আমার আবার নানারকম বিশ্বাস ছিল।

মানু আমায় হয়ত বাঁচাতে পারবে—এমন বিশ্বাসও আমার ছিল।

পরে যখন বুঝতে পারলাম, মানুদের বাড়িতে কেউ আর মানুকে সাবিত্রী সাজাতে রাজী নয়, তখন আমার দুঃখও যত হয়েছিল, গ্লানিও ততটা কমেছিল। এ-এক অন্যরকম গ্লানি। মানুর সঙ্গে আমার বিয়ের পর আমি যদি মরে যেতাম, শান্তা যেমন গেল, তখন কী হত মানুর? তাকে বিধবা হয়ে থাকতে হত। আমাদের পরিবারে এসে তার ভাগ্যেও কী ঘটত কে বলতে পারে!

একদিকে আমি যেমন মানুর আশা করতাম, অন্যদিকে আমার ভয়ও ছিল, মানুর আমি ক্ষতি করব। এই টানাপোড়নের জন্যে আমার কোনো জোর ছিল না। আমি দুর্বল হয়েই থাকতাম। মানুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ভেঙে গেল।

মানুকে আমি জন্ম থেকে জানি। তার আমি নিন্দে করতে পারি না। ভগবান তাকে যতটা দিয়েছেন তার বেশীই বোধ হয় ফেরত নিয়েছেন। তার রূপে কোনো খুঁত আমার চোখে পড়ে নি, সে অসম্ভব বুদ্ধিমতী, তার স্বভাবে ছেলেমানুষীর চেয়ে গাম্ভীর্য বরাবরই বেশী, তার সাহসের অভাব নেই, ধৈর্য-স্থৈর্যও যথেষ্ট; তবু বলি, মানুকে দেখে দেখে আমি তাকে চিনতে শিখেছি। সে হল সাগরের তলায় ডোবা বরফ-পাহাড়ের মতন। বাইরে থেকে তাকে যতটা দেখা যায়, আড়ালে তার বহু গুণ লুকোনো থাকে। মানুকে সেখানে দেখা যায় না। তার চরিত্রের যেটা লুকোনো জায়গা, সেখানে সে বড় বিচিত্র। মানু যে কতটা অহংকারী বাইরে থেকে ধরা যাবে না। তার বারো আনা অহংকার আর আমিত্বে ভরা। নিজেকে সে এত বেশী দাম দিয়েছে যাতে তার অভিমান গিয়েছে বেড়ে, অকারণে। সে নিজের মর্যাদা বাঁচাতে খুব ব্যস্ত, যেন নিজে না বাঁচলে ওটা বাঁচবে না। মানুর আরও অনেক দোষ আছে যা আমার চোখে লাগে। কিন্তু আজ আর তার ফিরিস্তি করে কী লাভ! আমি তাকে ছোট বয়েস থেকে দেখছি।

মানু যত বয়েসে বেড়েছে ততই তার লুকনো চরিত্রটা বড় হয়েছে। তাকে ধরা-ছোঁওয়া একটা বয়স পর্যন্ত সম্ভব ছিল, পরে সে কোন্ মোহিন হয়ে গেল আমি আর বুঝতে পারি নি।

শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটিয়ে চলে আসার অনেক পরে একদিন কথায়-কথায় আমি মানুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এবার তুমি কী করবে?"

"কেন?"

"তোমার নিজের জন্যে কিছুই চাও না?"

"জানি না।"

"তুমি আজকাল বড় রুক্ষ করে কথা বলো মানু।"

"ভাল না লাগলে কথা বলো না।"

কী ভেবে আমি হঠাৎ বলে ফেলেছিলাম, "তুমি এইভাবে চলে না এলেও

পারতে।”

“মানে?”

“মানুষের অনেক মোহ এক সময় কেটে যায়। ভুলটাও হয়ত শুধরে নেয় তখন। সেই সুযোগ আর থাকল না।”

মানুর চোখমুখ রাগে টকটকে হয়ে উঠেছিল। বলল, “কার কী কাটবে, কে কবে ভুল শুধরে সাধু হয়ে যাবে তার জন্যে বসে থাকতে আমি জন্মাই নি। আমি যা করেছি ভাল বুঝেই করেছি। তুমি ভাবছ, একটা কুষ্ঠ রোগী ঝোলা করে পিঠে বয়ে বেড়াতে পারলেই মেয়েজন্ম সার্থক হয়। আমায় ওসব কথা আর বলো না।”

আমি তার কিছু বলি নি। আমার সঙ্গে মানুর বিয়ে হলেও তো মানু বলতে পারত, একটা মরা মানুষকে বাঁচাতে আমি আসি নি। আমার ওপরে যে তার একটা রাগ আছে এটা ধরা যেত। সেদিনও ধরতে পেরেছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারি নি। মানু কি নিজে খুব সতর্ক, সাবধানী ছিল না? সে তো তেমন করে কোনোদিন আমায় বলে নি, আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তার ভাগ্য জড়াবার জন্যে সে সত্যি-সত্যি সব কিছু ছাড়তে পারে! মানু সেটা পারত না। তার বাইরের চার আনা বলত, সে পারে; ভেতরের বারো আনা জানত, পারে না।

সেই পুরনো মানু অবশ্য এখন আর নেই। তার কত কী বদলে গেছে। কিন্তু মানুর মনে-মনে যা ঘটেছে আমি তা বুঝতে পেরেছি। সে আর পেরে উঠছে না।

হঠাৎ বাইরে থেকে আয়নার ডাক শোনা গেল। তারপর সে ঘরে এসে দাঁড়াল।

“শচিদা, স্নান করতে যাও।”

“কটা বাজল রে?”

“প্রায় এগারো।”

আয়নার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে মনে হল, তার চোখমুখ কেমন চকচক করছে। হাসির কিছু ঘটছে নাকি?

“কী হয়েছে রে?”

“কিসের?”

“হাসছিস যেন।”

আয়না একটু হেসে বলল, “দিদির চিঠি এসেছে। পড়ছিলাম। দিদির আর ভাল লাগছে না একলা।”

বিছানা থেকে উঠতে-উঠতে বললাম, “কলকাতায় আসতে লিখে দে।”

“কলকাতায়! কেন, আমরা বুঝি আর ফিরব না?”

“না।” বলেই আমি আয়নার দিকে তাকালাম। অসাবধানে কথাটা আমার মুখে এসেছিল। শুধরে নিয়ে বললাম, “তোরা ফিরবি। আমি আর ফিরব না।”

সারাটা দুপুর আমার মনের মধ্যে ওই কথটা ঘুরে-ঘুরে বাজতে লাগল: আমি আর ফিরব না, আমি আর ফিরব না। দুপুরটা কোন্ দূর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আমার খেয়াল নেই। রোদের তার আটকাবার জন্যে জানলা ভেজানো, ঘরের মধ্যে ঝাপসা হয়ে আছে, পাখাটা মাথার ওপর চলছে, একটা শব্দ ক্রমাগতই মাথার ওপর টিকটিক করছে, পাখার আওয়াজ, ঘরের ক্যালেণ্ডারটা মুখোশের মতন ঝুলছে, নীচে সাড়াশব্দ কম, আয়না সুহাসের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে আছে, জ্যাঠামশাই শুয়ে আছেন নিজের বিছানায়। আমার পায়ের তলায় ঘাম জমছিল, হাতের চেটো ভিজে যাচ্ছিল। আর এই দুপুরবেলার স্তব্ধ, আঁধার-করা ঘরে আমার মনের কাছে মস্ত একটা ভোমরা যেন উড়ে-উড়ে ওই গুঞ্জনটা শুনিয়ে যাচ্ছে—আমি আর ফিরব না, আমি আর ফিরব না। এমন আশ্চর্যভাবে ওটা গুনগুন করছিল যে আমি ভোর রাতের স্বপ্নটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি-লাম। আর সেই স্বপ্নের ধ্বনির সঙ্গে 'আমি ফিরব না' গুঞ্জনটা কেমন মিশে যাচ্ছিল।

ছেলেবেলায় আমি খুব ঘুম কাতুরে ছিলাম। ঠেলাঠেলি করেও সহজে কেউ আমায় জাগাতে পারত না, খানিকটা বেলা করে উঠে চোখমুখ ধুয়ে যখন মার কাছে যেতাম, মা বলত: 'তুই এত বেলা করে উঠলি, সবাই কখন উঠে গেছে।' আমার মনে হল, মা যেন এখনও অনেকটা সেই একইভাবে বলছে, 'তুই এখনও পড়ে আছিস, সবাই কখন এসে গেছে।' মার একথা বলা সাজে। আমাদের যে যেখানে ছিল সবাই চলে গেছে, শুধু আমি পড়ে আছি। আমার এত দেরী সাজে না।

কোনো কোনো অঘটন সংসারে ঘটে যায়! কেন ঘটে যায় কেউ জানে না। আমাদের পরিবারের যতগুলো অঘটন ঘটেছে তার সঙ্গে আমার এই বেঁচে থাকাটাও অঘটন। আমার এতদিন বেঁচে থাকার কথা ছিল না। আমি আশা করি নি ভগবান আমায় এতটা আয়ু দিতে পারেন। কেন যে দিয়েছেন তাও জানি না।

এবার যখন অসুখ করে, ডিমুরির হাসপাতালে পড়েছিলাম অনেক দিন, তখন যারা আমায় সাধ্যাতীত যত্ন করেছে তার মধ্যে রামপ্রকাশ আমার পুরোনো বন্ধু। তার ডাক্তারি বিদ্যেটা মোটামুটি ভালই জানা। পাটনা থেকে পাশ করে সরকারী হাসপাতালে কাজ করছে অনেকদিন। রামপ্রকাশ আমার দেখাশোনার ভার দিয়েছিল মায়াবতীর ওপর। মায়াবতী আমার সেবাশুশ্রূষা করত। ও ঠিক বাঙালী নয়, বেহারী বলেও মনে হত না। ওর বাবা নাকি বাঙালী ছিল, মা ছিল আদিবাসী। রাঁচির দিকে মিশনারিদের কাজ করত বাবা, মা ছিল মিশনারী মেয়ে স্কুলের আয়া। দুজনেই কবে মারা গেছে। মায়াবতী কিশোরী বয়স থেকেই হাসপাতালে ঢুকেছে। তারপর আজ সে বড় নার্স।

হাসপাতালে মায়াবতীর নাম ছিল মায়া। আমিও তাকে মায়া বলতাম। তার চেহারাটা ছিল শক্ত, গায়ের রঙ ছিল কালো, মুখ ছোট আর গোল মতন, মাথার চুল ছিল কোঁকড়ানো। বছর বত্রিশ বয়েষ হয়েছিল মায়ার।

আমার সঙ্গে মায়ার খুব হৃদ্যতা হয়েছিল। সে তার নিজের কথা বলত, আমি আমার কথা। আমরা পরস্পরের সুখদুঃখের কথা বন্ধুর মতন শুনতাম।

আমি মায়াকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই যে আমি আমাদের গোটা পরিবারের মধ্যে এখনও বেঁচে রয়েছি এটা কেমন করে সম্ভব হল? কেন হল? এই জীবনের দাম কী?

মায়া আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনে সহজভাবে বলল, 'ভাইয়া, বীজ যেতনা দিন মাটির আন্দারে থাকে উতনা দিন সে মালুম করতে পারে না মাট্টির উপার কিত্না আলো। তুমি ভাইয়া আন্দারে আছ।'

মায়া আরও বলেছিল : তুমি মাটি ফুঁড়ে চারা হয়ে পাত্তি সুদ্ধু উঠে পড় তখন তোমার মালুম হবে মাটির ওপর কত আলো, জল, বাতাস।

আমি ভেবেছিলাম, মায়া আমাকে ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা বলছে। সে কৃশ্চান। আমি যে ঈশ্বরবিশ্বাসী মায়াকে সে-কথাটা বললাম।

মায়া বলল, ভাইয়া তুমি ভয় পেয়ে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছ। তোমার কাছে ভয় বড়। ঈশ্বর ছোট। তোমার যখন ভালবাসা আসবে, তখন তোমার মালুম হবে।

হাসপাতাল থেকে চলে আসার পর আমি মায়াকে বলে এসেছিলাম, আমি আবার আসব। ভয় ফেলে রেখে আসব।

কিন্তু এ কী হল? আমার কানের কাছে সেই গুনগুন তো থামল না। কালো ভোমরাটা যেন আরও কত বড় হয়ে গুনগুন করে গাইছে : আমি আর ফিরব না, ফিরব না।

জানলার ওপর ঝুঁকে পড়ে আয়না রাস্তা দেখছিল। তার লম্বা বিনুনিটা পিঠের ওপর দুলছে। আমি ছিলাম বিছানায় বসে। সামান্য আগে সন্ধ্যে হয়েছে, ঘরের বাতিটা এখনও মিটমিটে, তেমন করে অন্ধকার জড় হতে পারে নি এখনও। জ্যাঠামশাই কাছাকাছি কোথাও হাঁটাচলা করতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে আমার কাছে বসে ছিলেন অল্পক্ষণ, তারপর জামা কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম করতে নিজের ঘরে চলে গেছেন। আয়না আমার কাছে অনেকক্ষণ আছে। নানারকম গল্প করছিল। একবার উঠে গিয়ে সুহাসের ঘরে রেডিয়ো খুলে দিয়ে এল। আবার পরে গিয়ে বন্ধ করে দিল।

আমার ঘরে একসঙ্গে গোটা ছয়েক ধূপ জ্বালিয়ে দিয়েছে আয়না। পাখার বাতাসে ধোঁয়া সারা ঘরে ছড়িয়ে গিয়ে গন্ধ উঠেছে। গুনগুন করে গান গাইছিল আয়না। গেয়ে-গেয়ে থেমে যাচ্ছিল, আবার গাইছিল।

হঠাৎ আয়না বলল, "দাদা আর অবিনদা আসছে।" বলে জানলার ওপর আরও ঝুঁকে পড়ল।

সুহাসরা আসছে শোনার সঙ্গে-সঙ্গে আমার বুকের মধ্যে কেমন এক অস্বস্তি হল। মাথার মধ্যে আচমকা কোনো স্নায়ু বা উপশিরা যেন ছিঁড়ে যাবার মতন হয়ে যন্ত্রণাদায়ক এক ঝিমঝিমে অনুভূতি সৃষ্টি করল কয়েক মুহূর্ত, চোখ বুজে এল। ঘরের আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না—আমি বুঝতে পারলাম না।

আয়না জানলা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কী যেন বলল, বলার পর সে যখন আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আস্তে-আস্তে আমি তার মুখ স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম।

"কী হল, শচিদা?"

"না, কিছু না। চোখটা কেমন করে উঠেছিল।"

"তাই বলো। আমি ভাবলাম তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে।"

"না-না। ...আজ বিকেলে একটু বেশী গরম-গরম লাগছে, না রে?"

"বেশ গরম।"

"আমারও ঘাম হচ্ছে। একটু জল খাওয়া।"

আয়না জল গড়িয়ে আনল। "তোমার মুখটা বেশ ঘেমেছে, শচিদা। পাখাটা বাড়িয়ে দিই?"

জল নিয়ে খাবার সময় মনে হল, আমার অন্ননালী বেশ শক্ত হয়ে রয়েছে। কষ্ট হল খানিকটা। আস্তে-আস্তে জল খেলাম।

আয়না হঠাৎ তার শাড়ির আঁচলটা আমার মুখের সামনে এনে বলল, "দেখি, তোমার মুখটা মুছিয়ে দিই।"

মুখ মুছিয়ে আঁচল সরাতে গিয়ে আয়না দেখল, আমার দু-চোখে জল ভরে উঠেছে। সে বুঝতে পারল না, আমার কী হয়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। আমার কী হয়েছিল—সে যে আমিও বুঝি নি। হঠাৎ জড়ানো কেমন এক শব্দ শুনে বুঝলাম, মেয়েটাও কেঁদে ফেলেছে। কেঁদে ফেলে আয়না আর দাঁড়াল না, পাখাটা বাড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল।

চোখ মুছে দেখি, আমার ঘর ফাঁকা; আলোটা সামান্য উজ্জ্বল হয়েছে, পাখার শব্দ বেড়েছে, সমস্ত ঘরের মধ্যে কেমন এক স্তব্ধ ভাব ফুটে আছে। আমার কানের চারপাশে যে-ভোমরটা সারা দুপুর আর বিকেল ধরে গুনগুন করছিল সে এখন আমায় আর উত্যক্ত করছে না। মনের মধ্যে কোথাও সে বসে পড়েছে। এ ঘরের কোথাও আমার মন ছিল না, চেয়ে আছি তো আছিই। মনে হচ্ছিল, শীতকালের দুপুরের মাঠে রোদের মধ্যে যেমন বিন্দু-বিন্দু

পোকা ওড়ে—সেই রকম পোকা উড়ে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে।

সিঁড়িতে সুহাস আর অবিনের পায়ের শব্দ আমার কানে আসে নি, হঠাৎ দেখলাম ওরা আমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে।

সুহাস চৌকাট থেকেই আমায় দেখতে-দেখতে বলল, "শচিদা, অবিন এসেছে। ও বসুক; আমি ধরাচুড়ো ছেড়ে আসি।"

দরজা থেকেই সুহাস চলে গেল। সে বোধ হয় ঘরে ঢোকার ভরসা পেল না। অবিন আমায় লক্ষ্য করছিলেন, আস্তে-আস্তে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"কী মশাই, কেমন আছেন আজ?" অবিন এগিয়ে এসে বললেন।

আমি তাঁকে দেখছিলাম। কলকাতায় আসার পর থেকে অবিন আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতিয়েছেন। প্রায়ই আসেন। বসে-বসে গল্প করেন। জীবনের একটা অফুরন্ত শক্তি যেন মানুষটির মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে। কথা বলেন উঁচু গলায়, হাসেন হোহো করে, বুদ্ধিটাকে এমন করে ফাঁস পাকিয়ে ছোঁড়েন অন্যের কথা আটকে যায়। আবেগ এলে চোখ দুটি ফুলকির মতন জ্বলতে থাকে। ওঁকে অন্যদিন যতটা স্বতঃস্ফূর্ত, নিশ্চিন্ত দেখাত আজ তার তারতম্য ঘটেছে কিনা দেখবার চেষ্টা করছিলাম।

"বসুন।"

"বসছি, বসছি। আপনার খবর কী বলুন?"

"এই তো।"

অবিন বসবার জন্যে চেয়ারটা টেনে নিলেন। "কেন? এই তো কেন? কী হল?"

আমি কোনো জবাব দিলাম না। অবিনের স্বাভাবিকতা আমার কাছে সন্দেহজনক হয়ে উঠছিল। ধুলোবালির মধ্যে ঘুরে বেড়ালে যেমন মুখে চোখে একটা পাতলা কালচে দাগ ধরে যায়, অবিনের মুখে সেই রকম কোনো ম্লান দাগ ধরে আছে। অবিনের কথা বলার মৃদু ধরনটিও আমার কানে লাগছিল।

"আপনি গিয়েছিলেন?" আমি আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম।

"কোথায়?"

"ডাক্তারের কাছে।"

অবিন আমার দিকে তাকিয়ে আর অজ্ঞ হবার চেষ্টা করলেন না। বললেন, "গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই ফিরছি। সুহাস ছিল।"

আমি অবিনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ডাক্তার কী বললেন জানতে চাইছিলাম। অবিনের কোনো ব্যগ্রতা নেই। যেন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সঙ্গে আমার আগ্রহের কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছেন না।

অবিনও আমায় দেখছিলেন। আমার স্পষ্টই মনে হল, অবিনের মুখে খুব পাতলা করে যে উদ্বেগের ভাবটা মাখানো ছিল তা গাঢ় হয়েছে। ওঁর চোখ দুটি নিশ্চিন্ত নয়। একবার পাখার দিকে তাকালেন, পাখাটা কত জোরে চলছে

দেখলেন যেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। "সারাদিন আপনি বুঝি খুব দুর্ভাবনায় কাটাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। কী বললেন উনি?"

অবিন সহজ গলায় কৌতুক করে বললেন, "ডাক্তাররা মেয়েদের চেয়েও অস্পষ্ট করে কথা বলে। মারাত্মক কিছু বললেন না অবশ্য। আপনাকে আরও কিছুদিন কলকাতায় থাকতে হবে।"

আমার কপালের ঘাম ভুরুর কাছে গড়িয়ে পড়ছিল। গলাটা শক্ত। বুকের তলায় নিশ্বাস জমে যাচ্ছিল। কয়েকটি মুহূর্ত কেমন ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। শেষে অবিনের দিকে তাকালাম। ওঁর মিথ্যেটা আমার কাছে ধরা পড়ছিল।

"শচিপতিবাবু?" অবিন হঠাৎ অন্যরকম ভাবে বললেন।

"বলুন।"

"আপনি এত ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন কেন?"

"না, না; আমি আর ব্যস্ত হচ্ছি না।" আমার গলার স্বর হঠাৎ ভেঙে যাবার মতন শোনাল। গলা পরিষ্কারের চেষ্টা করেও স্বর উঠল না কিছুক্ষণ।

অবিন কোনো রকম সাড়াশব্দ করলেন না। নীরব। আমি মুখের ঘাম মুছে নিলাম। হাত কাঁপছিল। তারপর হঠাৎ আমার মনে হল, ভোরবেলায় স্বপ্নের শচির মতন এবার আমায় সকলের মাঝখানে উঠে দাঁড়াতে হবে। কোথাও যেন আমার জন্যে খুব মৃদু করে খোল করতাল বাজতে শুরু করে দিয়েছে।

"অবিনবাবু—" আমি বললাম, "আমার একটু ভুল হয়ে গেল।"

অবিন আমায় দেখছিলেন।

"কলকাতায় আসার আগেই আমায় ডিম্‌রি যাওয়া উচিত ছিল।"

"ডিম্‌রি?"

"আমি ভেবেছিলাম, কলকাতা থেকে ফিরে ডিম্‌রি যেতে পারব।"

"যাবেন; পরে যাবেন—" অবিন বললেন।

"না।"

"কেন?"

"আমি আর ফিরে যাব না।"

অবিন আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর চোখের পাতা ছোট হয়ে এসেছিল। আমার চোখে-চোখে তাকাতে তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল।

"আপনি একটু ভরসা করুন," অবিন মৃদুস্বরে বললেন।

"না। আমি আশা-ভরসা করব না।"

দু-মুহূর্ত নীরব থেকে অবিন বললেন, "আশা ছাড়া আপনি কী করতে পারেন!"

"আমি কিছু করতে পারি না। কে পারে?"

"আপনি যা অনুমান করছেন তা নাও হতে পারে।"

"হবে। আমি জানি।"

অবিন থেমে গেলেন। তিনি জোর করে কিছু বলতে পারলেন না। আমার অবাক লাগছিল। এই অবিনকে কথায় থামানো আমার সাধ্য নেই। কিন্তু আজ তিনি কথা বলার জোর হারিয়ে ফেলেছেন। আমার বুঝতে কষ্ট হল না, ডাক্তারের কাছ থেকে কোনো সুসংবাদ নিয়ে আসতে পারে নি সুহাসরা।

বারান্দায় আয়নার গলা শোনা যাচ্ছিল। সুহাস সেই যে জামাকাপড় ছাড়ার নাম করে চলে গেছে এখনও ফিরে এল না। বোধ হয় স্নান করতে গেছে। কিংবা জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আড়ালে কথা বলছে। জ্যাঠামশাই ওদের ফেরার জন্যে উন্মুখ হয়ে বসেছিলেন। সুহাস কি তাঁর সঙ্গে এতক্ষণ কথা না বলে পারবে!

অবিনকে আমি ধরে ফেলতে পেরেছি। সুহাস আমার চোখের আড়ালে থাকলেও আমার অপেক্ষা করার কারণ ছিল না।

খুব আচমকাভাবে আমি বললাম, "ডিমুরি হাসপাতালে আমার এক বন্ধু ছিল, রামপ্রকাশ; সে আমায় বলেছিল—আমার এই অসুখটা চলতে থাকলে শেষে কী হতে পারে।"

অবিন যেন চমকে উঠলেন। তাঁর চোখ হঠাৎ উৎকণ্ঠায় কালো হয়ে গেল।

আমি বললাম, "আমার তখন থেকেই সন্দেহ ছিল, রামপ্রকাশ আমায় সত্যি কথাটা বলতে চায় নি তখন।...বললেই পারত।"

এমন সময় আয়না এল। অবিনের জন্যে চা এনেছে।

"আয়না, সুহাস কোথায় রে?"

"এই তো বাথরুম থেকে বেরুলো।"

"জ্যাঠামশাই ঘরে?"

"ছাদে গিয়েছেন।" বলে আয়না চলে যেতে যেতে আমার দিকে তাকাল, "তোমার জন্যে হরলিকস আনছি।"

আমরা চুপচাপ। অবিন চা খেতে লাগলেন।

আমি বললাম, "অবিনবাবু আমার একটা কথা মনে পড়ছে। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে পুরনো কুয়োটা একবার শুকিয়ে গেল। গরমকালে বালতি ডুবত না। বাবা তখন বেঁচে, সবাই বেঁচে, বাবা আর-একটা নতুন কুয়ো খোঁড়াতে বসলেন। তিন চারটে জায়গায় চেষ্টা হল, হাত কয়েক খোঁড়ার পরই বড় বড় পাথরের চাঁই। শেষে বাড়ির বাইরের দিকে একটা কুয়ো খোঁড়া হল। আপনি সেটা দেখেছেন। পুরনোটায় ততদিনে আবার জল আসতে শুরু করেছে, পাথর চাপা দিয়ে সেটা তখন বোজানো হল। আমার হল সেই অবস্থা। আমি আমার পুরনোটাকে পাথর চাপা দিলাম, নতুনটা আমার কাজে আসবে না।"

অবিন অন্যমনস্ক ছিলেন। তাকালেন। "আপনার পুরনোটা কী?"

"আমি আমার ভাগ্য স্বীকার করে নিয়ে ছিলাম। যা ঘটত সেটা আমার

জানা ছিল বলে আমি ভেবেছিলাম, যে ক'টা দিন সুযোগ পাই কিছু একটা নিয়ে থাকব। মায়াকে বলে এসেছিলাম, আমি ফিরে যাব, ভয়-ভাবনা ফেলে রেখেই আসব। আমার আর যাওয়া হল না।"

অবিন যেন আমার হাহাকারটা অনুভব করবার চেষ্টা করলেন। কিছু ভাবছিলেন। পরে বললেন, "আপনি মৃত্যু নিয়ে সারাটা জীবন ভাবলেন, জীবন নিয়ে ভাবলেন না কেন?"

আমি অবিনের চোখের দিকে তাকালাম, প্রশ্নটা আমার কাছে নতুন নয়। বললাম, "মানুষের মতি একরকম নয়। আমাদের সংসারে যেভাবে সব ঘটে গেল তাতে আমার মন স্বাভাবিক থাকতে পারল না। মৃত্যুর চিন্তাই আমায় টানল।"

"অন্যদিকে টানলে কিছু পেতেন।"

"কী পেতাম?"

"কিছু পেতেন না?"

সামান্য চুপ করে থেকে আমি বললাম, "হয়ত অল্পস্বল্প কিছু পাওয়া যেত। সে তো এদিকেও পেয়েছি।"

"কী পেয়েছেন?"

"কী পেয়েছি—! জ্যাঠামশাই, আয়না, সুহাস, আপনাদের সহানুভূতি। বন্ধুত্ব। যদি বলেন আরও কী—তাহলে বলব, আমার বন্ধু রামপ্রসাদ, মায়া..."

অবিন আমার চোখে চোখে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, "মোহিনী?"

আমি অবিনের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল শিখার মতন জ্বলছে। সমস্ত দিনের বেদনার তলায় এই একটি গভীর, সুপ্ত অভিমান যেন কেমন করে চাপা ছিল আমার। সেটি যে এত দুঃখদায়ক আমি জানতাম না।

মাথা নেড়ে বললাম, না পাই নি। মুখ ফুটে কথাটি আমার বলা হল না।

দুজনে মুখোমুখি নীরব হয়ে বসে আছি, অবিন মৃদুস্বরে বললেন, "আপনি ভাগ্যহীন।"

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে অবিন একটা সিগারেট ধরালেন। জ্যাঠামশাই ছাদে আছেন জেনেই বোধ হয় সিগারেটটা ধরিয়ে নিলেন। সামান্য সময় আস্তে-আস্তে সিগারেট খেলেন। তারপর বললেন, "শচিবাবু, আমায় একটা কথা বলুন।"

"কী কথা?"

"মৃত্যু কী?"

"জানি না। মানুষের জন্ম অজ্ঞেয়, মৃত্যু অজ্ঞেয়।"

"যা অজ্ঞেয় তার কোনো পরিচয় নেই। আপনি তার পরিচয়ের জন্যে এত অধীর হলেন কেন?"

"জানি না। ভগবানও অজ্ঞেয়। তবু আমরা তাঁর জন্যে অধীর হই।"

"আপনার ভগবানকে আমি আঘাত করতে চাই না। কিন্তু মানুষ মিথ্যার বেলায় যত অধীর হয়, সত্যের বেলায় হয় না।"

"বিশ্বাস মানুষকে অধীর করে। জগতে বিশ্বাসের জন্যে কত জীবন দুঃখ সয়েছে তা তো আপনার অজানা নয়।"

"আর জীবন?"

"শাস্ত্রে জীবনকে জ্ঞেয় বলা হয়েছে।"

"শাস্ত্রের কথা থাক; আপনার কথা বলুন।"

আমার বলার কথা ছিল না। ভেবে দেখবার চেষ্টা করলাম। জীবনকে আমি ততটুকু জেনেছি যতটুকু সে আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে। মায়ার কথা আমার মনে পড়ল। আমি তো তাই, মাটির তলায় চাপা পড়ে আছি, আমার না হল অঙ্কুর হয়ে ফুটে ওঠা, না জানলাম বাইরের আলো বাতাস সংসারকে কেমন করে সজীব করে রেখেছে।

"জীবনও আমি ঠিক জানি না, অবিনবাবু। সে আমার শরীরে ছিল, মনে ছিল না।"

সুহাস ঘরে এল। স্নান করে এসেছে। তার গায়ের পাঞ্জাবির বুকটা খোলা। বোতাম নেই। ঘরে এসে সে অবিনের দিকে তাকাল প্রথমে, তারপর আমার দিকে।

সুহাস এসে আমার বিছানার একপাশে বসল। আমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। এখনও তার সেই ছেলেমানুষী, নিজের কথা অবিনকে দিয়ে বলাতে চায়, তার চোখ বার-বার অবিনের দিকে সরে যাচ্ছিল। একেবারেই এলোমেলো ক'টা কথা বলল সুহাস: আজকের গরম, জলে ক্লোরিনের গন্ধ, তারপর থেমে গেল।

আয়না আমার হরলিকস নিয়ে এসেছিল। সুহাসকে চা দিয়ে একটু দাঁড়িয়ে থাকল। অবিন দু-চারটে হাসিঠাট্টার কথা বললেন আয়নাকে। আয়না হাসতে-হাসতে চলে গেল। তার মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই সন্ধ্যেবেলা ওই মেয়ে কান্না সামলাতে-সামলাতে পালিয়ে গিয়েছিল এখান থেকে।

অবিনই কথা শুরু করলেন, যেন আমাদের আগের কথাবার্তার জের টেনেই। অবিন হেসে-হেসে বললেন, "বুঝলে সুহাস, ছেলেবেলায় সেই যে একটা পদ্য পড়তাম—নাহি কিরে সুখ, নাহি কিরে সুখ—শচিপতিবাবু ছেলেবেলা থেকেই সেই পদ্যটার সার জেনে নিয়েছেন। এই ধরণীটা ওঁর কাছে কেবল বিষাদময়।"

সুহাস আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম, "সংসারে অনেকের কাছে জগৎ যে সুখময় হয়ে ওঠে না।"

অবিন বললেন, "না জিনিসটাকে আপনি এমন করে আঁকড়ে ধরেছেন যে তাকে হ্যাঁ করানো মুশকিল। দু-রকম মানুষ থাকে, একদল চায় আজকের জন্যে বাঁচতে, অন্যদল চায় কালকের জন্যে। প্রথমটাই দলে ভারী। আপনি না আজ, না কাল..."

সুহাস বলল, "শচিদা, তুমি মাথা থেকে এসব ভাবনা নামিয়ে ফেল। কী হবে, না হবে—এসব আগে থেকে ভেবে-ভেবে মর কেন? যা হবার হবে, যখন হবে তখন হবে। কে কবে মরবে সেটা ভেবে যদি বসে থাকতে যায় তবে তার কোনো কাজটাই হয় না।"

আমি বললাম, "আমার কাজটা কী এবার বল?"

সুহাস চমকে উঠল। তার হাতের চায়ের কাপ বোধ হয় সামান্য কাঁপল। অবিনের দিকে তাকাল সুহাস।

অবিন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমরা যতটা বুঝলাম তাতে মনে হল, ডাক্তার চাইছেন, আপাতত আপনাকে কলকাতায় থাকতে হবে।"

"জানি।" আমার মাথা সামান্য নড়ল।

সুহাস ভাঙা-ভাঙাভাবে বলল, "বাড়িতে ঠিক হচ্ছে না, বুঝলে শচিদা। বাড়িতে সব পারা যায় না, ফেসিলিটি নেই। হাসপাতালে কিছুদিন অবজার-ভেশানে না রাখলে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। খুব সিরিয়াস কিছু নয়, তবু..."

আমি সুহাস বা অবিনের দিকে তাকালাম না; দরকার নেই।

অবিন বললেন, "মাস খানেক হয়ত থাকতে হবে।"

আমি কোনো জবাব দিলাম না। সুহাস আস্তে-আস্তে চাটুকু শেষ করল। অবিন নীরব। ঘরের মধ্যেটা একেবারে স্তব্ধ, কান পাতলে আমাদের তিনজনের নিশ্বাসের শব্দও শোনা যায় হয়ত। রাস্তা দিয়ে প্রকাণ্ড একটা গর্জন চলে যাচ্ছে, কোনো বিশাল লরি যাচ্ছে বোধ হয়। বাড়ির ভিত কাঁপছিল।

বাড়ির ভিত, নাকি আমি কাঁপছিলাম। আমার সমস্ত দেহ ভেতরে কোথাও কেঁপে উঠছিল। এ যেন আজ ভোরবেলায় দেখা স্বপ্নের শেষ। আমায় জোর করে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমার গান গাওয়ার পালা শুরু হল। সকলেই স্তব্ধ হয়ে আমায় দেখছে।

কখন দেখি সেই কাঁপুনি কমে এসে আমার শরীর অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। আমি নিজেকে অনুভব করতে পারছি।

সুহাসের দিকে চোখ পড়ল আমার। উদ্বিগ্ন মুখ করে বসে আছে। অবিনকে দেখলাম, তাঁর নিবিষ্ট চোখ, উদ্বিগ্ন মুখ।

সুহাসের দিকে তাকিয়ে আমি আস্তে করে বললাম, "হাসপাতালে যেতে হবে?"

"যত তাড়াতাড়ি হয়।"

"ঠিক করেছিস?"

"হাসপাতাল!...হ্যাঁ, মানে ইন্দুমতীদের হাসপাতাল...। ওটা ভাল হবে। ইন্দুমতী রয়েছে।"

"বেশ। তাই হবে।"

সুহাস বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, "আসছি।"

অবিন আমার সামনে বসে থাকলেন।

আমরা মুখোমুখি পরস্পরকে লক্ষ্য না করেই অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। শেষে অবিন বললেন, "আপনি ভয় পাবেন না।"

"না। আমি পাই না।"

"মৃত্যুও কখনো-কখনো সুন্দর হয়, জীবনের চেয়ে উজ্জ্বল হয়। হয় না? আপনি জানেন।" অবিন সামান্য বসে থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

বারান্দায় জ্যাঠামশাইয়ের পায়ের শব্দ শোনা গেল। তিনি আসছেন। অবিনকে আর দেখলাম না।

জ্যাঠামশাই একটু আগে উঠে গেলেন। তাঁর শুতে যাবার সময় হয়ে গিয়েছিল। খাওয়াদাওয়া শেষ করে এসে তিনি অনেকক্ষণ আমার কাছে বসে ছিলেন। কথাবার্তা কমই বলেছেন, যেটুকু বলেছেন তাতে বোঝা যায়, তিনি নিজেই যেন বিমূঢ়। আমার মনে ভরসা জোগাবার জন্যে তিনি কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না।

সুহাসকে আমি আর দেখি নি। অবিন যাবার মুখেমুখে সেই যে 'আসছি' বলে পালিয়ে গেল, আর এল না। তার সাড়াশব্দ না পেয়ে আমি ভাবছিলাম, সুহাস পাশের ফ্ল্যাটে আশুবাবুর কাছে গিয়ে বসে আছে। পরে আয়নার মুখে শুনলাম ও ইন্দুমতীদের বাড়ি গিয়েছে।

ইন্দুমতীকে আমি দেখেছি। আমরা কলকাতায় আসার পর একদিন সে এসেছিল। সুহাসই বোধ হয় আসতে বলেছিল। আজ সুহাসদের ইন্দুমতীকে খুব দরকার। আমি বুঝতে পারছিলাম, হাসপাতালে ভরতির কথাবার্তা বলতে সুহাস ও-বাড়ি গিয়েছে।

খানিকটা আগে আবার সুহাসের গলা পেলাম। সে বাড়ি ফিরে এসেছে। আমার ঘরে আর আসে নি। নিজের ঘরে চলে গেছে।

এ-বাড়ির সাড়াশব্দ এবার থেমে আসছে। আয়না এসে আমায় শেষ ওষুধটা খাইয়ে চলে গেল। জ্যাঠামশাই নিজের ঘরে। সুহাস তার ঘরে শুয়ে পড়েছে। আয়না আমার ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যাবার পর খানিকটা সময় কেটে গেল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করার কোনো দরকার করে না, ভেজানোই থাকে।

বিছানায় শুয়ে থেকে-থেকে আরও খানিকটা রাত হল। বাড়িটা নিস্তব্ধ। বারান্দার দিকে কোথাও আর আলো জ্বলছে না। অন্ধকার।

আজ কোন্ পক্ষ, কী তিথি আমি জানি না। পায়ের দিকের খোলা জানলাটার দিকে তাকালে অন্ধকার বেশ ঘন দেখাচ্ছিল। হয়ত কৃষ্ণপক্ষ।

অমাবস্যা কাছাকাছি এসে গেছে।

আমি জানি না, মানুষের মধ্যে কোন্ বিচিত্র প্রকৃতি কাজ করে যাতে এক সময়ে যা তার সহ্যাতীত মনে হয়, অন্য সময়ে তা সহ্য হয়ে যায়, যা দুঃখ হয়ে বিরাজ করছিল হঠাৎ তা স্বাভাবিক হয়ে আসে। কলকাতায় আসার আগে থেকে আমার যত উদ্বেগ, আশঙ্কা, সন্দেহ, ভয়—এখন তার অশান্তি যে কোথাও আছে আমি আর অনুভব করছিলাম না। আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর আমার মন যেমন ব্যাকুল, শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল এখন তার অনুভূতি আমার নেই। আমি আর উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা বোধ করছি না। আমায় হাসপাতালে যেতে হবে জানার পর থেকে আমার সমস্ত ব্যাকুলতা হঠাৎ যেন শান্ত হয়ে গেছে। যা সত্য আমি তা গ্রহণ করে নিয়েছি।

এখন মায়ার বশে নিজের জীবনের দিকে ফিরে তাকালে আমার মনে হয়, আমি এক অন্য শচিকে দেখছি। সে আমার বড় নিজের অথচ তার সঙ্গে আমার একটা পার্থক্যও যেন রয়েছে। কেমন পার্থক্য আমি বলতে পারব না। ওই তো দেখছি সেই শচিকে যে বছরে ছোট, বড়-বড় চুল মাথায়, বোকার মতন চোখ, শীতকালের সকালে কিছুতেই লেপ ছেড়ে উঠতে চাইছে না, হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে আছে, বেলা বাড়ছে—বাড়ছে, রোদ এসেছে ঘরে, তবু জেগে-জেগে শুয়ে-শুয়ে তার মার্বেলের হিসেব, লাট্টুর হারজিতের কথা ভাবছে। মেজকাকি এসে লেপ টেনে উঠিয়ে দিল। 'ওঠ্, ওঠ্, কত বেলা হয়ে গেল, ছেলের আর চোখের পাতা খোলে না।' আমি কী ছাই উঠি! মেজকাকি আমায় ঠেলে উঠিয়ে গায়ে জাপটে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। মেজকাকির সেই মস্ত বড় মুখের গন্ধ, বুকের গন্ধ যেন আমার নাকে লেগে থাকল।

গরম জামাটা পরিয়ে ঢেকেঢুকে মেজকাকি আমায় মুখ ধোয়াতে বাইরে নিয়ে এল। আমাদের বাড়ির ভেতর বারান্দা তখন রোদে ভরে গেছে, মা রান্না-ঘরের কাছে উঁচু বারান্দায় মাথায় কাপড় দিয়ে একপাশে হেলে বসে, ছোটকাকি এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে, ছোটকাকির পায়ে রুপোর তোড়া, ডুরে কাটা রঙীন শাড়ি, মাথায় কাপড়, নতুন বউয়ের চেহারাটা তখনও মুছে যায় নি। আমার বাবাকে দেখছি না। অন্দরমহলে বাবা বড় একটা আসতে পারতেন না। মেজকাকা কাজেকর্মে বেরিয়ে যাবার আগে 'মেজবউ মেজবউ' করে বার দুই ডাকল, মেজকাকির সাড়া দেবার সময় নেই যেন। আমার মুখ মুছিয়ে মেজকাকি আমাকে মার দিকে ঠেলে দিয়ে চলে গেল। মার পাশে মোটা করে কম্বল পাতা, শান্তা তার ওপর বসে-বসে খেলা করছে রাজ্যের কাঠের পুতুল নিয়ে। বাচ্চা মেয়ে, মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল। মা আমাক বলল, 'এমন ঘুমকাতুরে ছেলে আর আমি দেখি নি। তুই কত ঘুমোতে পারিস রে? মেজো তোকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় উঠিয়েছে। আহ্লাদের পুতুল।' মা কী বলছে না বলছে আমার তাতে কান দেওয়ার দরকার নেই। ছোটকাকি আমার খাবার আনছে কিনা দেখবার জন্যে আমি রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে আছি।

এই আমার শৈশব। বাড়ির মধ্যে একটিমাত্র পুত্রসন্তান। শান্তা আছে। তবু আমার অধিকার খর্ব করার উপায় তার ছিল না। বাবা, মেজকাকা, ছোট-কাকা—এই তিনটি মানুষের বংশধারা আমি রক্ষা করছি এই বোধটুকু যেন আমার বেশ হয়ে গিয়েছিল। ছেলেবেলার এই হাস্যকর ধারণার মধ্যেও একটা সত্য ছিল। আমি সংসারে অকৃপণ স্নেহমায়া পেয়েছি। বাবার অভ্যেস ছিল সন্ধ্যেবেলায় একবার অন্তত আমায় ডাকতেন; তাঁর কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকতে হবে। বাবা আমায় মুখে-মুখে রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলতেন, মাঝে-মাঝে পদ্য করে। কাশীরামটাম তাঁর মাঝে-মাঝেই মুখস্থ ছিল। বাবার গলা ছিল বড় সুন্দর। ভরাট, উঁচু, মধুর। আমার মেজকাকা ছিল কর্মঠ মানুষ। পরিশ্রম করতে পারত, কাঠের কারবারে একাই প্রায় খেটে বেড়াত, জঙ্গলে জঙ্গলে এত বেশী ঘুরত যে মেজকাকি ঠাট্টা করে বলত, তোর 'জংলীকাকা'। মেজ কাকার বেশবাস ছিল একেবারে সাধারণ, কাকাকে দেখলে আমাদের বেহারীদের মতনই মনে হত, বেজায় এক গোঁফ রেখেছিল কাকা। শখের মধ্যে ছিল, কাকা মাঝে-মাঝে মাছ ধরতে যেত, আর যেত শিকার করতে। কাকা আমায় চার-পাঁচ রকমের পাখি এনে দিয়েছিল জঙ্গল থেকে। আমার খাঁচা ছিল পাখি রাখার। একটা পাখি ছিল খুব ছোট্ট, গায়ের রঙ ছিল কমলালেবুর মতন, একটু একটু সবুজ ছিল বুকের কাছটায়। কী নাম পাখিটার জানি না। আমি নাম দিয়েছিলাম 'টুনি'। পাখিটা ডাকত চিক্ চিক্ করে। ও কখনো চুপ করে থাকত না, খাঁচার মধ্যে সারাক্ষণ ফরফর করে উড়ত।

ছোটকাকা খানিকটা শৌখিন ছিল। চেহারাটাও ছিল ভাল। গান গাইতে পারত। ছোটকাকা কিছুদিন রাঁচিতে কী সব কাজকর্ম করেছিল। তারপর বনিবনা না হওয়ায় বাড়িতে এসে আমাদের ব্যবসাপত্র নিয়েই থাকত। মানুর বাবা আর ছোটকাকার মধ্যে একবার ব্যবসাগত ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য হয়। আমি ঠিক জানি না কী হয়েছিল। বাবা ছোটকাকাকে খুব ধমকে ধামকে দেয়। বাবা বলেছিল, 'খবরদার, মহেশকাকার ছেলেদের সঙ্গে তুমি জীবনেও গোলমাল করবে না। আমাদের যদি সব যায়, তবু ভি আচ্ছা। আমরা না খেয়ে মরব, তবু মহেশকাকার ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করব না। মহেশকাকা আমাদের বাবাকে মরার মুখ থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন।'

আমার শৈশব-বাল্য যেভাবে কেটেছে তাকে কুসুমাচ্ছাদিত বলা যায়। আমাদের করুণাস্যার ওই কথাটা বলতেন আমাকে। আর পাণ্ডেস্যার বলতেন, শচ্দুলাল। সেই থেকে বন্ধুরা আমায় ঠাট্টা করে বলত শচিদুলাল। আমার সেই বাল্যকে আজ আমার নিজেরই কেমন অচেনা লাগে। মনে হয় আমি, আজকের শচিপতি অনেক দূর থেকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছি, বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত এক মাঠে একটি প্রাণী পরম আলস্যে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। সে জানে না তার নিয়তি দূরে কোথাও অপেক্ষা করছে। সংসারের সেই নিবিড় স্নেহ, মায়ামমতা, ভালবাসার জগতে প্রথম যে বজ্রাঘাত ঘটে গেল তাতে আমার

ছোটকাকা মারা গেল। কাকা গিয়েছিল পাটনার দিকে, সেখান্ থেকে ঘুরে ঘুরে ডেহ্রি অন সোন্। কাজ সেরে ফেরার পথে কাকা ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল। মাঝ রাতে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, কাকা তখন নিজের জায়গায় ঘুমিয়ে। মাটিতে ছিটকে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই হয়ত মারা গিয়েছিল। হার্ট ফেল বলে শুনেছি।

কাকার তখনও সন্তানাদি হয় নি, ছোট কাকি পুরনো বউ হয়ে গিয়েছিল, তবু তার কোল ছিল খালি। ছোটকাকা মারা যাবার পর একদিকে কাকিমা অন্যদিকে বাবাকে সামলানো খুব মুশকিল হয়ে পড়েছিল। বাবা শুধু হাউমাউ করে কাঁদতেন, মেয়েদের মতন করে; আর কাকিকে দেখতাম ডানাছেঁড়া পাখির মতন সারা বাড়িময় ঝটপট-ঝটপট করে বেড়াত, না পারত দাঁড়াতে না পারত দু-দণ্ড কোথাও স্থির হয়ে থাকতে। আমার ছোটকাকির নাম ছিল প্রতিমা। কাকি দেখতে বড় সুন্দর ছিল। বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী বউ। কাকির সেই রূপ দুঃখশোকে পুড়ে দেখতে-দেখতে কালো হয়ে গেল। কাকির মাথার গোলমাল শুরু হল তারপর। মেজকাকা আর মেজকাকি শক্ত মানুষ। দু'জনে শক্ত হাতেই দু'জনকে ধরে রেখেছিল—আমার বাবা আর আমার ছোটকাকিকে। আমার মা বাবার মতন অত অধীর মানুষ না হলেও কাকার অভাবটা কেঁদে-কেটেই মেটাত। মা শ্বশুরবাড়িতে আসার পর ছোটকাকিকে নাকি স্নান করিয়ে কাপড় পরিয়ে দিয়েছে। মার এটা নিত্যকর্ম ছিল। ছোটকাকাকে গালমন্দ করতেও আমি মাকে দেখেছি।

ছোটকাকার মৃত্যু হয়ত আমাদের সংসারে ক্রমে-ক্রমে সহ্য হয়ে আসত। যে দুঃখটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল তখন, আস্তে-আস্তে হয়ত তা নিবেও আসত। কিন্তু ভগবান অন্য দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন। কোথাও কিছু নেই, মেজকাকা ঝড়বাদলের মধ্যে বজ্রাঘাতে মারা গেলেন। ছোটকাকা মারা যাবার পর বছর দুই কেটেছে সবে, আবার আমাদের সংসারে আকাশ ভেঙে পড়ল। কী শান্তভাবে সব হয়ে গেল। তখন বর্ষা চলছে। মাঝামাঝি বর্ষা। রোজই দু-এক পশলা করে বৃষ্টি আসে যায়। মেজকাকা সকাল বেলায় সাইকেল নিয়ে কাজে-কর্মে বেরিয়েছিল। কথা ছিল, ফিরে এসে খেয়েদেয়ে আমায় নিয়ে মণিলালদের পুকুরে মাছ ধরতে যাবে। আমি সেই লোভে স্কুলে যাই নি। চার তৈরী করে আমার জন্যে ছোট ছিপ সাজাচ্ছিলাম, হঠাৎ শুনলাম মেজকাকা নেই। তখন আমার বিশ্বাসই হয় নি। জন্মকাল থেকে দেখে আসছি—কত ঝড়বৃষ্টি হয়, কত বিদ্যুৎ ঝলকায়, বিশাল বিশাল বাজ পড়ে। কিন্তু সাধারণ একটা বাজ পড়ে মেজকাকা মারা যাবে এ কি বিশ্বাস হবার কথা! কিন্তু বিশ্বাস না হলেই বা কী, যা হবার তা হয়ে গেছে। কোনো রকম ঢাকঢোল না পিটিয়ে মৃত্যু এসেছিল, মেজকাকাকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

মেজকাকা চলে যাবার পর আমাদের সংসারের পিঠ গেল ভেঙে। কাকার পিঠ শক্ত ছিল বলে আমরা ঝড়-ঝাপটায় বেঁচে গেছি। আমার বাবা একদিক

থেকে অপদার্থ, অকেজো মানুষ। বাইরের ঝাপটা এবার গায়ে আসতে লাগল। মেজকাকা আর নেই, বাবাকে সামলাবারও কেউ থাকল না। বাবা পর-পর দুই ভাইয়ের মৃত্যুতে দিশেহারা। মেজকাকি একা আর ক'দিক সামলাবে! আমরা ভাঙতে লাগলাম।

ছোটকাকি তখন বেশ পাগল হয়ে গেছে। কাকিকে সামলানো মুশকিল। কত দিন এমন হয়েছে, জ্যোৎস্না উঠলে কাকি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে তরতর করে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে গেছে, গিয়ে জোরে-জোরে ছোট-কাকার সঙ্গেই যেন কথা কইছে এমনভাবে কথা বলেছে। ছোটকাকা একটু দুষ্টু ছিল। জ্যোৎস্না-টোৎস্না উঠলে কাকিকে চুপিসাড়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে মজা করত। কাকা নেই, তবু কাকির কাছে সেই ডাকটুকু যেন ছিল। কাকির জন্যে সিঁড়ির ঘরে তালা পড়ে গেল তারপর। কাকির শোবার ঘরেও মাঝে-মাঝে তালা পড়ত। শেষে কাকি ফাঁক পেলে নিজের কাপড়জামায় আগুন ধরাবার চেষ্টা করতে লাগল। বাবারও যেন এই সব দেখেশুনে কেমন হয়ে গেল। মাও তখন শয্যাশায়ী। শুয়ে থাকতে-থাকতেই এক অষ্টমী পুজোয় মা মারা গেল।

আমি জানি না বাবা কেন আত্মহত্যা করলেন। শোকতাপে অধীর হয়ে নিশ্চয়, কিন্তু বাড়িতে দুই বিধবা ভ্রাতৃবধূ, একজন অসুস্থ, আমার আর শান্তার মতন দুই ছেলেমেয়েকে রেখে বাবা কোন্ বুদ্ধিতে আত্মহত্যা করতে গেলেন। আমি কোনোদিন এটা বুঝতে পারি নি। কিন্তু বাবার মতন মানুষের পক্ষে হয়ত এটাই স্বাভাবিক, বুদ্ধি বিবেচনা আশা করা তাঁর মতন লোকের কাছে বোধ হয় যায় না। বাবা আত্মহত্যাও করেছিলেন আচমকা। একদিন শান্তার সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ গল্পটল্প করার পর বাবা নিজের ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পালটে নিলেন। বাইরে বাবার পোশাক পরে বাবা বেরোচ্ছেন দেখলাম। আমরা জানি বাবা বাইরে কোথাও গেছেন। হঠাৎ দুপুরবেলায় আমাদের বাগানের সবচেয়ে ভাল পেয়ারা গাছটার তলায় গলায় দড়ি দিয়ে বাবা ঝুলছে শুনে আমরা হাউমাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটলাম। গিয়ে দেখি, সবে ফুল ধরা পেয়ারা গাছের ঘন পাতায় বাবা কুয়োর জল-তোলা দড়িটা খুব নীচু ডালে বেঁধে ঝুলছেন। বাবার পা মাটি থেকে হাত দেড়েক মাত্র উঁচুতে। মাটিতে পা ঠেকে যাবার সম্ভাবনা ষোলো আনাই ছিল। তবু ঠেকে নি। এই আত্মহত্যাটা বড় অদ্ভুত, বিশ্বাস করা মুশকিল।

আমাদের ভরাট সংসার এইভাবে ফাঁকা হয়ে এল। যেন বাড়ির একটা থাম যেই ভেঙে পড়ল, অন্যগুলোও একে-একে ভেঙে পড়তে লাগল। বাবা গেল, ছোটকাকিকে রাঁচি পাঠাতে হল, শান্তা আর আমি ছিলাম, শান্তা গেল, থাকলাম শুধু মেজকাকি আর আমি।

মেজকাকি আমাকে দিয়ে বড় বাড়ির আওতার বাইরে ছোট করে একটা বাড়ি করাল। দুটো মাত্র ঘর; মাথায় টালির ছাউনি, একটু রান্নাঘর। বেড়া

দিয়ে কিছু চারাটারা পুতে দিলাম ফুলগাছের। আমাকে সেই বাড়িতে বসিয়ে, মাস দুই তিন কাকি থাকল। তারপর বলল, 'শচি, এবার আমায় যেতে দে। শেষ বয়সে ভগবানের সঙ্গে আমার ঝগড়াটুকু সেরে নেব।'

আমি হেসে বললাম, 'কাকি, তুমি তো কখনো ঝগড়া করো নি। কী করে করবে?'

'সে আমি করব। তোর কাকাকে চিতায় তোলার সময় আমি পা ছুঁয়ে বলে দিয়েছিলাম, তুমি এসো, আমি আসছি; আসবার আগে বিধাতা পুরুষের সঙ্গে আমার ঝগড়াটা সেরে আসব।'

'কী ঝগড়া তুমি করবে?'

'সে আছে। তুই বুঝবি না।'

'তুমি মাঝে-মাঝে চলে আসবে।'

'না বাবা, আর নয়। তুই বরং মাঝে-মাঝে চলে যাস। আমি যতদিন বেঁচে আছি তোর মাথায় যেন খাঁড়া না পড়ে।...শোন শচি, একটা কথা তোকে বলি, আমাদের এত যে ছারখার হল এর জন্যে আমি ভগবানকে দোষ দিই না। এ আমাদের কর্মফল। আসছে জন্মে এমনটি যেন আর না হয়।'

'তুমি আসছে জন্ম বিশ্বাস করো?'

'ও মা, বিশ্বাস করব না!'

'কেন করো?'

'কেন কিরে! বিশ্বাস না করলে শান্তি পাব কী করে?'

মেজকাকি কাশী চলে যাবার পর আমি একা। কাকি থাকতে-থাকতেই আমি বাউণ্ডুলে হয়ে পড়েছিলাম, বাড়ি ছেড়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতাম, নানা ধরনের কাজকর্ম করেছি, সবচেয়ে মজার কাজ করেছি বড়কিতে। সেখানে মহেশ্বরজীর খামার ছিল মস্ত বড়, আমায় সেই খামারের ম্যানেজারী গোছের কাজ করতে হত। কোথাও আমি বসতাম না, দু-তিন মাস থাকতাম, তারপর পালিয়ে যেতাম। মহেশ্বরজীর কাছে কিছুদিন বেশীই ছিলাম, প্রায় মাস ছয়। না থেকে উপায় ছিল না। মহেশ্বরজী খুব অসুখে পড়ে গিয়েছিলেন।

আমি যেখানেই থাকি, মেজকাকি যতদিন ছিল, মাস খানেক অন্তর বাড়ি আসতাম। কাকি কাশী চলে যাবার পর আমার আর গরজ রইল না। তবু মন খারাপ হলে এক আধবার কাশী যেতাম কাকিকে দেখতে। মাঝে-মাঝে ছোটকাকির খবর নিতে রাঁচি ছুটতে হত। ছোটকাকি তখনও আমায় অল্প-অল্প চিনতে পারত, তারপর একেবারেই ভুলে গেল।

রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে যে-মানুষ জেগে থাকে, জেগে থাকতে-থাকতে পেটা ঘড়িতে রাত বেড়ে ওঠার একটা দুটো তিনটে করে শব্দ শোনে—আর প্রত্যেকটি ঘণ্টার শব্দ তাকে যেমন আরও উতলা করে তোলে আমার জীবনেও সেই রকম এক-একটি মৃত্যু আমায় উতলা করে তুলেছিল। মেজকাকি গেল সবচেয়ে শেষে। মেজকাকির যাওয়া তবু স্বাভাবিক, মাথায় চুল পাকিয়ে খানিকটা

বয়সকালে গিয়েছিল। কাকির তখন পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। মেজকাকি যে এতদিন বেঁচে ছিল তার একটা কারণ বোধ হয় এই, কাকির বেলায় যেমন করেই হোক, মৃত্যুর ফাঁসটা আলগা হয়ে গিয়েছিল। নয়ত কাকির আরও আগে যাবার কথা।

আমি আমার যৌবন বয়েস থেকেই ভাবতে শুরু করেছিলাম, নিয়তি আমার আশেপাশে ঘুরছে, যে কোন সময়ে আঁচড়ে দেবে। আমি তখন প্রায়ই একটা কালো ভয়ংকর ভালুকের স্বপ্ন দেখতাম।

নিশ্চয় করে জানা আর অনিশ্চিত হয়ে থাকার মধ্যে তফাত আছে। আজ আমি নিশ্চয় করে জানলাম আমার আয়ুর পুঁজি ফুরিয়ে গেল।

সংসারের সঙ্গে, নিজের ভাগ্যের সঙ্গে আজ আমার ঝগড়া করতে ইচ্ছে নেই। অনেক আগেই যা হতে পারত, এতদিন পরে সেটা ঘটেছে।

কতটা রাত হল আমি বুঝতে পারছিলাম না। অন্ধকার কী নিবিড় হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে কোথাও সাড়া নেই। রাস্তা থেকে একটিও শব্দ ভেসে আসছে না। আমি শুধু নিজের নিশ্বাসের শব্দটুকু শুনতে পাচ্ছি। এই নিশ্বাসই শুধু বলছে, আমি আছি।

শুয়ে-শুয়ে ভাবছি, সেই যে কবে আমি এসেছিলাম, আর এতকাল পরে যাবার জন্যে উঠে বসেছি—এর মধ্যে আমার জীবনটা আলাদা করে আমার কাছে কোথাও ধরা পড়েছে কি না! আমার মনে হল না, পড়েছে। আমি এখানে আলাদা করে কোথাও যেন ছিলাম না, নদীর জলে আর পাঁচ রকম জঞ্জালের মতন অনেকের সঙ্গে ভেসে গিয়েছি।

অথচ এ-রকম ভাবতে আমার ভাল লাগছিল না। এত শূন্য, অর্থহীন জীবনের এতখানি পথ আসারও কোনো প্রয়োজন ছিল না। শান্তার মতন আমিও আরও আগে চলে গেলে পারতাম। কেন গেলাম না।

নিজের গোপন করা সঞ্চয় খুলে আমি যখন হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজি আমার কী আছে—, দেখি, তার মধ্যে এমন কিছু নেই। যা আমার কাছে সুখ সান্ত্বনা বলে মনে হবে। সংসারের যা সাধারণ প্রাপ্য, আমার তাও তেমন কিছু নেই। যা আরও বড় সান্ত্বনা, তাও নয়। তবু আমি মনে-মনে মানি, আমি এই সংসারে অনাত্মীয় বহুজনের প্রীতি স্নেহ মমতা পেয়েছি। মানুষের কাছে এই পাওনাটুকু বড় সত্য।

মানুকে আমি একদিন বলেছিলাম, 'মানু, তোমার জোর আছে; তুমি তবু একটা কিছু ধরে রাখতে পারলে; আমি কিছুই পারলাম না।'

মানু বলেছিল, 'তুমি পারবার মানুষ নও।'

আমি ভাবি, আমার কি কোনো ক্ষমতা ছিল না, না ইচ্ছে ছিল না? আমি কি উদাসীন হয়ে থাকতে চেয়েছিলাম, না নিজের অক্ষমতা ও ভয়ের দরুন

তফাতে-তফাতে ছিলাম? আমি জানি না, আমি নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, না বাঁচতে চেয়েছিলাম।

আচমকা আমার মনে হল, আমি কিছু ছিলাম না, কিছু থাকব না। মায়া যা বলেছিল সেটাই সত্যি। আমায় যেন কেউ পরম অবজ্ঞায়, কোথাও ছুঁড়ে দিয়েছিল, আমি একটা প্রাণহীন বীজের মতন মাটির তলায় পচে নষ্ট হয়ে গেলাম, মাটি সরিয়ে আর উঠতে পারলাম না।

না পারার এই দুঃখ আজ আমায় আর কাঁদাল না। যে ছিল না, যে থাকবে না—তার জন্যে আমার কাঁদার কি কিছু আছে!

মোহিনী

টোপরের হাঁকডাক শুনে বাইরে এসে দেখি, বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে বুলা আসছে। বিকেল শেষ হতে চলল, মেঘে-মেঘে আঁধার ঘনিয়ে আছে, বৃষ্টি এসেছে সাদা করে, বাগানের গাছপালা ভিজে মরছে, মাটিতে জল দাঁড়াচ্ছিল, ওরই মধ্যে বুলা আসছে। আমি অবাক হয়ে বুলাকে দেখতে লাগলাম। তার হাতে একটা বড় ছাতা, জলের তোড়ে ছাতা সামলানো তার সাধ্যে কুলোচ্ছে না, সর্বাঙ্গ ভিজে মরেছে মেয়েটা। এভাবে বৃষ্টির মধ্যে, এই অসময়ে ভিজতে-ভিজতে ও কেন আসছে আমি বুঝতে পারলাম না। কোনো আপদ-বিপদ ঘটল নাকি!

বুলা সিঁড়িতে উঠতেই আমি অবাক হয়ে বললাম, "কিরে?"

বুলা ছাতাটা মাথার পাশ থেকে সরিয়ে বলল, "আর বলো না, আচ্ছা বিপদে পড়লাম এক।"

টোপর কাছে এসে চেঁচামেচি করছিল। আয়নারা চলে যাবার পর থেকে এই এক বিশ্রী অভ্যেস হয়েছে টোপরের, ফটক খোলার আওয়াজ পেলেই চেঁচাতে শুরু করে। হয় ভাবে তার মনিব আসছে, হাঁকচাক শুরু করে, না হয় তার মনিব কেন আসছে না এটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জানাতে চায়।

ধমক দিতেই টোপর সরে গেল। আমি বললাম, "আয়না চলে যাবার পর থেকে তার ওই সোহাগের কুকুরটা আমায় জ্বালিয়ে মারছে।"

বুলা যেন সেটা জানে। ছাতাটা গুটিয়ে একপাশে রেখে দিল। ছাতা দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে যেন।

"তুই তো ভিজে চান করে গিয়েছিস। রাম রাম, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও তোর শুকনো নেই। আয় আয়, আগে কাপড় ছাড়বি আয়।"

বুলা তার পায়ের দিকের শাড়ির কোঁচ নিঙড়ে নিঙড়ে জল ঝরাচ্ছিল। এত ভিজে গিয়েছে ও যে জল ঝরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। গায়ের কাপড় ভিজেছে, আঁচল ভিজেছে, মাথার চুলও ভেজা।

"এইভাবে কেউ আসে? আয় আয়, কাপড় জামা ছেড়ে নে আগে।" বুলাকে ডেকে নিয়ে আমি ঘরের দিকে এগুতে লাগলাম।

বুলা বলল, "মানুদি, আমি কলঘরে গিয়ে কাপড়জামাগুলো নিঙড়ে নিই, তা হলেই হবে।"

বুলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে আমি বললাম, "কেন, আমাদের বাড়িতে কি

তোকে পরতে দেবার শাড়ি নেই?"

ধমক খেয়ে বুলা চুপ করে গেল।

"এই বৃষ্টির মধ্যে তুই হঠাৎ এলি যে?" আমি শুধোলাম।

"মনোরমামাসিদের বাড়ি গিয়েছিলাম। মা পাঠিয়েছিল, দরকার ছিল খুব। ফেরবার পথে বৃষ্টি নামল। ওরা একটা ছাতা দিয়েছিল ভাগ্যিস। তবু আসতে-আসতে ভিজে গেলাম। বৃষ্টিও এল এমন জোরে...। পড়িমরি করে এখানে পালিয়ে এলাম।"

"তুই কলঘরে যা, আমি কাপড় আনছি।"

ঘরে এসে আলমারি খুলে একটা শাড়ি বের করলাম। আমার শাড়িগুলো এমন যে বুলাকে ঠিক মানায় না। তাতে আর কী হবে! কিন্তু জামা নিয়েই মুশকিল। আমার গায়ের জামা ওর হয় নাকি! অথচ মেয়েটা তো খালি গায়ে থাকতে পারে না। ভাবলাম, আয়নার ঘরে গিয়ে একটা জামা নিই।

যাবার সময় আয়না তার আলমারির চাবিটা আমায় দিয়ে যায় নি। ঘরে তার জামাটামা পড়ে থাকতে আমি দেখেছি। তা ছাড়া ধোপার বাড়ির কাচা কাপড়ের মধ্যেও তো তার জামা ছিল।

মানুষ না থাকলে ঘরগুলো কেমন যেন হয়ে যায়। জ্যাঠামশাইরা চলে যাবার পর থেকে প্রত্যেকটি ঘর সকাল বিকেল খোলা, ধোয়ামোছা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়, সন্ধ্যের দিকে একটু আধটু বাতিও জ্বলে—তবু ঘরগুলোতে পা দিলে মনে হয় তার কোনো সাড় নেই। কোথায় যেন ফাঁকা রয়েছে। আয়নার ঘরটাও সেই রকম; সবই আছে, অথচ তার মধ্যে কেমন এক নিঃসাড় ভাব। বর্ষাবাদলার জন্যে ভ্যাপসা গন্ধও হয়েছে।

আয়নার একটা জামা পাওয়া গেল। ধোপার বাড়ির কাচা কাপড় থেকেই। শাড়িও ছিল। আয়নার শাড়ি বুলাকে ভালই মানাত। তবু শাড়ি আর নিলাম না, আমারটাই হাতে ছিল।

কলঘরের সামনে গিয়ে ডাকলাম, "বুলা"।

দরজা ভেজানো ছিল। বুলা বোধ হয় জলকাদায় পা ধুয়ে নিচ্ছে, শব্দ হচ্ছিল জল পড়ার।

দরজা ফাঁক করে বুলা আমার হাত থেকে শাড়ি, জামা নিল।

"গা মোছার কিছু পাস নি?" বুলাকে এই আধো অন্ধকারে, ভিজে কাপড়ে দেখতে দেখতে আমি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। এত ম্লান, করুণ, দেখাচ্ছিল যে মনে হল, ওর সমস্ত লাবণ্য মরে গেছে।

"আছে। কলঘরেই আছে।" বুলা বলল।

"তুই আয় তা হলে, আমি আমার ঘরে আছি।"

ঘরে ফিরে আসার আগে বারান্দায় একটু দাঁড়িয়ে থাকলাম। বৃষ্টির চেহারা দেখে মনে হয়, শীঘ্র তো নয়ই কতক্ষণে বৃষ্টি থামবে বলা যায় না। এত মেঘ, এমন বৃষ্টি যে দেখতে-দেখতে বিকেল মরে সন্ধ্যের মতন অন্ধকার হয়ে

আসছে। আমার মাথার চুলে চিরুনিটা গোঁজা ছিল, চুল বাঁধতে বসেছিলাম, বাঁধা হয় নি, আলস্য লাগছিল, বার কয়েক আঁচড়াবার পর টোপরের চেঁচামেচি শুনে বাইরে এসেছিলাম, তারপর দেখলাম বুলাকে।

বুলাকে আমি এতকাল ধরে দেখে আসছি, তার অনেক কিছুই আমার জানা; কিন্তু আজ বুলাকে একটু আগে কলঘরের দরজায় দেখার পর থেকে আমার যে কেমন এক ভয় হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না।

কমলার পায়ের শব্দ শুনে তাকালাম। কমলা কোনো কাজে যাচ্ছিল। এখনও চা খাওয়া হয় নি আমার। কমলাকে তাড়াতাড়ি চা করতে বললাম।

"বুলা এসেছে। ভিজে একশা। কলঘরে জামা কাপড় বদলাচ্ছে। ওর ছাড়া কাপড়-চোপড়গুলো কেচে মেলে দিও।"

কমলা চলে গেল।

ঘরে এসে দেখি বেশ অন্ধকার। জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাট তেমন আসছে না, পুব দিকে ছাট রয়েছে। আমার ঘরের জানলাগুলো দক্ষিণ ঘেঁষে। বাতি জ্বালাবার মতন অবস্থা হয়ে এল ক্রমশ।

বুলা এমন অসময়ে এসে পড়েছে যে, ওকে একা-একা বাড়ি পাঠানোও যায় না। এক্ষুণি সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ঘুটঘুট করবে অন্ধকার। এই বৃষ্টিবাদলা। বাড়িটাও কাছে নয় বুলাদের। আধ মাইলটাক তো হবেই। কী করে মেয়েটাকে বাড়ি পাঠাই কে জানে!

ততক্ষণে বুলা এসে গিয়েছে। "মানুদি?"

বুলার দিকে তাকালাম।

"আমার ভিজে কাপড়জামাগুলো ওপাশের বারান্দায় মেলে দেব?"

"তুই কি সব কেচেকুচে এলি নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"তুই কেন কাচতে গেলি? আমি কমলাকে বলে দিয়েছি। সত্যি, তুই একটা মেয়ে!"

"বা, আমার কাপড় আমি কাচব না!"

"থাক, ও নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। কমলা যা করার করবে।"

শাড়ির আঁচল গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বুলা আমার কাছে এসে বসল।

"ভাল করে মাথা মুছেছিস?"

"মুছেছি।"

"এই রকম বৃষ্টি দেখে কেউ বেরোয়, বোকা।"

"যখন বেরোই তখন বুঝতে পারি নি এত জোরে বৃষ্টি এসে পড়বে।" বলে বুলা একটু থেমে আমার হাত থেকে চিরুনিটা টেনে নিল। "দাও, আমি চুল বেঁধে দিচ্ছি।"

আমি জানলার দিকে মুখ করে বসলাম, বুলা আমার চুল বাঁধতে বসল। বললাম, "ওই একটু আঁচড়ে একটা এলো খোঁপা করে দে।"

চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বুলা বলল, "তোমার কী চুল মানুদি!"

"হিংসে করছে তোর?"

হেসে ফেলে বুলা বলল, "তোমার হিংসে করতে হলে আমরা মরে যাব।"

"তা হলে তোর মরে কাজ নেই।"

চুল জড়াতে-জড়াতে বুলা বলল, "এত ফাঁকা বাড়িতে তুমি কী করে যে আছ মানুদি, আমি হলে ভয়ে মরে যেতাম।"

"তুই এসে থাক্ না। সেদিন অত করে বললাম, থাকলি?"

বুলা লজ্জা পেয়ে বলল, "বাড়িতে আমি না থাকলে মার বড় কষ্ট হয়, মানুদি। মার শরীরটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। বাবলা তো দিনের বেলায় বাড়িতেই থাকে না, রাত্রে ফিরতে-ফিরতে আটটা ন'টা বেজে যায়।"

"খুব চাকরি করছে বুঝি?"

"নিজেই খাটছে। কী করবে বলো। বাস-অফিসের প্রায় সব কাজই এখন ও করে।"

আরও দু-পাঁচটা কথা হতে হতে কমলা চা নিয়ে এল।

"নে, চা খা; বৃষ্টিতে যা ভিজেছিস..." চা রেখে কমলা মাথা তুলতেই বললাম, "একটা আলো জেলে দিয়ে যাও না, বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। জানলাটাও দেখে নাও তো, ছাট এলে ভেজিয়ে দাও।"

কমলা জানলার খানিকটা ভেজিয়ে আলো আনতে গেল।

বুলা বলল, "জ্যাঠামশাইয়ের আর কোনো খবর পেলে মানুদি?"

আমার হাতে চায়ের পেয়ালা ছিল, নামিয়ে রেখে বললাম, "আজই চিঠি পেয়েছি।"

"খবর কী?"

"ভাল নয়।"

বুলা আমার খোঁপাটায় কাঁটা গুঁজে দিতে-দিতে বলল, "শচিদার কথা বলছ?"

"হ্যাঁ, ওকে হাসপাতালে ভরতি করে দিতে হয়েছে।"

বুলা একটু চুপ করে থেকে বলল, "শচিদার অসুখটা ভাল নয়।"

আমি মুখ ঘুরিয়ে বসলাম। কমলা আলো দিতে এসেছিল।

কমলা চলে গেলে আমি বুলার দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুই কি করে জানলি?"

বুলা সে কথার কোনো স্পষ্ট জবাব দিল না, বলল, "শুনেছি।"

আমার চা খাওয়া শেষ হল। বুলা আস্তে-আস্তে চা খাচ্ছে। বৃষ্টির শব্দ থামে নি। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে।

"বুলা?"

"উঁ!"

"আজ আর তুই বাড়ি ফিরতে পারবি না।"

উদ্বেগের গলায় বুলা বলল, "সত্যি মানুদি, বৃষ্টিটা এখনও থামছে না।"

"থেমে গেলেও এই জলকাদায় অন্ধকারে যাবি কি করে?"

"সে আমি চলে যেতে পারব। একটা বাতি নিয়ে নেব।"

"দরকার কী! তুই আজ থেকে যা। বৃষ্টি কমুক, কার্তিক বরং সাইকেলে করে গিয়ে একটা খবর দিয়ে আসবে বাড়িতে।"

মুখ কাঁচুমাচু করে মাথা নাড়ল বুলা। "না মানুদি, আমি বাড়ি ফিরে না গেলে মার কষ্ট হবে। বাবলা বাড়ি এসে যা করে—!"

"থাম্, আমায় অত সংসার করা দেখাস নে, তুই আমার কাছে রাত্তিরটা থাকবি তাতে কেউ কিছু বলবে না।"

"তোমার কাছে থাকার জন্যে বলবে কেন! ওদের কষ্ট হবে বলে আমিই বলছি। বারে, তুমি একলা থাকো বলে আমি আজকাল কত আসি।"

বুলার দিকে চোখ রেখে তাকে আমি লক্ষ্য করলাম। আমি জানি, বুলা এ-বাড়িতে থাকবে না। আজকের এই বৃষ্টিবাদলার মধ্যে সে থাকতে পারত, তবু থাকবে না।

"বেশ, বৃষ্টিফৃষ্টি ধরে যাক, তারপর দেখা যাবে। কার্তিক গিয়ে তোকে এগিয়ে দিয়ে আসবে।"

"আমায় পুরো এগিয়ে দিতে হবে না, খানিকটা দিলেই..."

"সে আমি বুঝব।"

বুলা চুপ করে গেল।

কিছুক্ষণ আর কথা হল না। বুলা যেন বসে-বসে বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করছিল, আর আমি বুলাকে নিয়ে কত কী ভাবছিলাম।

চুপ করে বসে থাকতে-থাকতে বুলা হঠাৎ বলল, "একটা কথা বলব, মানুদি?"

"বল্।"

"তুমি রাগ করবে না?"

"তুই তো রাগের কথা বলতে পারিস না—।"

"না, তুমি ঠাট্টা করো না।"

"বেশ করব না, বল্।"

বুলা যেন চুপ করে থেকে আরও একটু সাহস যোগাড় করে নিল। বলল, "শচিদার অসুখটা এমন খারাপ যে বাঁচবে না শুনলাম।"

আমি বুলার দিকে চেয়ে থাকলাম। কলকাতায় যাবার পর শচিদার যা-যা ঘটছে সব খবরই আমি চিঠিতে জানতে পারি। আমায় নতুন করে চমকে ওঠার কিছু ছিল না। তবু অবাক হয়ে ভাবলাম, এত খবর বুলা কোথা থেকে পেল।

বুলার চোখ দেখতে-দেখতে আমি বললাম, "মরাবাঁচার কথা কেউ বলতে পারে না। হাসপাতালে শচিদা আগেও ছিল। তা তোকে এ খবর কে দিল রে? শচিদা?"

"না না, শচীদা কেন—"বুলা মাথা নাড়ল। "শচিদা আমার চিঠি দেবে কেন! আমি অন্য জায়গা থেকে জেনেছি।"

বুলার অন্য জায়গাটা যে কী, আমি বুঝলাম না। এটা নিশ্চয় বুলার বলার কথাও নয়। আমি ওর দিকে তাকিয়ে বসে থাকলাম।

শেষে বুলা বলল, "মানুদি, তুমিও কলকাতায় যাবে?"

"আমি?" বুলার চোখ দেখতে-দেখতে আমার কেমন অস্বস্তি হল। "আমি কেন কলকাতায় যাব?"

বুলা অন্য দিকে চোখ সরিয়ে বলল, "জ্যাঠামশাইরা কি এখন ফিরবেন? তুমি একা-একা কতদিন থাকবে এই বাড়িতে?"

আমি কোনো জবাব দিলাম না। জ্যাঠামশাইরা কবে ফিরবেন আমি জানি না। একা-একা এখানে থাকতেও আমার ভাল লাগে না। তবু, জ্যাঠামশাইরা যে কলকাতায় বেশী দিন বসে থাকবেন তাও আমার মনে হয় না। অনেকক্ষণ পরে আমি বললাম, "ওদের তো ফেরা উচিত। কী জানি বলতে পারছি না।"

বুলা আর কিছু বলল না।

বৃষ্টি থামতে-থামতে রাত হল। বুলা যাবার জন্যে তৈরি। আবার বললাম, তুই থেকে যা, আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। বুলা রাজী হল না। কার্তিককে দিয়ে ওকে এগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হল।

যাবার সময় আমি বললাম, "তুই তো এখন এক-আধ দিন এসে থাকতে পারিস, একা একা থাকি আমি।"

বুলা একটু হাসল।

বারান্দার সিঁড়ির কাছে এসে আমি বললাম, "তুই কলকাতা থেকে চিঠি পেয়েছিস?"

মাথা নুইয়ে নাড়ল বুলা।

"সুহাস লিখেছে?"

বুলা মুখ নীচু করল।

ওরা বাগানে নামল, বৃষ্টি নেই, নুড়ি পাথরের ভিজে রাস্তায় পা বসে যাবার শব্দ হচ্ছিল। কার্তিক বাতি নিয়ে বুলাকে পথ দেখিয়ে চলেছে।

ফটক খুলে ওরা চলে গেল। আমার মনে হল, বুলা যে থাকল না—চলে গেল তাতে তার খানিকটা অভিমান রয়েছে। এ-বাড়িতে তার থাকবার অধিকার যখন জোটে নি তখন সে একটা রাতও কাটাতে চায় না। কিন্তু খুব আশ্চর্য যে সুহাস ওকে চিঠি লিখেছে। সুহাস যে বুলাকে আগে চিঠিপত্র লিখত আমি জানি, এখনও যে লেখে আমার জানা ছিল না। বোধ হয় কোনো দরকারে লিখেছে। হঠাৎ সুহাস কেন বুলাকে চিঠি লিখতে গেল তাও আমি বুঝে পেলাম না।

কলঘর থেকে ফিরে এসে বিকেলের জামাকাপড় ছাড়তে গিয়ে দেখি ঘড়িতে প্রায় আটটা বাজছে। বৃষ্টি নেই। বাদলা বাতাসে ঘরদোর বেশ ঠাণ্ডা হয়ে

আছে। কত যে ঝিঁঝি ডাকছিল। সমস্ত অন্ধকার যেন শব্দ করে ডাকছে। আমার ঘরের জানলা ভেজানো। ফাঁকা ঘরগুলোয় তালা পড়ে গেছে অনেকক্ষণ। কমলা রান্নাঘরের কাজকর্ম সেরে ফেলেছে এতক্ষণে। এই ক'টি তো মানুষ আমরা, কীই বা করার আছে। কার্তিক এখনও ফেরে নি।

ঘরের আলোটা আরও একটু উসকে দিয়ে ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকলাম খানিকটা। তারপর বিছানায় এসে বসলাম।

কী যে করব ভেবে পেলাম না। জ্যাঠামশাইকে চিঠি লিখব? সুহাসকে লিখব? আয়নাকে কিছু লিখব নাকি? ইচ্ছে করল না। অবিনের চিঠি এসে পড়ে আছে ক'দিন হল, তার জবাবটাও লেখা হল না। ভেবেছিলাম, অবিনকে এবার খুব স্পষ্ট করে ক'টা কথা লিখব। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। ক'দিন ধরেই সেটা ভাবছি। তবু লিখতে ইচ্ছে হল না।

আজ প্রায় মাসখানেক হতে চলল জ্যাঠামশাইরা নেই। এই কুড়ি পঁচিশ দিনেই আমি বড় নিঃসঙ্গ হয়ে গেছি। এত বড় বাড়িতে একা-একা ভাল লাগে না। সারাদিন মুখ বুজেই প্রায়, কমলার সঙ্গে আর কত বকবক করি, কার্তিককেই বা অযথা কত ফরমাস করব। কাজকর্মও খুঁজে পাই না। ফাঁকা ঘরগুলোতে গিয়ে অকারণ কাজ খুঁজে বেড়াই। সংসারে অনেক সময়-কাটানো কাজ থাকে—বর্ষা নেমে গিয়ে তারও কোনো উপায় নেই। ঘরে বসে, সারা বাড়ি মিথ্যেই ঘুরে-ঘুরে, বাগানে পায়চারি করে কিংবা ভাঁড়ার আর রান্নাঘরে বসেও আমার দু-হাত ফাঁকা হয়ে থাকে। নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে থাকি, বইটই পড়ি, আয়নার ঘরে কত কাগজপত্র পড়েছিল, পড়তে এনে ফেলে দিয়েছি, বিরক্তি লেগেছে।

ক'দিন ধরেই ভাবছিলাম, জ্যাঠামশাইকে লিখব, তোমরা ফিরে এস। শচিদা তো হাসপাতালে ভরতি হয়েছে। অযথা কলকাতায় বসে থেকে কী করবে! আয়নাকেও এখন কলকাতায় রেখে লাভ নেই। এই আপদবিপদে তো তাকে কলকাতায় একা ফেলে রাখার আরেক জ্বালা রয়েছে। তার চেয়ে ওকে এখন নিয়ে এস।

এই সব ভাবি, কিন্তু লিখি না। শচিদা সবেই হাসপাতালে গিয়েছে। মনে হয় না, জ্যাঠামশাই এত তাড়াতাড়ি ফিরবেন। আয়নার বিয়ে নিয়েও আমার সন্দেহ হয়েছে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য আর দেখছি না। আমার মনে হচ্ছে, আয়নার বিয়েটা ভেঙে গেছে। খুবই অবাক কাণ্ড। অত হইহই করে এগিয়ে হঠাৎ কেন ভেঙে গেল আমি বুঝতে পারছি না। বিয়ের কথা কেউ আর লেখে না। শচিদাকে নিয়েই সবাই ব্যস্ত।

শচিদা হাসপাতালে গিয়েছে, খবরটা আমায় আয়না দিয়েছিল প্রথমে। তারপর পেলাম জ্যাঠামশাইয়ের চিঠি। তাঁর চিঠি পড়ে বুঝতে পারলাম, শচিদাকে

এখন হাসপাতালেই থাকতে হবে। অসুখটা সেই, যা সন্দেহ হচ্ছিল। এখন হাসপাতালে রেখে কিছুদিন হয়ত ডাক্তাররা দেখবে। কেউ-কেউ নাকি অপারেশন করার কথাও বলতে শুরু করেছে। শচিদার জীবনের আশা এখন কম। ভগবান যদি বাঁচাতে চায় অন্য কথা।

শচিদার শেষের দিকের খবর পেয়ে আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য শচিদার যে খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে এটা আগে থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল। মনে-মনে হয়ত খারাপটা জানতাম বলে আমি অতটা বিহ্বল হই নি। আছিও অনেকটা দূরে, কলকাতার বাড়িতে নিত্য যে দুশ্চিন্তা উদ্বেগ চলেছে এখান থেকে আমি তার কতটা বুঝব। তবু আমার দুঃখ হয়েছিল।

শচিদাকে একটা চিঠিও লিখেছি। হাসপাতালে যাবার আগে কিংবা পরে কবে যে চিঠিটা শচিদা পেয়েছে আমি জানি না। উত্তর পাইনি। শচিদা চিঠির জবাব না দেবার মানুষ নয়; দু-একদিনের মধ্যে তার চিঠি পাব।

হঠাৎ আবার বুলার কথাটা মনে পড়ল। বুলা আমায় জিজ্ঞেস করছিল, আমি কলকাতায় যাব কি না? কেন কথাটা জিজ্ঞেস করল জানি না। সুহাস তাকে হঠাৎ চিঠি লিখতে গেল কেন, কীই বা লিখেছে আমি জানি না। তবে সুহাস নিশ্চয় বুলাকে আমার কলকাতা যাওয়ার কথা লেখেনি। বুলা নিজের থেকেই বলেছে কথাটা, অনেকটা এই ভেবে যে, আমি একা-একা এই বাড়িতে পড়ে আছি, জ্যাঠামশাইরা কবে ফিরবেন তার ঠিক নেই, কলকাতায় অমন একটা জীবন-মরণের ব্যাপার চলছে, এ-সময় আমার কলকাতায় ওদের পাশে থাকলে হয়ত ভাল হয়। এ-ছাড়া বুলার অন্য কিছু বলার আছে বলে আমার মনে হয় না। তবু মনে-মনে একটা খটকা আমার লাগল। বুলা কী ভাবছে, শচিদার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে আমার ভাল লাগবে!

বুলা এমন কথা কেমন করে ভাবল আমি বুঝতে পারলাম না। তার মাথায় এটা এল কেন? আমার সঙ্গে শচিদার ভাবসাবের সময় বুলা ছেলেমানুষ ছিল; একেবারে বাচ্চা মেয়ে নয়, তবু তার তখন মেয়েদের মনের খবর জানার বয়েস হয় নি। সে নিজে কিছু বুঝেছে এমন আমার মনে হয় না। তবে সে সুহাসের কাছে পরে হয়ত অনেক কিছু শুনতে পারে। সুহাসের এক সময় বুলা-অন্ত প্রাণ ছিল। বলতে কিছু বাকি রাখে নি বোধ হয়।

মেয়েটা বড় বোকা। অদ্ভুত। সে বোধ হয় ভাবে, মেয়েদের ভালবাসা বুকের মধ্যে জমেই থাকে, তার আর ফুরিয়ে যাওয়া নেই। তার নিজের বেলাতেও, দেখে-দেখে আমার মনে হচ্ছে, সে যা ধরে রেখেছে তা আর ছাড়তে পারছে না। সুহাস তাকে হঠাৎ আজ একটা চিঠি যদি লিখেও থাকে তবু সে-সুহাস যে আর নেই বুলা কি সেটা বুঝতে পারছে না!

শচিদার জন্যে আমার দুঃখ মমতা যতই থাক, ভালবাসা নেই। সে চলে গেলে আমি দুঃখ পাব, চোখে আমার জল আসবে, কিন্তু আমার আর মনে হবে না, আমার সর্বস্ব ফুরিয়ে গেছে, আমি শূন্য হয়ে গিয়েছি।

আমার কাছে শচিদার যখন দাম ছিল তখন আমি যা ছিলাম আজ আর তা নই। আমার ভালবাসার মানুষ শচিদা নয়। আমি যা চেয়েছি, খুঁজেছি শচিদা যদি তেমন পুরুষ হত তবে অন্য কথা ছিল।

আজ কলঘরে বুলাকে যখন শাড়ি-জামা দিতে গিয়েছিলাম তখন হঠাৎ নজরে পড়েছিল, বুলার শরীরের সমস্ত লাবণ্য আস্তে-আস্তে মরে এলেও তার বুক এখনও ভরে আছে। কেন যেন আমার এই ভ্রম হল যে, ওখানে কোনো বহু যত্নের সম্পদ রয়েছে। আমি হঠাৎ কেমন অবাক হয়ে গিয়েছি, ভেবেছি—কী লাভ? তোর এখনও এই ভালবাসা বাঁচিয়ে রেখে কী লাভ হবে? তুই মিথ্যে বসে আছিস। মিথ্যে এই মায়া জমিয়ে রেখেছিস।

আমার নিজের বুকের মধ্যেটা তখন কেঁপে উঠেছে। আমি কিছু রাখি নি। কিন্তু রাখার জন্যে আজ কোথাও যদি ব্যাকুলতা ওঠে, আমি কী করব? কী আমার করার আছে?

আয়না

আজ বিকেলে শচিদাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম; গিয়ে এক কাণ্ডই হল। শচিদা হাসপাতালে গিয়েছে দিন পনেরোর বেশী। সবাই শচিদাকে দেখতে যায়, আমারই শুধু যাওয়া হচ্ছিল না। আমার কেমন ভয় ভয় করত। আজ যখন জ্যাঠামশাই যাচ্ছিলেন, আমি জোর করেই তাঁর সঙ্গে গেলাম। হাসপাতালে ঢোকবার সময়ই আমার বুক কাঁপছিল। ভেতরে শচিদার ঘরে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। আমি কখনও হাসপাতাল দেখি নি; এই প্রথম দেখলাম। হাসপাতাল শুনতেই আমার ভয়, দেখার পর ভয়টা যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দিল। তার ওপর শচিদার ঘরে গিয়ে দেখি—মস্ত ঘর, সার-সার বিছানা পাতা, বড়-বড় জানলা, অনেক উঁচু থেকে পাখা ঝুলছে, বাতি ঝুলছে, নানা বয়সের রোগী, নার্সরা আসা-যাওয়া করছে, সমস্ত ঘরটা যেন ঠাণ্ডা, কেমন এক উৎকট ওষুধের গন্ধ ঘরের বাতাসে, নিশ্বাস নেওয়া যায় না, একজন খুব জোরে-জোরে কাতরাচ্ছিল, দূরে কার যেন নাকে একটা নল ঢুকোনো, লোকজন রোগী দেখতে এসেছে। শচিদা বিছানায় শুয়ে ছিল। সাদা চাদর। গায়ে একটা ঢাকা। কী রোগা দেখতে হয়ে গেছে শচিদাকে। মুখটার দিকে আর তাকানো যায় না, নাক-চোখ সব যেন বসে গেছে, মুখে শুকনো হাসি, গাল ভরতি দাড়ি। দেখতে-দেখতে আমার মাথা ঘুরে গেল, হাত পা ঠাণ্ডা, বুকের মধ্যে ধকধক করতে লাগল। শচিদার সঙ্গে আমি দুটো কথাও বলতে পারি নি, ধপ করে বিছানার পাশে বসে পড়লাম।

দাদা তখনও এসে পেঁাছোয় নি। অবিনদা ছিল। ইন্দুদিও তখন এসেছে। ইন্দুদিদেরই হাসপাতলে। জ্যাঠামশাই শচিদার মাথার দিকে টুলে বসে। আমার বমি-বমি লাগছিল। ইন্দুদি আমার অবস্থা দেখে কিছু বলার সঙ্গে-সঙ্গে অবিনদা এসে আমার হাত ধরে টানল।

কী যে হল আমি পরিষ্কার বুঝলাম না। সিঁড়ি, ঘর, বারান্দা, আবার সিঁড়ি—এই ভাবে কোথা থেকে কোথা দিয়ে শেষে হাসপাতালের নীচের রাস্তায়, তারপর আস্তে-আস্তে একেবারে ফটকের কাছে। তখনও আমার হাত পা থরথর করে কাঁপছে, জিব শুকিয়ে গিয়েছে, ঠোঁটে টান ধরছে, গা গুলিয়ে উঠছিল।

অবিনদা একটা রিকশা পেয়ে আমায় হাত ধরে তুলে দিল। নিজেও উঠল। রিকশায় বসে অবিনদা শুধু বলল, "তুমি আচ্ছা ভীতু তো! একটা

কেলেঙ্কারী করতে আজ।"

রিকশায় বসে আস্তে-আস্তে আমার যেন হুঁশ এল। এক-এক করে আমি স্পষ্ট করে সব দেখতে পাচ্ছিলাম। মানুষজন হাঁটছে, গাড়িঘোড়া চলছে, বিকেল বলে আর কিছু নেই, চারপাশে ধুলো, কতকগুলো ছেলে চেঁচাতে-চেঁচাতে একটা মড়া বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার কেমন কান্না এল। মুখ ঘুরিয়ে চোখের জল মুছলাম।

অনেকটা এসে অবিনদা রিকশা থামাল। আমরা নামলাম। রিকশা ভাড়া মিটিয়ে অবিনদা আমাকে নিয়ে একটা দোকানে ঢুকল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দোকান, সাজানো গোছানো। অবিনদা আমাকে চোখ মুখ ধুয়ে আসতে বলল।

চোখেমুখে জল দিয়ে এসে আমি কী যেন খেলাম, সোডা-আইসক্রিম বোধ হয়। বেশ ঝাঁঝ ছিল।

খানিকটা বসে থাকার পর অবিনদা বলল, "কেমন লাগছে?"

"ভাল।"

আমার তখন ভালই লাগছিল। গলা আর শুকিয়ে নেই, ঠোঁটে টান ধরছে না। বমি-বমি ভাবটাও গিয়েছে।

"এবার এক কাপ চা খাও, সব ঠিক হয়ে যাবে", অবিনদা হেসে বলল।

চা খেতে আমারও ইচ্ছে করছিল।

সামান্য পরে চা এল। অবিনদা মজা করে করে একটা দুটো কথা বলছিল। আমার নিজেরই এখন কেমন লজ্জা করছে।

চা খেতে খেতে অবিনদা বলল, "এবার তাহলে কোথায় যাবে?"

"বাড়ি।"

"বাড়ি?"

"আপনি তো আর কোথাও নিয়ে যাবেন না?" কথাটা এমনিই বললাম। তারপর মনে পড়ল, কলকাতায় আসার পর থেকে আমার বাইরে বেরুনো একেবারেই হয় নি। এক-আধদিন বেড়াতে বেরিয়েছি, ওই যা। শচিদাকে নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত রয়েছে যে কোথাও আর যাওয়া হয় না। অবিনদা আমায় অনেকবার বলেছে, তোমায় গোটা কলকাতা চক্কর মেরে দেখিয়ে দেব। কিন্তু দেখাতে পারে নি। শচিদা, বৃষ্টিবাদলা—এ-সবের জন্যে আর হয়ে ওঠে নি।

আমার দিকে তাকিয়ে অবিনদা হাসিমুখে বলল, "কোথায় যাবে, বলো?"

"যেখানে হোক।"

"যদি আবার মাথা বনবন করে?"

"করবে না।...আমি কখনও হাসপাতাল দেখি নি। হাসপাতাল শুনলে আমার ভয় করে। কলকাতার হাসপাতাল কী বড়!"

"বেশ, তা হলে চলো—তোমায় খানিকটা টাটকা হাওয়া খাইয়ে আনি। গঙ্গার দিকে যাবে?"

"আমি গঙ্গাটঙ্গা চিনি না। আপনি নিয়ে গেলেই যাব।"

অবিনদা চা শেষ করে সিগারেট ধরাল। আমারও চা খাওয়া শেষ হল।

বাইরে বেরিয়ে খানিকটা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অবিনদা ট্যাক্সি পেল। আজ আকাশে মেঘ নেই। সারা দিন কাঠ ফাটা রোদ ছিল। গুমোটও গিয়েছে। আষাঢ় মাস শেষ হয়ে শ্রাবণ সবেই পড়েছে বুঝি। আমি ঠিক জানি না। কার মুখে যেন শুনছিলাম। কোথাও যদি মেঘলা জমে থাকে বোঝার কোনো উপায় নেই, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এমনিতেই সব ঝাপসা, তার ওপর কলকাতার বাড়ি-ঘরের আড়াল থেকে আকাশটাও দেখা যায় না পুরোপুরি।

ট্যাক্সিতে বসে অবিনদা হালকা কয়েকটা কথা বলল। আমি হাসলাম। আমার সত্যি-সত্যি এখন আর শরীর খারাপ লাগছিল না।

কলকাতার রাস্তা, বাড়ি, মানুষজন, দোকান-পশার দেখতে-দেখতে আমরা খানিকটা ফাঁকায় এসে পড়লাম, তারপর মাঠ, হুহু করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, চওড়া-চওড়া রাস্তা, গাছ; আকাশটা অনেকখানি দেখা গেল, প্রায় অন্ধকারের মধ্যে একটা কালো মেঘ উটের মতন গলা উঁচু করে যেন মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে।

গঙ্গার ঘাটে ভিড় মন্দ নয়। অবিনদা আমায় নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে শেষ পর্যন্ত ফাঁকা একটা জায়গায় এসে বসল। মাথার ওপর ফাঁকা, পাশে গাছ, সামনে নদী, পায়ের দিকে পাতাবাহারের ঝাড়। নদীর ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল।

অবিনদা হেসে বলল, "কী, কেমন লাগছে?"

"খুব সুন্দর। কলকাতায় খুব সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে তো?"

"তা আছে দু-চারটে। তবে বেশীদিন আর থাকবে না।"

"কেন?"

অবিনদা কোনো জবাব দিল না। হাসল। গঙ্গা দেখতে-দেখতে আমি জলের শব্দ শুনছিলাম। ওপারটা একেবারে কালো। জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে দুটো না তিনটে। আমি হাঁ করে জাহাজ দেখছিলাম। নদীতে একসার নৌকো। সারাক্ষণ দুলছে। দু-চারটে করে কথা বলছিলাম। আমিই জিজ্ঞেস করছিলাম, অবিনদা জবাব দিচ্ছিল। তারপর আমি কখন চুপ করে গেলাম।

নদীর দিকে তাকিয়ে আছি তো আছি। সমস্ত জল একেবারে কালো হয়ে গেছে। আকাশটাও অন্ধকার। ওপারে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মেঘ হয়ে আছে। শচিদার কথা আমার মনে পড়ছিল। আহা রে! বেচারী শচিদা!

আমার নিশ্বাসের শব্দ শুনে অবিনদা বলল, "কী হল?"

একটু চুপ করে থেকে বললাম, "শচিদার কথা ভাবছি।"

অবিনদা অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরাল।

"শচিদা কেমন দেখতে হয়ে গেছে, না?" আমি বললাম।

"হ্যাঁ," অবিনদা আস্তে করে শব্দ করল।

"বাড়িতেও শচিদা এরকম দেখতে ছিল না। হাসপাতালে এসে দেখতে-দেখতে কেমন হয়ে গেল।"

"তাই দেখছি।"

"শচিদা আর বাঁচবে না, অবিনদা?"

অবিনদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। তারপর বলল, "তোমাদের শচিদা কি কোনো কালে বেঁচে ছিল?"

আমি ভাল বুঝলাম না কথাটা; আবার একেবারে না বুঝলাম তাও নয়। শচিদার জন্যে আমাদের সকলেরই খুব কষ্ট হয়। আগে এতটা আমার হত না। কলকাতায় এসে শচিদার কাছাকাছি থাকতে থাকতে আমার কষ্টটা যেন বেড়ে গেছে। হাসপাতালের আসবার দিন শচিদা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'দেখ তো কান্ড, আমি ভেবেছিলাম, তোর বিয়ের খাওয়াটা খেয়ে তবে যাব, তার আগেই যেতে হচ্ছে রে। পাওনা থেকে গেল।' আমি তখন কেঁদে মরছি, বললাম, 'বিয়ের খাওয়া পরে হবে, তুমি আগে সেরে এস।' সেই দিনই দিদির চিঠি এসেছিল শচিদার নামে। চিঠিটা আমি শচিদাকে দিলাম।

এ-সব কথা ভাবলে আমার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। আমি যে কেন কলকাতায় এলাম কে জানে। আসার পরের দিন থেকে বাড়িতে শুধু ডাক্তার আসছে, কত রকমের ডাক্তারই এল। দাদা আর জ্যাঠামশাই নিজেদের মধ্যে রোজ কত কী বলাবলি করতেন আস্তে আস্তে। জ্যাঠামশাই সব সময়েই আকাশপাতাল ভাবছেন, দাদার মতন মানুষের মুখেও তেমন একটা হাসি-খুশী দেখতাম না, বড় ব্যস্ত; অবিনদা আসত প্রায় রোজই, অবিনদা এলে একটু আধটু হইচই করতাম, তারপর আবার সব আগের মতন। কলকাতায় আমি কি এই জন্যে আসতে চেয়েছিলাম? না। কিন্তু আমার কপালে যা আছে তার বেশী আর কি হবে!

আমি বললাম, "কলকাতায় এসে আমার যা হল! ভাল লাগে না আর।"

অবিনদা আমার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কিছু যেন ভাবল। সিগারেটে শব্দ করে টান দিল। তারপর মজা করে বলল, "সত্যি, তোমার দিকটায় কেউ আর তাকাচ্ছে না!"

"মানে?"

"তোমার কোনো ব্যবস্থা-ট্যবস্থা—"

"ধ্যাত্‌—! আমি কি তাই বলেছি! আপনি যেন কী!"

"আমি ভাই স্পষ্টবাদী।"

"স্পষ্টবাদী না মিথ্যেবাদী। আপনি আমায় কত বলেছিলেন কলকাতায় এলে আমায় নিয়ে চষে বেড়াবেন। কত বেড়ালেন। আহা!"

অবিনদা হোহো করে হেসে উঠল। টোকা দিল আঙুলে, সিগারেটের টুকরোটা ফুলকির মতন সামনে গিয়ে পড়ল।

খানিকটা চুপচাপ, তারপর অবিনদা বলল, "আয়না, তোমায় একটা গুরুতর কথা জিজ্ঞেস করি কী বলো?"

আমি অবিনদার দিকে তাকালাম। আমাদের পেছন দিয়ে মাঝে-মাঝে

লোকজন বেড়াতে-বেড়াতে চলে যাচ্ছে। কারা যেন একসঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে উঠল। তার মধ্যে মেয়েদের গলাও আছে। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম।

অবিনদা বলল, "কলকাতায় আসার সময় তুমি জানতে না কেন আসছ?"

আমার লজ্জা করছিল, চুপ করে থেকে আমি বললাম, "আমি কেমন করে জানব!"

"খুব জানতে," অবিনদা হেসে বলল, "চালাকি করো না।"

আমি হেসে ফেলে বললাম, "শুনেছি।"

"কলকাতায় এসে আর কিছু শোনো নি তো?"

"না।"

অবিনদা আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর আস্তে করে বলল, "আয়না, তোমায় একটা কথা বলি। তুমি তোমাদের বাড়ির সবচেয়ে আদরের, তোমার জন্যে ভাববার লোক সবাই। তবু তোমার নিজেরও ভাববার বয়েস হয়েছে। বাড়ির যারা ভাববার তারা তো ভাববেই; তুমি নিজেও এবার ভাবতে শুরু কর।"

আমি অবাক হয়ে অবিনদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। অবিনদা কি হাসি ঠাট্টা করে কথা বলছে, না সত্যি-সত্যি কিছু বলতে চাইছে।

"সুহাস যে বিয়ের সম্বন্ধটা করেছিল সেটার কথা শুনেছ?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"সেটা ধরো ভেঙে গেছে।"

"জানি।"

"কী করে জানলে?"

"মনে হয়।"

"কিছু শোন নি তো?"

"না।"

আমায় কেউ কোনো কথা বলুক না বলুক আমি নিজেই অনেক কিছু বুঝতে পারি। কলকাতায় আমরা এসেছি কম দিন হল না। শচিদাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন যে তাও ঠিক। তবু আমার বিয়ের কথা কলকাতায় আসার আগে যদি প্রায় পাকাপাকি হয়ে এসে থাকে, তবে কলকাতায় আসার পর এতগুলো দিন কেটে গেল, কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করছে না—এ থেকেই তো বোঝা যায় কোথাও কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছে আমি জানি না। তবে আমার জানতে ইচ্ছে করে। বিয়ে ভেঙে গিয়েছে বলে ঠিক নয়, কেন গেল সেটা তো জানতে মন চায়।

আচমকা আমি অবিনদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে, অবিনদা?"

"তোমার বিয়ের কথা বলছ?"

"হ্যাঁ।"

অবিনদা একটু চুপ করে থেকে হাসির গলায় বলল, "তোমার যিনি শাশুড়ী

হতেন তাঁর বোধ হয় শেষ পর্যন্ত মনে ধরল না!”

নদীর দিকে চোখ ফিরিয়ে আমি বললুম। “না ধরুক।”

অবিনদা হেসে উঠল। “তাঁর বোধ হয় মনে হল, তোমার মতন ছোট আয়নায় তাঁর বড় মুখটা ভাল করে দেখা যাবে না।“

আমার বেশ রাগই হচ্ছিল। কোথাকার কোন ছেলে তার কিসের এমন জেললা যে তার মন ভরছে না। বেশী বেশী। কলকাতার মানুষ ভীষণ পাজি হয়। পছন্দ হচ্ছে না—এটা এত পরে বলার দরকার কিসের? আগে বললে ক্ষতি ছিল? আমিই কি তোমাদের পছন্দ করেছি! কলকাতার ছেলে বিয়ে করার জন্যে আমিও কেঁদে মরছি না। তোমরা কেমন আমার জানা আছে। দিদিকে দেখলেই বুঝতে পারি, তোমরা কত ভাল।

“আয়না?”

“বলুন।”

“আগেকার দিনের মতন তুমি একটা স্বয়ংবর সভা করো—” অবিনদা মজা করে বলল, “আমি রাজপুত্রদের খবর দিয়ে আসব।”

আমি হেসে বললাম, “তাই করব।”

তারপর দু-জনেই চুপচাপ। অবিনদা আবার একটা সিগারেট ধরাল। গঙ্গার জোলো ঠাণ্ডা বাতাস, এই নিরিবিলি ঘাট, অন্ধকার, গাছপালা, নদীর কালো জল—সব যেন কেমন এক আবেশ সৃষ্টি করছিল। আমার যেন কিসের এক দুঃখ মনে-মনে কতদিন ধরে চাপা রয়েছে, বলতে পারি না। তপুর কথা আমার বারবার মনে পড়ছিল। কলকাতায় আসার আগে তপু একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি তাকে তাড়িয়ে দিই নি; কথাবার্তাও বেশী কিছু বলি নি। দিদির সঙ্গে গল্পটল্প করে সে ফিরে গেছে। বিনু আমায় একটা চিঠি লিখেছিল কলকাতায় আসার পর। বিনু আর বাপের বাড়িতে নেই। তার স্বামীর সঙ্গে চলে গেছে। বিনুর চিঠি থেকে জানতে পেরেছিলাম, সে তপুকে নাকি অনেক কিছু বলেছে। কী যে বলেছে বিনু লেখে নি, তবে বুঝতে পারি। তপুর কথা কলকাতায় আসার পর থেকে আমার যেন আরও বেশী করে মনে পড়ে। ওর ওপর আমার অনেক রাগ, তবু ওকে ভুলতে পারি না।

একটা ভোঁ বাজল কোথায়। নদীর জল ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ করছে। নৌকো-গুলোর ওপর রাখা লন্ঠনের আলোগুলো দুলছিল।

হঠাৎ আমার মনে হল, অবিনদাকে তো আমি কথাটা বলতে পারি। আগে কতবার আমার মনে হয়েছে, বলার মতন কেউ যদি থাকে তবে অবিনদা। অবিনদা আমার কথা শুনবে। বুঝবে। অবিনদাকে বলা যায়।

বলব কি বলব না করে কিছুক্ষণ কাটল। লজ্জা হচ্ছিল, আবার ইচ্ছেও করছিল ভীষণ। অবিনদা যদি ঠাট্টা করে স্বয়ংবর সভার কথা বলতে পারে তবে আমার বলতে আটকাচ্ছে কিসের!

"অবিনদা," আমি এমন করে বললাম যে আমার গলাই উঠল না।

অবিনদা আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

"আমাদের বাড়িতে আর বিয়েটিয়ে হবে না।"

"হবে না। কে বলল?"

"কেমন করে হবে। দিদি—" মুখ ফসকে বলে ফেলে আমি চুপ করে গেলাম।

অবিনদা আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথা নাড়ল আস্তে করে। "জানি।"

"আপনি শুনেছেন?"

"শুনেছি।"

"দিদির ওই। দাদাও তো—"

"সুহাস বিয়ে করবে না?"

"কই আর!" বলে আমি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। "বুলাদিকে আপনার মনে আছে?"

"কে বুলা?"

"সেই যে বুলাদি, আমাদের বাড়িতে আসত। মুখটা বেশ সুন্দর দেখতে।"

"ও! বুঝেছি।"

"দাদা বিয়ে করলে বুলাদিকেই করতে পারত।"

"ইন্দুদিকেও করতে পারে," অবিনদা ঠাট্টা করে বলল।

"যাঃ! অসম্ভব। ইন্দুদিরা কৃশ্চান, আপনি জানেন?"

"কৃশ্চানদের বিয়ে হয় না?"

"হবে না কেন! দাদা করবে না। তা ছাড়া দাদা যদি বিয়ে করে তবে বুলাদি কী দোষ করল! এক, বাড়ির জন্যে। আমাদের বাড়িটা কেমন যেন অবিনদা, আমার সব ভাল লাগে না।"

অবিনদা সিগারেটটা ঠোঁটের কাছে ঠেকিয়ে বসে থাকল। তারপর আচমকা বলল, "আর তুমি?"

"আমি?"

অবিনদা যেন বুঝতে পেরেছিল। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে আমার পিঠের ওপর রাখল।

আমি চুপ। আমার ভয় করছিল, লজ্জা করছিল, অথচ বলার জন্যে আমার বুকের মধ্যে ছটফট করছিল।

শেষ পর্যন্ত আমি বললাম। তপুর কথা। আমার কথা। সব বলা হল না। তাই কি বলা যায়!

আমি বড় ছেলেমানুষ। তপুর কথা বললাম তো বললাম কিন্তু আমার অমন করে কাঁদার কী ছিল। কতক্ষণ শুধু কাঁদলাম।

নিজেরই যখন খেয়াল হল, চোখ মুছতে মুছতে মরি।

অবিনদা হেসে বলল, "উঠে পড়ো। এমনিতেই বোধ হয় গঙ্গায় জোয়ার আসছে, তার ওপর এত নাকের জল চোখের জল গড়ালে কি আর রক্ষে থাকবে।"

মুখ মুছে আমি উঠে পড়লাম।

অবিনদাও উঠে দাঁড়াল।

"অবিনদা আপনি কিন্তু দাদাকে..."

"দাদা দিদি তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। ওটা আমার হাতে। আমি তোমার দাদার মতন বাজে ঘটক নই।"

"না অবিনদা, লক্ষ্মীটি। আমাদের বাড়ি তো আপনি জানেন। ...আমাদের মানমর্যাদা খুব। সকলেই শক্ত ধরনের। না হলে দিদি...। যাকগে, আমি কাউকে কিছু বলতে চাই না। আমার জন্যে বাড়িতে অশান্তি হোক আমি চাই না।"

"তোমাদের বাড়িতে একটা ভীষণ রকমের অশান্তিই এখন দরকার।"

অবিনদার দিকে আমি তাকালাম। সোজা পিঠে খুব সহজভাবে হেঁটে যাচ্ছে। যেন কোনো কিছুই গ্রাহ্য করছে না। আমার সঙ্গে অবিনদা ঠাট্টা করল কিনা বুঝতে পারলাম না।

সরু বাঁধানো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে কানে এল আবার কোথাও মোটা করে ভোঁ বাজছে। সারা নদী জুড়ে কেমন এক মত্ত হাওয়া উঠেছে। গাছপালা কেঁপে উঠছিল।

অবিনদা বলল, "তোমাদের বাড়িটা একটা যাদুঘর। যত পুরনো আর মরা জিনিস সাজিয়ে রাখতে গিয়ে নিজেরাও মরছ। যক্ষের ধন কী তোমাদের আছে জানি না, ভাই। যতটুকু আছে তার চেয়ে বেশীটাই যে নেই—এটা তোমাদের বোঝানো গেল না। যাক্ গে, একবার কোথাও একটা বড় ধরনের ভাঙন লাগুক। তারপর দেখব।"

আমি ভয় পেয়ে বললাম, "আমায় দিয়ে ভাঙবেন?"

অবিনদা বলল, "না। তোমায় দিয়ে নয়। তুমি অনেক ছোটো; অবিন ছোটো দিয়ে ভাঙে না। আমি ভাঙব বড় জায়গায়।"

কিছু বুঝতে না পেরে আমি অবিনদার জামা টেনে ধরলাম।

অবিনদা আমার মুখ দেখে হেসে ফেলল। তারপর বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই। আমি অভয় দিচ্ছি।"

রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আছি তো আছি। ট্যাক্সি আর পাই না। আকাশ যেন বড় বেশী কালো হয়ে এসেছে। মেঘ হয়ে এল নাকি!

অবিনদা আমায় নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে চলল। যেতে-যেতে হল্লা করার মতন গলা করে বলল, "আয়না রে, এবার আমি ভয়ঙ্কর কাণ্ড করব। ভাঙব, চুরবো, তছনছ করব। আমি ভাঙিব পাষাণ কারা।" বলে হোহো করে হাসতে লাগল।

অবিন

অফিসে আমার কাছাকাছি বসে নলিনাক্ষ। রোগাসোগা নরম ধাতের চেহারা, বিস্তর লেখাপড়া করা ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জুয়েলারীর কারবারে সে ছোট মাপের রত্ন। আমরা তাকে পণ্ডিত বলে তামাশা করলেও তার পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না। নিজের সরকারী চেয়ার ছেড়ে সে দিনের বেশীর ভাগ সময়টাই আমাদের ঘরে বসে ধুলো ঘাঁটত। কী অপরিমিত ধৈর্য নিয়ে সে প্রাচীনতার ধুলো ঘাঁটত দেখলে আমার মায়া হত। কথাবার্তায় ব্যবহারে চমৎকার ছেলে, কিন্তু ওই যে—ইতিহাসের ঠেলাগাড়ি টানতে টানতে বুক পিঠ নুইয়ে ফেলেছে এটা আমার ভাল লাগত না। নলিনাক্ষর সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক ছিল, সে আমাদের এক কলেজী বন্ধুর ছোট ভাই—সেই সুবাদে তার সঙ্গে হাসিতামাশা করতাম।

সেই নলিনাক্ষ সেদিন আড়ালে আমায় একটা হলুদ ছোঁয়ানো, লাল কালিতে অবিনচন্দ্রর নাম লেখা একটা খাম দিল। বলল, "দাদা, আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে।"

নলিনাক্ষর বিয়ে। ছাপানো চিঠিটা একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম। পাত্রীর নাম দেখি, প্রকৃতি। আমি হেসে বললাম, "নলিন, এবার থেকে তোমার প্রকৃত পাঠ শুরু হল। তোমার প্রকৃতি পরিচয় সুখের হোক, আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হব।"

নলিনাক্ষ লাজুক মুখ করে হাসতে লাগল।

জানলার বাইরে তখন প্রকৃতি পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। মেঘলা এত গাঢ় হয়ে আসছিল যে, মনে হচ্ছিল, মেঘের দল আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসেছে। কলকাতার মাথার ওপর বড় রকমের এক বৃষ্টিবাদলা জড় হয়ে যাচ্ছে বলে আমার মনে হল। আজ আমায় হাসপাতালে যেতেই হবে, পর পর দু-দিন যেতে পারিনি। বৃষ্টি এসে গেলে আর যাওয়া হবে না। আমি বললাম, "নলিন, বাইরে মেঘৈর্মেদুরম্বরম...; তুমি ভাই প্রকৃতি চিন্তা করো, আজ আমায় ছুটি দাও; একটু হাসপাতালে যাব। এখন যদি না পালাই আজ আর হাসপাতালে যাওয়া হবে না।"

নলিন বলল, "আপনি প্রায়ই হাসপাতালে যান। কে আছেন?"

আমি বললাম, "আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক। অবস্থা ভাল নয়।"

আর কথা না বাড়িয়ে অফিস থেকে পালালাম। ঘড়িতে তখন তিনটেও

বাজে নি। এত তাড়াতাড়ি হাসপাতালে যাওয়া যায় না, যতটা সম্ভব হাসপাতালের দিকে এগিয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভেবে আমি একটা গাড়িঘোড়ার চেষ্টা করতে লাগলাম।

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, তিন দিকের কালোয় পশ্চিমের হালকা ছায়ার ভাবটাও কালচে হয়ে এল। পাখিটাখি কোথাও আর চোখে পড়ে না, আকাশ ছেড়ে সব যেন পালিয়ে গেছে; মাঠের গাছগুলো শেকড় ডালপালা শক্ত করে দাঁড়িয়ে—বৃষ্টির প্রথম দমকটা সহ্য করার শক্তি সংগ্রহ করছে বোধ হয়। একটু-একটু ধুলো উড়তে শুরু করল। ট্রাম পালাচ্ছে মাঠের গা ধরে। কয়েক পা দৌড়ে একটা বাস ধরতে পারলাম।

বৃষ্টি আসার মুখে মুখে আমি হাসপাতালের কাছাকাছি পেঁছে গেলাম। তারপর বৃষ্টি এল। একটা চায়ের দোকানে উঠে মাথা বাঁচাই।

। প্রথম পশলাটা শেষ হতে অন্তত আধ ঘণ্টা। চারটে বেজে গেছে ততক্ষণে। রাস্তার একপাশে জল বইতে শুরু করেছে। মাথা বাঁচিয়ে ছুটতে-ছুটতে হাসপাতাল।

শচিপতি একলা ছিলেন।

দিন তিনেক হয়ে গেল শচিপতিকে একটা কেবিনে আনা গেছে। হাত কয়েকের ঘর, বাইরের দিকে একটা সরু জানলা। বৃষ্টির দরুণ জানালা বন্ধ ছিল। ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, আলো জ্বালানো সত্ত্বেও ঘর অস্পষ্ট হয়ে আছে। কেবিনঘরের বিছানাটা একটু উঁচু, মাথার দিকে একটা মিটশেফ। কাঠের একটা টুল ছিল মাথার পাশে। আরও কিছু টুকটাক।

শচিপতি আমায় দেখে বোধ হয় অবাকই হলেন, ম্লান করে হাসলেন।

রুমালে মাথা মুখ মুছতে-মুছতে আমি বললাম, "ভীষণ বৃষ্টি; আজ কলকাতা ভেসে যাবে।"

"হ্যাঁ; জোরেই বৃষ্টি নামল..." শচিপতি বললেন, "আপনি ভিজতে-ভিজতে এলেন?"

"সামান্য; অফিস থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি।"

"বসুন।"

নিজের ভেজা জামাটা সামলে নিয়ে বসলাম। "দু-দিন আর আসতে পারলাম না।"

"আর কত আসবেন?"

শচিপতির মুখের দিকে তাকালাম। গত কয়েক দিনের তুলনায় তাঁকে ভাল না মন্দ দেখাচ্ছে আমি বুঝতে পারলাম না। দাড়ির জন্যে গাল কতটা বসে গেছে বোঝা যায় না। চোখ আরও নীচে নেমেছে। কপালের রঙ হলুদ মতন দেখাচ্ছিল, চিবুকের তলায় গলার চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। হাত দুটি শুকনো, জিরজির করছে।

"কেবিনে এসে কেমন লাগছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আলাদা আর কী! একা-একা থাকি। ওখানে মানুষজনের চেহারা দেখতে পেতাম।"

আমি কিছু বললাম না। শচিপতিকে আলাদা করে নিয়ে আসার দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ, শীঘ্র হয়ত ওঁর একটা অপারেশান হবে। অন্য কারণ, অনেক রোগীর মধ্যে থাকতে-থাকতে শচিপতি নিজের অসুখ সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত হয়ে আসছিলেন। যে-কোনো কারণেই হোক এটা আমরা চাই নি। ইন্দু অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, তদ্বির করে এই কেবিনটার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি চেষ্টা না করলে হত না।

বাইরে আবার বৃষ্টি এসে গেছে। তুমুল বৃষ্টি। খোলা দরজা দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম বাইরের বারান্দায় জলের ঝাপটা এসে পড়ছে। মেঘ ডাকছে হুঙ্কার করে; হাসপাতালের অস্বাভাবিক আবহাওয়াটা আরও নির্জীব বিষণ্ন হয়ে এসেছে।

আমি বললাম, "আজ আর সুহাসরা আসতে পারছে না।"

শচিপতি বললেন, "কেমন করে আসবে।" বলে একটু থেমে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সুহাসকে আমি বারণ করেছি; বলেছি—তুই রোজ-রোজ আমায় কেন দেখতে আসিস। জ্যাঠামশাইকেও বলেছি, আপনি এভাবে কেন আসেন, আপনার কষ্ট হয়, আমারও খারাপ লাগে।"

আমি অবাক হচ্ছিলাম। শচিপতির গলার স্বর বেশ ভাঙা। আগের দিনও আমার কানে এটা ধরা পড়েনি।

"অবিনবাবু—"

"বলুন?"

"জ্যাঠামশাইকে আপনারা ফেরত পাঠাতে পারছেন না?"

"বলেছি। উনি যেতে চান না।"

"কলকাতায় ওঁর খুব কষ্ট হচ্ছে।"

"আপনার কাছে আসেন, বসেন; ভাল লাগে ওঁর..."

"আমার খারাপ লাগে। আমি ওঁকে রোজই বলি, আপনি আর আসবেন না। কী দরকার ছোটাছুটি করে!"

আমি কোনো জবাব দিলাম না। জ্যাঠামশাইকে কলকাতায় রাখতে সুহাসও আর চাইছে না। দেখতে-দেখতে অনেকদিন হয়ে গেল; জ্যাঠামশাই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। বাড়িতে মোহিনী একা। সুহাস বিরক্তই হয়ে উঠছে। আমিও তাঁকে অনেক বলেছি, আপনি ফিরে যান, কতদিন কলকাতায় বসে থেকে থেকে কষ্ট পাবেন। তিনি আজকাল অবশ্য বলতে শুরু করেছেন, হ্যাঁ —যাব; এইবার যাব। কবে যাবেন আমি জানি না।

শচিপতির শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সামান্য কথা হল। তারপর আবার সুহাস আয়নার কথা। শেষে আমরা চুপ করে গেলাম।

এমন সময় ইন্দু এলেন। তাঁর হাসপাতালের ডিউটি শেষ হয়ে গিয়েছে।

রোজই কিছুক্ষণ শচিপতির খোঁজ-খবর করে যান। আজ ঘরে এসে আমায় দেখে অবাক হয়ে বললেন, "আপনি এসেছেন?"

আমি বললাম, "কোনো রকমে—"

ইন্দু আমার হাসপাতালে আসার বিবরণ শুনলেন। বললেন, "ফিরবেন কী করে?"

আমি হেসে বললাম, "সাঁতার কাটতে কাটতে।"

ইন্দুও হাসি মুখে জবাব দিলেন, "আপনি সাঁতার জানেন, আমি তাও জানি না।"

"তাহলে?"

"দেখুন কী হয়। এখন পাঁচটা বাজছে। দু-তিন ঘণ্টার আগে কিছুই করা যাবে না।"

শচিপতি ইন্দুকে বসতে বললেন।

ইন্দু বসলেন না; তাঁর ডিউটি শেষ হয়েছে, তবু কিছু কাজকর্ম ছিল হয়ত নিজের, বললেন, "আমি ঘণ্টাখানেক পরে আসব।"

ইন্দু চলে গেলেন। বৃষ্টি বাড়ছে, না কমছে—কিছুই বোঝা যায় না। একই রকম শব্দ শুনছি, জলের তোড় বয়ে যাচ্ছে যেন। বাতাসটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। চারদিক থেকে অদ্ভুত এক আর্দ্রতা জমে এসেছে। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে বাইরে। প্যাসেজের আলো টিমটিম করছে, ঘরের আলো চোখে পড়ার মতন হয়ে উঠল। একজন সিস্টার এসেছিলেন ঘরে, শচিপতির তদারকি করে চলে গেলেন।

আমরা দু-জনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ। আজ সুহাসদের আসার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি যতক্ষণ আছে, যদি বা বৃষ্টি এখন থেমেও যায়—তবু আমার পক্ষে আপাতত এখানে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

চুপচাপ বসে থাকাও অসহ্য। শচিপতি ক্রমশই কথাবার্তা কমিয়ে আনছেন। দুর্বলতা বোধ করেন, ইচ্ছাও হয়ত অনুভব করেন না।

নীরবতার মধ্যে শচিপতিই হঠাৎ বললেন, "আজ দুপুরে শুয়ে থাকতে থাকতে একবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলাম।"

আমি শচিপতির মুখের দিকে তাকালাম।

শচিপতি বললেন, "ছোটকাকি রাঁচি থেকে আমায় দেখতে এসেছে। স্বপ্নের মধ্যেই আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছি, বিশ্বাসই করতে পারছি না ছোটকাকি ভাল হয়ে কলকাতায় আসতে পারে।"

"স্বপ্ন তো—!"

"স্বপ্নই। তবু ছোটকাকি ভাল হয়ে গিয়েছে ভাবতে আমার বড় আনন্দ হচ্ছিল।" বলে শচিপতি একটু থেমে গিয়ে কী ভেবে আবার বললেন, "আমার সঙ্গে আজ বছর দেড়েক ছোটকাকির আর কোনো যোগাযোগ নেই। আমি খোঁজ নিই নি। নিয়ে লাভ ছিল না। চিনতেই পারে না একেবারে।... কলকাতায়

আসার আগে একবার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল।"

একটু থেমে আচমকা কেমন ছেলেমানুষের মতন গলায় বললেন, "ছোটকাকি ভাল হয়ে যাক—এ আমি কতবার চেয়েছি। সত্যি যদি ভাল হত কাকি!"

আমি একটু হেসে বললাম, "আপনার ছোটকাকির এখন আর ভাল হয়ে লাভ নেই। আপনি ভাল হয়ে উঠুন, আমরা খুশী হব।"

শচিপতি আমার চোখের দিকে তাকালেন, আমাকে দেখছিলেন, অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বেশ; পরে বললেন, "ভগবান আপনাদের খুশী করতে চান না।"

"আপনিও কি চান না?"

"আমার চাওয়ায় কিছু নির্ভর করে না" শচিপতি বললেন; মাথার বালিশটা উঁচু করে নিলেন সামান্য। তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। মানুষটি ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছেন। পাঁচ-সাত কি দশদিনের মধ্যে যদি অপারেশন হয়, আমি জানি না উনি কেমন করে ধকলটা সামলাবেন।

দুর্বলতা সামলে নিয়ে শচিপতি বললেন, "অবিনবাবু, আমার তো এখন করার কিছু নেই, হাঁটাচলাও বারণ হয়ে গেছে। শুয়ে-শুয়ে আমি অনেক কিছু ভাবি, মাঝে-সাঝে একটু বই পড়ার চেষ্টা করি, পেরে উঠি না। আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে আমার একটা কথা মনে হয়, মানুষের জীবনটা তার নিজের হাতে এ-অভিমান করে লাভ নেই। আমাদের কতটুকু নিজের তাও আমি বুঝতে পারি না। বরং আমি দেখলাম, আমার জীবনের বারো আনাই হল অদৃষ্টের হাতে। সে অনেক বড়, তার সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই। আমি কী চাই, আপনি কী চান—তার ওপর আমার আপনার যতই মায়া থাক, আমাদের ভাগ্যকর্তার কিছু আসে যায় না।"

আমি বললাম, "আপনি খুব সহজ করে কথা বলছেন। এত সহজ করে কথা বললে জীবনটাকে নিয়ে সমস্যা থাকে না।"

শচিপতি বললেন, "আমার নিজের আর কোনো সমস্যা নেই।"

"কোনো সমস্যা নেই?"

"না। ক'দিন আগেও আমার মনে কিছু দুঃখ ছিল। আমার কিছু সাধ হয়েছিল। আমার সে-দুঃখ নেই, সাধ মিটল না বলে আফসোস নেই। আমার যেখানে শেষ হলে ভাল হয়, আমি সেখানেই শেষ হব।"

শচিপতির সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছে আমার হল না। মৃতপ্রায় ওই মানুষটির সঙ্গে তর্ক করার জায়গা এটা নয়, সময়ও নয়। তাছাড়া শচিপতি এখন যেন সমস্ত বিশ্বাস আশ্চর্যভাবে হারিয়ে ফেলেছেন।

আমি শুধু হেসে বললাম, "আপনি কোথায় শেষ হবেন আমি তো জানি না।"

শচিপতি কোনো জবাব দিলেন না। চোখ বুজে শুয়ে থাকলেন।

বৃষ্টিবাদলার মধ্যে সন্ধ্যের মুহূর্তটি গাঢ় হয়ে অনেকটা রাত হয়ে যাবার

মতন মনে হচ্ছিল। আচমকা দেখি শচিপতির ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। বারান্দাও ঘুটঘুট করে উঠল। হাসপাতালের এ-পাশটা অন্ধকার। বড় ঘর থেকে যেন অনেকগুলো গলার বিভ্রান্ত স্বর ভেসে এল। আলো নিবে গেছে। ভীষণ এক অন্ধকারের মধ্যে আমি আর শচিপতি। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। ঘরের মধ্যে বাদলার ঠাণ্ডা। বৃষ্টির শব্দ মিহি হয়ে এসে ঝিঁঝির ডাকের মতন শোনাচ্ছে, বোধ হয় গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে এখনও।

"শচিপতিবাবু—" আমি ডাকলাম।

শচিপতি সাড়া দিলেন না। তাঁর নিশ্বাসের শব্দও আমার কানে আসছিল না। আচমকা আমার কেমন মনে হল, শচিপতি যেন এই ঘরে নেই, অন্ধকারের মধ্যে কোথাও চলে গেছেন। তাঁর থাকা আর না-থাকার মধ্যে কোন্‌টা সত্য আমি যেন সেই বিভ্রমে পড়ে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলাম। কেমন অস্বাভাবিক উদ্বেগ বোধ করে ডাকলাম, "শচিপতিবাবু—।"

শচিপতি এবার সাড়া দিলেন।

আমি বললাম, "হাসপাতালের এদিককার আলো নিবে গেছে।"

"আগেও একদিন গিয়েছিল," শচিপতি বললেন। তারপর সামান্য নীরব থেকে ধীরে-ধীরে আবার বললেন, "এই অন্ধকার আমার এখন চোখ-সওয়া।"

শচিপতি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, দপ্‌ করে আলো জ্বলে উঠল। উনি আগের মতনই শুয়ে আছেন, ডান হাতটা বুকের কাছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইন্দু এসে পড়লেন। এসেই বললেন, তাঁর কোন্‌ রোগীর একটা গাড়ি হাসপাতালে এসেছিল, ফিরে যাচ্ছে, আমরা সেই গাড়িটায় ফিরতে পারি।

আমায় উঠতে হল।

ইন্দু সিস্টারকে ডেকে শচিপতির সম্পর্কে কথাবার্তা বলে নিলেন।

চলে আসার সময় শচিপতি হঠাৎ বললেন, "অবিনবাবু, আমার একটা চিঠি আছে। কাল যদি পোস্ট করে দেন—"

মাথার পাশে বইয়ের মধ্যে গোঁজা একটা খাম হাতড়ে শচিপতি আমার হাতে দিলেন। দেখলাম, খামের ওপর মায়াবতীর ঠিকানা।

হোটেলে আমার ঘরের একটা মস্ত সুবিধে হল, নীচের হট্টগোলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। হোটেলে ফিরে দেখি দোতলায় একটা কুরুক্ষেত্র বেঁধেছে। কারণটা হয়ত মামুলী কিন্তু ঘটনাটা এতদূর গড়িয়ে গিয়েছে যে দু-পক্ষই যেন সৈন্য সাজিয়ে যুদ্ধের জন্যে হুঙ্কার দিচ্ছে।

আমার ঘরের বিছানাপত্র বিশেষ একটা ভেজেনি। জানালা বন্ধই ছিল। দরজার সামনেটাতেই যত জল, পাল্লার ফাঁক দিয়ে হু-হু করে জল ঢুকে মেঝেটা ভিজিয়ে দিয়েছে। জল মোছার জন্যে হাঁকডাক শুরু করতেই রতন ছুটে এল।

হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে বসবার সময় সামান্য ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগল।

বাইরে বৃষ্টি নেই, বাদলা বাতাসের দমকা আছে, একনাগাড়ে দু-তিন ঘন্টার বৃষ্টিতে কলকাতা যেন ভিজে ফুলে গিয়েছে। মেঘ তখনও ডাকছিল। চা খেয়ে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আরাম করে সিগারেট খাচ্ছি, হঠাৎ মনে হল, অফিসে মোহিনীকে চিঠি লেখার যেটুকু খসড়া করেছিলাম মনে-মনে সেটুকু এখন আর আমার তেমন পছন্দ হচ্ছে না। মোহিনী আমায় হালে যে-চিঠি দিয়েছেন, তার জবাব আমার দেওয়া হয়নি। চিঠিটা এসে দিন তিনেক পড়ে আছে। জবাবটা দেওয়া দরকার।

মেয়েদের স্বভাব হল, তারা যখন হার মানে, তখন লোক জড় করবার জন্যে প্রয়োজনের বেশী চেঁচামেচি করে। মোহিনীর চিঠিটা অনেকটা সেই ধরনের। তিনি যতটুকু মুখ খুললে তাঁকে মানাত, তার বেশী চেঁচামেচি করেছেন। এটা তাঁর স্বভাব নয়, কিন্তু স্বভাবকে তিনি আর বোধ হয় সামলাতে পারছেন না।

মোহিনী আমায় রূঢ় করে লিখেছেন: সংসারে সকলকেই একই ধরনের পাওনাগণ্ডার হিসেব করতে হবে তা তিনি মনে করেন না। তাঁর যদি কখনো মনে হয়, কী তাঁর জমা হল সংসারের কাছে—তিনি সে হিসেব করে নিতে পারবেন।

মোহিনী ভেবেছেন, আমি তাঁকে লোকসানের হিসেবটা ধরিয়ে দিয়ে বিপন্ন করতে চেয়েছি। আমার সে উদ্দেশ্য একেবারে ছিল না এমন কথা বলি না। কিন্তু সেটাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। যতটুকু বুদ্ধি থাকলে মানুষ নিজের বিপন্ন অবস্থাটা বুঝতে পারে, মোহিনীর সে-বুদ্ধির অভাব নেই। তিনি বুদ্ধিমতী, কিন্তু তাঁর মর্যাদাবোধ সাধারণ সত্যটাকে মানতে চাইছে না।

আমি মোহিনীকে এক দিকমে এই কথাটা বোঝাতে চেয়েছি, আপনি চার-দিক থেকে আবদ্ধ হয়ে আছেন, আপনি ভাবছেন, আপনার ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ রাখলেই আপনি নিস্তার পাবেন। বাইরের ঝড়ঝাপটা এসে কোথাও কিছু তছনছ করবে না, ঘরের যেখানে যা আছে অবিকল তা সাজানো থাকবে। হয়ত তা থাকবে। কিন্তু ঘরের বাতাসটা যে সুস্থ কিংবা স্বাভাবিক থাকবে না এটা না বোঝার কারণ নেই।

মোহিনী ভাবেন, তিনি সংসারে যে মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—এই মূর্তির অশেষ মহিমা। আমি বলি, এর কোনো মহিমা নেই। মানুষ যদি মাটির গড়া মূর্তি হত তার একটা মহিমা হিন্দু সমাজে গড়ে তোলা যেত। মোহিনী তো মাটিতে গড়া মূর্তি নন। তাঁর মধ্যে যে রক্তমাংসের বেদনা আছে আমি তা না লক্ষ্য করার মতন অন্ধ নয়।

মোহিনী আমায় লিখেছেন: মেয়েদের চরিত্র হল, তারা দেউলেপনার নেশায় মাতে না। যারা মাতে তারা মরে। আমি তো মরবার সাধ নিয়ে জন্মাই নি। সংসারে আমার জ্ঞানবুদ্ধি যখন থেকে ভালমন্দ বুঝতে শেখাল, তখন থেকেই আমার চারপাশে যাদের দেখেছি, তারা আমায় যে-শিক্ষা দিয়েছে সেই

শিক্ষাই আমার যথেষ্ট। অন্য শিক্ষায় আমার প্রয়োজন নেই। যে-মাটিতে আমি বেড়ে উঠেছি, তার মধ্যেই আমার শেকড়।

এই ধরনের কথাবার্তা, মোহিনী আমায় যা লিখেছেন, দু-একবার পড়লেই বোঝা যায়, তিনি স্পষ্ট করে সংক্ষেপে যা বলতে পারতেন—সেটা মেয়েলী করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অস্পষ্ট করেই বলেছেন। মাঝে-মাঝে তাঁর ভর্ৎসনাও আছে। আমার স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন, আমি মাত্রা মেনে চলতে পারছি না।

অবিনের স্বভাব হল, সে যখন কিছু মানতে চায়, তখন প্রথম থেকেই মেনে নেয়। মাঝামাঝি এসে মানতে চায় না। আমি যদি মাত্রা মানতুম, মোহিনীকে প্রথম দর্শনেই মেনে নিতাম। আমি সে মাত্রা মানি নি।

আমি অফিসে বসে মনে-মনে চিঠির যে খসড়াটা ভাবছিলাম তাতে খানিকটা হাসি-রগড়ের ভাব ছিল প্রথমটায়। এখন আর আমার সেটা পছন্দ হচ্ছিল না। মোহিনীকে কিছু রূঢ় কথা আমারও লেখার আছে।

সুহাসদের সংসারে মোহিনীর একটি স্বার্থপর ভূমিকা আছে। কোনো দিনই তাঁর মনে হয় নি যে, তিনি বিগ্রহ হয়ে যেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেখানে তাঁর আধিপত্যটাই বড়।

রতন এসে এই সময় ডাকল। বলল, খাবেন চলুন।

নীচে কুরুক্ষেত্র থেমেছে কি না জিজ্ঞেস করতে রতন বলল, অনেকক্ষণ থেমে গেছে।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে ঘরে এসে দরজাটা বন্ধ করে একবার ভাবলাম, মোহিনীকে চিঠিটা লিখে ফেলি। কাগজ-কলম টেনে নিয়ে লিখতে বসেও আর বসা হল না। ঘুম পাচ্ছিল।

বাতি নিবিয়ে বাকি সিগারেটটুকু শেষ করে শুয়ে পড়লাম।

শুয়ে থাকতে-থাকতে দেখি মোহিনী এসেছেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হল, দেবী কুপিতা হয়েছেন।

আমি হেসে বললাম, আপনার চিঠির জবাব ভাবছি।

মোহিনী আমার হাসিটা লক্ষ্য করে বিরক্ত হবার মতন চোখ করলেন।

আমি বললাম, দেখুন মেয়েদের একটা অভ্যেস থাকে তারা কারণে অকারণে ধুলো উড়োতে ভালবাসে। আপনি যতটা ধুলো উড়িয়েছেন তাতে আমার চোখের ঝাপসা ভাবটা এখনও কাটে নি।

মোহিনী বললেন, মেয়েরা যখন ধুলো উড়োয়, তখন ঘরের মধ্যে কোথাও কিছু ময়লা নিশ্চয় থাকে। সেটা তাদের পছন্দ নয়।

আমি ওঁর রাগের বহর দেখে হেসে ফেললাম, জীবনে কি আপনার সবই অপছন্দ?

মানে?

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, আপনি শচিপতিকে অপছন্দ করেছেন, স্বামীকেও পছন্দ করেন নি—তার আগেই যেন মোহিনী আমার কথাটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বললেন, আমার জীবনটা আমারই থাক, ও নিয়ে অন্যের ভাবনা আমার সহ্য হয় না।

আমি বললাম, আপনার জীবনটা আমার নয় এটা খাঁটি কথা। কিন্তু আমার জীবনে আপনি যে যোগিনী নন এটাও বড় মিথ্যে কথা নয়। আপনার জীবন আমার নাগালের বাইরে বলেই আমার এত আফসোস।

মোহিনী বললেন, আফসোসটা থাক।

আমি হেসে উঠে বললাম, না না, ওটা রাখব না বলেই তো আমার এই জেদ। আপনি নিজেকে যে খুঁটিতে বেঁধে রেখেছেন সেই খুঁটি আমি ভাঙব।

মোহিনী আমায় আড়চোখে দেখলেন।

আমি বললাম, আপনার সঙ্গে মকদ্দমা লড়তে হলে আমি কোনো উকিল রাখতাম না, জজ সাহেবকে শুধু বলতাম, ধর্মাবতার আমার যিনি বিরোধীপক্ষ তাকে শুধু বলুন, তিনি যেন একটা কথা ভেবে দেখেন। টাকার মতন মানুষের একটা সোজা পিঠ, অন্যটা উলটো। উনি ভাবছেন, দুটো পিঠেরই সমান দাম। কিন্তু মানুষের বেলায় সেটা ঠিক নয়।

মোহিনী বললেন, ঠিক নয় কেন?

আমি বললাম, তাতে পাওনা মেটানো যায়, শান্তি থাকে না।

মোহিনী মাথা নেড়ে বললেন, আমার শান্তি আছে।

আমি বললাম, না। আপনার শান্তি নেই।

মোহিনী

অনেকদিন পরে আজ সকালে রোদ উঠেছিল। রোদ দেখে কার্তিককে বললুম, ঘরদোরের দরজা-জানলা সব হাট করে খুলে দিতে। এখানকার বৃষ্টির এই ধরন, নামলে আর ধরতে চায় না। এক শনিবার দুপুরে বৃষ্টি নামল, তারপর আরেক শনিবার পার করে আজ দেখলাম আকাশে সূর্য উঠেছে। রোদের মুখ দেখে সকাল বেলাতেই মনটা ঝরঝরে লাগল।

রাত্রের বাসী কাপড় জামা ছেড়ে সংসারের মধ্যে আর ঢুকতে ইচ্ছে হল না। কমলা একাই সব দিক সামলে নিতে পারে, গিরির মা দিন কয়েকের ছুটি নিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে। আমার আর ভাঁড়ার নিয়ে বসবার ইচ্ছে হচ্ছিল না।

চা খেয়ে ঘরদোরের কাজকর্ম নিয়ে পড়লুম। একটানা বর্ষাবাদলায় কী অবস্থাই হয়েছে সব। আসবাবপত্র, বিছানা-মাদুর স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে; ঠাণ্ডায় ছাতা পড়ার মতন হয়েছে যেন। একে ঘরদোরে মানুষজন নেই, এমনিতেই ফাঁকা পড়ে থেকে-থেকে বিচ্ছিরী দেখায়, তার ওপর এই একটানা বৃষ্টিতে ভাল করে জানলা-দরজাও খোলা হত না, বাতাস বইত না, রোদ ঢুকত না; কেমন এক গন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে সকাল থেকেই ঘরদোরের কাজে নামলাম। প্রথমে জ্যাঠামশাইয়ের ঘর। বিছানা মাদুর উলটে-পালটে দিয়ে তোশকটা পাঠালাম রোদে। জানলার খড়খড়িতে কত রকমের ময়লা জমেছে, ঝড় বাদলায় উড়ে আসা খড়কুটো পর্যন্ত। জ্যাঠামশাইয়ের বইপত্র—আরও কত টুকটাক একপাশে জমেই আছে। হোমিওপ্যাথির বড়-বড় বাক্স। নিজের হাতে সব পরিষ্কার করে একটু বসেছি, দেখি ফটক খুলে কার্তিক আসছে। বাজারে গিয়েছিল, ফিরছে। তার সাইকেলের হাতলে তরিতরকারির থলেটা ঝোলানো।

কার্তিক বারান্দায় তার সাইকেল রেখে এসে আমায় খোঁজাখুঁজি করছিল। সাড়া দিতে ঘরে এল। এসে চিঠি দিল। বাজার ফিরতি পথে পোস্ট অফিস থেকে নিয়ে এসেছে।

চিঠিগুলো হাতে নিয়ে দেখি, জ্যাঠামশাই আর সুহাস দুজনেই আলাদা করে দুটো চিঠি লিখেছে। আর একটা চিঠি অবিনের সেটা ওজনে যেন বেশ ভারী। একই সঙ্গে তিনটে চিঠি পেয়ে একটু যেন অবাক লাগল।

অবিনের চিঠিটা সরিয়ে রেখে খাম ছিঁড়ে জ্যাঠামশাইয়ের চিঠিটা প্রথমে

পড়লাম। কলকাতার খবরাখবর এবারে তেমন একটা নেই। শচিদার কথা লিখেছেন সামান্য। সবচেয়ে বড় খবর, জ্যাঠামশাই ফিরে আসছেন জানিয়েছেন; শীঘ্রই ফিরে আসছেন; আয়নাও আসছে।

চিঠিটা পড়ে মনটা আমার হাঁফ ফেলল। সত্যি, আর আমি পেরে উঠছিলাম না। এমন করে একা-একা থাকা যায়! কতদিন হল জ্যাঠামশাইরা চলে গেছেন, অন্তত মাস দেড়েক। সেই আষাঢ়ে গিয়েছিলেন, আর শ্রাবণের মাঝামাঝি পেরিয়ে গেল। আমার ভাল লাগছিল না আর। এমন করে আমি কোনোদিন থাকি নি। এত বড় বাড়ি, এতগুলো ঘর, ওই মস্ত বারান্দা, দালান—এর মধ্যে আমি একটি মাত্র মানুষ মুখ বুজে বসে আছি। কার্তিক আর কমলা আছে তাই না রক্ষে, তারাও যদি না থাকত কী অবস্থাই হত আমার। তা ছাড়া, আমার নিত্যকার সংসারের কাজ যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল। জ্যাঠামশাই থাকলে তাঁর সেবাযত্ন দেখাশোনা করেও তো খানিক সময় কাটে, সেটা আমার কতকালের অভ্যেস; অভ্যেসটুকু না থাকলে ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। আয়নাও নেই। আয়না থাকলে তবু তার সঙ্গে পাঁচটা কথা বলে বাঁচতে পারতাম। জ্যাঠামশাই কলকাতায় আছেন—এতেও আমার কম চিন্তা ছিল না। না জানি এই বয়েসে শরীরস্বাস্থ্য ভেঙে কি-একটা বাধিয়ে আসবেন। তখন যে আমি কী করে ওই বুড়ো মানুষকে সামলাব কে জানে!

এই দেড় মাসেই আমি বুঝতে পেরেছি, আর দেড়দিন পরে আমার কী অবস্থা হবে। জ্যাঠামশাই চিরকাল থাকছেন না। আয়নাও কিছু নয়। আমি তখন একা। আমার বাঁচার উপায় কী হবে তখন?

জ্যাঠামশাই যা লিখেছেন তাতে আমার মনে হল তাঁর ফিরতে ফিরতে এই মাসের শেষ হবে। দশ-বারোটা দিন আর।

চিঠিটা পড়ে অল্পক্ষণ জানলা দিয়ে বসে বসে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকলাম। আজকের রোদটি বেশ তাত আছে, রঙটিও উজ্জ্বল। বাগানে গাছপালা বর্ষার জলে সবুজ হয়ে গিয়েছে, ঘাস বেড়েছে হুহু করে, কলকে ঝোপের মাথায় সরু-সরু ডালপালা ছড়িয়ে পড়ে রোদ খাচ্ছে। এই এক-নাগাড় বৃষ্টিতে কাকের ডাক ছাড়া বড় কিছু কানেই পড়ত না। আজ পাখিটাখি ডাকছিল। বাইরের সব কিছুই যেন হাঁফ ফেলে বাঁচল এতদিন পরে।

সুহাসের চিঠিটার মুখ ছিঁড়ে ভাবলাম, যাই একটু বাইরে গিয়ে বসি। জ্যাঠামশাইয়ের ঘরের কাজও শেষ হয়েছে। আয়নার কুকুরটা কোথাও গিয়েছিল, কাদা মেখে বাগানে ছুটছে। হতভাগা কুকুরটাকে ডাকতে ডাকতে বাইরে এলাম। বারান্দায় রোদ লুটিয়ে আছে। বসার ঘরের খোলা জানলার পাশে রোদ বেঁকে গিয়ে দেওয়ালের গা ধরে উঠে যাচ্ছে। একরাশ পিঁপড়ে বেরিয়েছে জানলার কাঠ থেকে।

সুহাসের চিঠিটা বড় নয়, ছোট। ব্যস্ত মানুষের তাড়া রয়েছে চিঠিটায়। সুহাসের চিঠি পড়ে বুঝতে পারলাম, জ্যাঠামশাইদের ফেরার কথাটা পাকা।

শচিদার কথাও লিখেছে সুহাস, বরং জ্যাঠামশাইয়ের চিঠিতে যা পরিষ্কার করে লেখা ছিল না সুহাস বরং সেটা স্পষ্ট করেই আমাকে লিখেছে। শচিদার শরীরের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। তার বাঁচার আশা আর কেউ করছে না। নিতান্ত যদি আয়ুর জোর থাকে অন্য কথা, নয়ত শচিদাকে আর বোধ হয় একটা মাসও বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। ডাক্তাররা খুব শীঘ্রই একটা কাটাকুটি করতে চাইছে। জ্যাঠামশাইকে তার আগে-ভাগেই সুহাস ফেরত পাঠাতে চায়।

এই সব কথাবার্তার পর সুহাস একটা অদ্ভুত কথা লিখেছে। আমি কিছু বুঝলাম না। লিখেছে, আয়নার বিয়ের জন্যে কলকাতায় আর সে পাত্র খুঁজে বেড়াবে না। দরকার নেই। জ্যাঠামশাইরা ফিরলেই নাকি আমি সব বুঝতে পারব।

সুহাসের এই কথা থেকে আমি ছাই কিছুই বুঝলাম না। সুহাস কি রাগ করে কথাটা লিখেছে? তা তো মনে হল না। তবে কলকাতায় আয়নার জন্যে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করতে গিয়ে সে যে বিরক্ত হয়েছে এটা আমি আগেই বুঝেছি। আমি ওর দোষ দিই না। মেয়েদের বিয়ের বারো আনাই কপাল। আয়নার কপালে ওই ছেলেটি জুটল না, এর বেশী আমি আর কী ভাবতে পারি।

সুহাসের চিঠিটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। গিরির মা কলা-গাছের ঝোপের দিকে পুরোনো কুয়াতলায় বসে-বসে সাবান কাচছে। রোদ যেন বেড়েই যাচ্ছিল। গাছপালার ভিজে ডালপাতা শুকিয়ে আসার পর কেমন যেন গন্ধ উঠছিল বাগানের দিক থেকে, মাটিও শুকিয়ে উঠছে।

অবিনের চিঠিটা তখনও আমার খোলা হয় নি। চিঠিটা না খুলেই আমি ভাববার চেষ্টা করলাম, ও কী লিখেছে? ভাবতে অবশ্য আমার ভয়ই করে। অবিন যে কী লেখে আর না লেখে আমি বুঝে উঠতে পারি না। মানুষ পাগল হলে তার জ্ঞানগম্যি থাকে না। অবিনের বেলায় দেখি তার লজ্জা সংকোচের বালাই নেই, কলমের ডগায় যা বেরুলো অক্লেশে লিখে ফেলতে পারল। তার জ্বালাতন আমার আর সহ্য হচ্ছিল না, শক্ত করে কড়া কথায় একটা চিঠি দিয়েছিলাম শেষে। এ-বোধ হয় তার জবাব। জবাবটা যে নরম হবে এমন আমার মনে হল না।

আরও খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে আমি ঘরে গেলাম। আয়নার ঘরে।

আয়নার ঘরে সব হাট করে খুলে দেওয়া। জানলার গা দিয়ে রোদ আসছে। আলো বাতাসে ঘরের মরা ঝাপসা চেহারাটা এর মধ্যেই কেটে গেছে।

আয়নার ঘরের জিনিসপত্রর অভাব নেই। মার আসবাবপত্রের অনেকগুলোই তার ঘরে। আরও কত কী সে নিজের ঘরে জুটিয়ে রেখেছে। আজ না হয় সে নেই, কিন্তু যখন থাকে তখনও তার গোছগাছে গা দেখি না। বকাবকি করলে কমলাকে ডেকে বলে 'কমলাদি, আমার ঘরটা একটু গুছিয়ে দাও।' বড্ড কুঁড়ে, গা এলানো মেয়ে। এই মেয়ের বিয়ে হলে কী করে সংসার করবে

কে জানে! আয়নার বিয়ের ব্যাপারে সুহাস যে কী ছাই লিখল আমি বুঝতে পারলাম না।

আয়নার ঘরের বিছানাপত্রগুলো রোদে বের করে দেবার দরকার থাকলেও আমার কেমন আলস্য লাগছিল। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম দু-দণ্ড। একটা শুঁয়োপোকা এসেছে জানলায়। শুঁয়োপোকা দেখলেই আমার গা সির-সির করে। সরে এসে আয়নার খাটে বসলাম। বাইরে বাতাবী লেবুর গাছটা পাতায় পাতায় ভরে গেছে। অপরাজিতার লতা উঠেছে মানুষ সমান, বাতাসে লতা দুলছিল।

অবিনের চিঠিটা খুলাব কি খুলব না করে খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেললাম। এই এক রোগ হয়েছে আমার। অবিনের চিঠি শুনলেই বুকের মধ্যে কেমন দুরুদুরু করে। মানুষটাকে যখন চোখে দেখেছিলাম, কাছাকাছি ছিল—তখন তার মুখোমুখি হলেই ভয়ে মরেছি। এখন তো সে কলকাতায়, তার মুখের সামনে আমায় দাঁড়াতে হচ্ছে না, তবু এত ভয় কিসের।

ভয় যে কেন আমি তা বুঝতেও পারি। আমার সঙ্গে অবিনের তফাতটা মাত্র এই নয় যে, সে পুরুষ আর আমি মেয়ে। পুরুষ বলতে যদি আমার ভয়ের কিছু থাকত তবে আমি তো সেই মানুষটাকেই ভয় পেতে পারতাম—যে আমায় বিয়ের জোড়ের সঙ্গে গিঁট বেঁধে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে আমার সামাজিক বাধ্যবাধকতা ছিল। তবু তাকে আমি ভয় পাই নি। তখন আমার কতই বা বয়েস, ভয় পাওয়ারই কথা। কই ভয় তো হয় নি। অবিন আর আমার মধ্যে মেয়ে-পুরুষের তফাত বলে আমি ভয় পাই এটা সত্যি নয়। আমি ভয় পাই অন্য কারণে। অবিন আর আমি এক জাতের মানুষ নয়। সে হল ছন্নছাড়া, ঘরছাড়া, মনছাড়া। তার কোথাও বন্ধন নেই। সে হল ঝড়ের বাতাস, হুহু করে বয়ে গেল, ভাঙল চুরলো তছনছ করল, ধুলোবালি ওড়াল, তার পালা ফুরিয়ে গেল। আমি তো তেমন বাতাস নই। আমি হলাম স্বাভাবিক বাতাস, মানুষ যাতে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচে। ঝড়ের বাতাস দম আটকায়, তাতে বাঁচা যায় না। এ-সংসারে আমি যদি ছন্নছাড়া হতে চাই তবে কে বাঁচবে! আমি, না জ্যাঠামশাই, না সুহাস আয়নারা।

অবিনের চোখের দোষ না থাকলে সে বুঝতে পারত, আমার একটা পাকা-পাকি ঠাঁই আছে, শেকড় আছে। আমি সেখান থেকে নড়তে পারি না। জগতের কোন্‌টা অবিনের পছন্দ আর কোনটা তার চোখের বিষ তা নিয়ে জগৎ চলে না। ও আমায় বার বার বোঝাতে চায় আমি ডানা গুটিয়ে বসে আছি, একবার যদি পাখা ঝাপটে উঠতে পারি তবে নাকি মুক্তির সুখটুকু বুঝতে পারব। ঠিক যে এইরকম কথাই অবিন আমায় লিখেছে তা নয়, তবে তার কথাবার্তার ধরনটা এর কাছাকাছি। আমি ভাবি, মুক্তি তো একটা বাইরে আসার ব্যাপার নয়, তা যদি হত—তবে কত রকমের মেয়ে-পুরুষ কত ভাবেই না ঘর ছাড়ল, তারা কি মুক্ত হল!

অবিনকে আমি ভয় পাই সে বড় অবুঝ বলে। তার কাছে কাদায় গড়াগড়ি খাওয়াটাও সুখের। সে বুঝতে চায় না, আমার নিজের দুঃখটা আমি ভুলে থাকতে চাই। আমি যদি অবিন হতাম, তার স্বভাব পেতাম তবে অন্য কথা ছিল, আমি যে এ-বাড়ির মোহিনী।

আমি ভেবেছিলাম অবিনকে লিখব, সকালবেলায় যে-আলোটুকু ফুটে ওঠে সেই আলোতেই আমরা পুজোর ফুল তুলি। দুপুরবেলায় ফুল তোলার পাগলামী কেউ করে না। অন্তত আমি তো করব না।

কথাটা লিখতে গিয়েও লিখি নি। ভেবেছিলাম, ওটা যেন বড় বেশী স্পষ্ট হবে। অবিনকে অত স্পষ্ট করে বলার দরকার তো আমার নেই।

তবু বুঝতে পারছি, অবিন এখন আমার মধ্যে কেমন এক দ্বিধা এনে দিয়েছে। আমি এখন যা গড়ে তুলে দাঁড় করাচ্ছি, পরে আবার তাকে ভাঙছি। এই দ্বিধা আমার ছিল না। দ্বিধা জাগছে বলেই কি এত ভয় আমার? অবিন কি আমায় সেই দ্বিধায় ফেলছে বলে এত আতঙ্ক! কী জানি!!

অনেকটা সময় চুপচাপ বসে থাকার পর আমি অবিনের চিঠিটা আস্তে করে বের করলাম। আমার হাত কাঁপছিল, আঙুলের ডগা ভিজে-ভিজে লাগছিল। কী যে আছে চিঠিতে, আবার কত পাগলামী করেছে অবিন কে জানে! ওর অসাধ্য বোধ হয় কিছু নেই।

চিঠিটা ছোট নয়। গোটা-গোটা করে লেখা অক্ষর, অবিনের মতন খাড়া মাথায় দাঁড়ানো হরফ। আয়না ঠাট্টা করে বলত, দিদি অবিনদার হাতের লেখা যেন রেলের সিগন্যাল, লম্বা-লম্বা দাঁড়িয়ে আছে। কথাটা মনে পড়ায় আমার হাসি পেল। ভয়ের মধ্যেও হাসি।

অবিনের চিঠির প্রথমটুকু পড়েই আমার মাথা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। বুঝলাম, এ হল আমার রুক্ষ চিঠির নিষ্ঠুর জবাব।

চিঠিটা প্রথমবার পড়ে আমার মাথায় চার আনা কথাও ঢুকল না। পরে আস্তে-আস্তে পুরো চিঠিটাই পড়লাম।

চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। অবিন আমার কাছে নেই, কিন্তু মনে হচ্ছিল সে যেন আমার পিঠের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমায় দেখছে। নড়তে চড়তেও কত অস্বস্তি হচ্ছিল আমার। তারপর বেহুঁশ ভাবটুকু কেটে গেল, আমি উঠলাম। আয়নার ঘরদোর গোছাবার ইচ্ছে আর আমার নেই। থাক, পড়ে থাক সব।

বাকি বেলাটুকু আমার কেমন করে কাটল আমি জানি না, আমি যেন ভেতর-বাইরের দুই মোহিনী হয়ে পাশাপাশি হাঁটাচলা করলাম, বসলাম, দাঁড়ালাম, স্নান করলাম, তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকলাম। দুপুরে রোদ অনেক চড়া হবার পর গরম হচ্ছিল। জামগাছের পাতার ছায়া এসে আমার ঘরের জানলায় চুপটি করে বসেছিল। বসে-বসে আমার দশা দেখছিল।

বিছানায় শুয়ে আছি কতক্ষণ ধরে। চোখের পাতা কখন বুজে এসে আবার যেন খুলে গেল, বুকের তলায় দম আটকে যাবার মতন ব্যথা। আমার মার শেষের দিকে এইরকম রোগ ধরেছিল। আমারও হয়ত ধরল। বলা তো যায় না।

উঠে বসে একটু জল খেতেই ব্যথাটা কমে গেল।

আবার বিছানায় এসে শুয়ে থাকলাম।

অবিনের চিঠিটা এর মধ্যে বার তিন-চার আমার পড়া হয়ে গেছে। নতুন করে পড়তে ইচ্ছে হল না আর।

অবিন যদি আমার কাছে থাকত, আজ আমি তাকে স্পষ্ট করেই বলতাম, তুমি আমায় যেমন করে দেখেছ সেটা আমার রূপ নয়। আমি তো কোনোদিন বলি নি আমি সংসারের সব কিছু জয় করে নিয়েছি। আমার সে-অহংকার নেই। আমার যা আছে তার মূল্য আমার কাছে, তুমি তা বুঝবে না।

আমি তোমায় সত্যি করে বলছি অবিন, জন্মলগ্নে বসে যে-নক্ষত্রটি আমার ভাগ্যকে দৃষ্টি দিয়ে বিঁধেছে তার বড় বাঁকা দৃষ্টি। সে আমায় সহজ পথে চলতে দিল না। তার আগাগোড়াই নজর ছিল যা ঘটার তাকে ঘটতে না দেওয়া। আমার অদৃষ্টকে অশুভ গ্রহের হাতে ধরে না দিলে আমার এ দশা হবে কেন!

মেয়েরা সংসারে এলে নাকি মার চোখে জল নামে। আমি যখন এসেছিলাম আমার মার চোখে জল এসেছিল কিনা আমি জানি না। জ্ঞান হয়ে দেখেছি, আমাদের সংসারে আমার জন্মের জন্যে কারও কোনো দুঃখ ছিল না। অথচ একদিন আমার কপালেই এমন ঘটনা ঘটল যার জন্যে এ-বাড়িতে সবচেয়ে বড় দুঃখ নেমে এল। ওটা না ঘটলেও পারত, কিন্তু ঘটল। আমার ভাগ্যে সেই হল জন্মলগ্নের সত্যিকার বাঁকা দৃষ্টি। মেয়ে বলেই কথাটা বলছি। আমাদের যে দুটো লগ্ন, একটাতে সংসারে আসি, অন্যটায় সংসারকে পাই। আমার পাওয়ার ঘরে থাকল শূন্য।

আমি আমার অদৃষ্টকে স্বীকার করে নিয়েছি। যদি স্বীকার না করে নিতাম তবে আমায় ছটফট করে মরতে হত। তুমি বলবে, আমি কেন অদৃষ্টকে স্বীকার করলাম। যদি অদৃষ্টতেই আমার বিশ্বাস থাকত, তবে যে স্বামী-জীবটিকে আমি পেয়েছিলাম তার চরণামৃত কী দোষ করল! তা তুমি বলতে পার। কিন্তু সব ফাঁকি, সব আঘাত, সব অসম্মান যে সহ্য করা যায় না। যতটা যায় আমি করেছি। যখন শচিদার সঙ্গে আমার বিয়ে হল না তখন আমি কষ্ট পেয়েছিলাম কিনা সে কথা আমার মনে নেই। হয়ত পেয়েছিলাম। সব মেয়েরা যেমন পায়। কিন্তু আমি কুয়ায় ঝাঁপ দিতে যাই নি। কেন যাব? আমি তো অসহায় ছিলাম না। তাছাড়া যে-পুরুষমানুষ ভাবে, ভালবাসার চেয়ে মরার ভয়টা বেশী তার ভালবাসার জোর আমি বিশ্বাস করি না। শচিদা আমাকে কতটুকু ভালবেসেছিল, আর কতটা নিজেকে ভালবাসত তার হিসেব তো সে দেখল না। যাকগে, ওটা অনেক পুরনো কথা। তারপর আমার কপালে যে-

কন্দর্প পুরুষটি স্বামীর বেশে এল। তার কথা ভাবলেই আমার মনে হয়, ওই ক'টা মাস আমি নরকে গলা ডুবিয়ে বেঁচে ছিলাম। সেখান থেকে আমি নিজেকে উদ্ধার করেছি এই আমার সান্ত্বনা।

এরপর আর আমার করার কী ছিল? আমি তো নিজের হয়ে আর কিছু চাইতে পারি না। চাইতে গেলে আবার আমার কপালে কী জুটবে আমি জানতাম না। আমাদের সংসারে মেয়েদের চাওয়ার একটা মাপ আছে, তার বেশী চাওয়া যায় না।

'ভগবান মেয়েদের হাতে অনেক রকম অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। আমরা যদি সর্বনাশী হতে চাই সংসারের সুখ শান্তি রসাতলে পাঠাতে পারি। কিন্তু অস্ত্র আছে বলেই তার ধার পরখ করার দুর্বুদ্ধি মেয়েদের থাকলে ঘর সংসার বলে কিছু থাকত না। আমাদের যেমন অস্ত্র আছে, সেই রকম মায়া মমতা করুণা স্নেহও তো আছে। মেয়েদের গায়ের আঁচল শুধু তার আড়াল নয়, ওটা যে পুরুষ জাতের আশ্রয়। আমায় তুমি সর্বনাশী হতে বলো না। আমি এই সংসারে বাঁধা পড়ে গিয়েছি। একদিন এখানে হয়ত আমি শুধু একলাই থাকব, আমার চারপাশ ফাঁকা হয়ে যাবে। সেদিনও আমার মনে হবে, আমাদের তিন পুরুষের পুণ্যটুকু আমি বাঁচিয়ে রেখেছি।

পুরুষ মানুষের সঙ্গে মেয়েদের একটা বড় তফাত, তোমরা যদি দড়িতে বাঁধা পড়তে না চাও তোমাদের কেউ বাঁধতে পারে না। আমরা কিন্তু জন্ম থেকেই বাঁধা। আমাদের নাড়িতে এই বাঁধার জট আছে বলেই আমরা বাঁধন নিয়ে বসে থাকি। তোমরা থাকো না।

আমার জন্যে এই সংসারের ক্ষতি হবে এ আমি কোনোদিন চাই নি। আজও চাইব না। তুমি যে আমাদের সংসারের কোথায় ভাঙতে চাইছ তা আমি বুঝতে পারছি না, তবে ভয় পাচ্ছি।

তোমায় আমার বড় ভয়। তুমি বড় নিষ্ঠুর।

সকালে দাড়ি কামাবার সাজসরঞ্জাম নিয়ে বসেছি হঠাৎ গলার সাড়া পেয়ে দেখি আমার ঘরের দরজায় আয়না দাঁড়িয়ে। অবাক হয়ে আয়নাকে দেখছি, ও শুধু হাসতে-হাসতে বলল, "দেখলেন তো—।"

আমি বললাম, "সশরীরেই দেখছি। কিন্তু তুমি কেমন করে এলে?"

আয়না আমার ঘর দেখছিল। বলল, "আপনার হোটেল-বাড়ি দেখতে এলাম।"

"বেশ করেছ। কিন্তু—"

"দাদার সঙ্গে এসেছি। দাদা আমায় নামিয়ে দিয়ে কোথায় গেল খানিকটা পরে আসছে।"

দাড়ি কামাবার সরঞ্জামগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে আমি হেসে বললাম, "চমৎকার। বসো।"

"এই আপনার হোটেল-বাড়ি, অবিনদা?"

"কেন পছন্দ হচ্ছে না?"

"মোটেও নয়। নীচে দোকান, দোতলায় একরাজ্যি লোক, আর ওপরে আপনি। ঘরটার কী চেহারা!"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "এত আলো বাতাস, খোলামেলা, একা একটা ঘর নিয়ে রাজার মতন থাকি, এটা খারাপ হল!"

আয়না আমার বিছানায় গিয়ে বসল। খোলা জানলা দিয়ে রোদ আসছে। আকাশটাও চোখে পড়ে, খানিকটা নীলচে হয়ে আছে। আয়নার সাজগোজ একেবারেই ঘরোয়া, একরঙা শাড়ি, মাথায় এলোমেলো বিনুনি।

অনেকদিন ধরেই আয়নার শখ হয়েছিল আমার হোটেলবাড়ি দেখতে আসবে। আজ সুহাসের সঙ্গে চলে এসেছে।

"কোথায় গেল, সুহাস?"

"কী জানি! কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরবে। আজ তো রবিবার।"

"জ্যাঠামশাই কেমন আছেন?"

"কাল বিকেল থেকেই আর জ্বর নেই।"

কলকাতার আবহাওয়া সহ্য না হবার জন্যেই হোক, কিংবা একটানা দুর্ভাবনা, হাসপাতালে আসাযাওয়ার ধকলের জন্যে হোক তাঁর শরীর ভাল

যাচ্ছিল না। হঠাৎ জ্বর মতন হয়েছিল। দিন দুই জ্বরের পর কাল জ্বর ছেড়ে গিয়েছে।

"তুমি তাহলে একটু চা-টা খাও," বলে আমি বাইরে কাউকে ডাকাডাকি করতে যাচ্ছি আয়না বলল, দাদা আসুন না।

"দাদা এলে দাদার ব্যবস্থা হবে। তুমি বসো, আমি আসছি।"

দোতলায় গিয়ে চায়ের কথা বলে ফিরে এসে দেখি আয়না বিছানার ওপর আধখানা শরীর হেলিয়ে শুয়ে আছে। আমায় দেখে সোজা হয়ে বসল।

খানিকক্ষণ হাসিঠাট্টা মজার কথাবার্তার পর আয়না আসল কথায় এল। ওদের বাড়িতে আমার সঙ্গে আয়নার বেশি কথাবার্তা হয় না আজকাল, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সুহাসদের বাড়িতে প্রত্যহ যাওয়াও হয় না। মনে-মনে আয়না তার দুশ্চিন্তা নিয়ে ছিল। কৌতূহলও ছিল।

চা এসেছিল, খাবারও এনেছে রতন।

আয়না বলল, "অবিনদা, আমরা তো ফিরে যাচ্ছি—।" বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার চোখ বলছিল, আমরা তো চলে যাচ্ছি—, তারপর?

চায়ে চুমুক দিয়ে আমি ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরালাম। বাড়িতে আয়না আমায় আড়ালে তেমন করে পায় না যাতে তার মনের কথা বলতে পারে। কখন কে এসে পড়বে, কী শুনে ফেলবে সেই ভয়টা তার আছে। তবু আমি তাকে গোপনে আশ্বস্ত করে রেখেছি। আজ সে আমার কাছে স্পষ্ট করে সব কথা শুনতে চায়।

আমি হেসে বললাম, "যাও না।...আমরাও যাচ্ছি।"

"আপনিও যাবেন?"

"যাব না! বাঃ! প্যান্ডেল বাঁধতে হবে, মাথায় গামছা চড়িয়ে ভিয়েনে বসব, কলাপাতা কাটব..."

"যাঃ!" আয়না লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলল। তার চোখ নীচু হয়ে থাকল।

আমি বললাম, "তবে পুজোর আগে কিছু হচ্ছে না। হিন্দুদের পাঁজি ব্যাপারটা যাচ্ছে তাই। কাছাকাছি তোমার জন্যে কোনো ব্যবস্থা রাখেনি। সেই অগ্রহায়ণ-টগ্রহায়ণ।"

আয়নার মুখ যেন আরও নুয়ে গেল। অথচ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, ওর চোখেমুখে কেমন এক আবেগ এসেছে।

সামান্য চুপচাপ থেকে আয়না এবার একটু মুখ তুলে বলল, "আপনি দাদাকে বলেছেন?"

"তোমার দাদাকে না বললে হয়!"

"আপনি আমার নাম করে বললেন?"

"আমার যেমন করে বলার আমি বলেছি। তুমি আমার মক্কেল, তোমার উকিল কেমন করে মামলা লড়ছে তা শুনে তোমার দরকার কী!" বলে আমি লম্বা করে একমুখ ধোঁয়া টেনে আস্তে-আস্তে গিলে ফেললাম। আয়নাকে

দেখছিলাম হাসিমুখে। পরে বললাম, "তোমার দাদা হল লোয়ার কোর্ট, মানে ছোট আদালত। তার রায় খারিজ হয়ে যেতে পারে, তাই বড় আদালতে গিয়ে রায় নিয়ে নিলাম।"

"বড় আদালত?" আয়না আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল।

"জ্যাঠামশাই—!"

"জ্যাঠামশাই?" আয়না যেন, ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিল। তার চোখ কেমন দিশেহারা।

আমি বললাম, "জ্যাঠামশাইয়ের মত ছাড়া তো কিছু হত না, ভাই। তিনি তোমাদের মাথার ওপর রয়েছেন।"

শুকনো গলায় আয়না বলল, "ছি ছি, জ্যাঠামশাই কী ভাববেন!"

"তিনি কী ভাবলেন তা আমায় বললেন না। তবে ভাবলেন অনেক, তারপর মত দিলেন।"

আয়না আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, ভাবল আমি সবিস্তারে কিছু বলব। আমি কিছু বললাম না।

অপেক্ষা করে করে আয়না বলল, "অবিনদা?"

"বলো।"

"কিন্তু দিদি?"

"তোমার দিদির জন্যে ভাবতে হবে না। জ্যাঠামশাইয়ের যেখানে মত সেখানে দিদির না করার উপায় নেই। তোমার দিদি তা করবেনও না।"

"না, তবু দিদি—। দিদির অনেক অপছন্দ বাছবিচার আছে।"

"তোমার বেলায় থাকবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হও।"

"আমার কিন্তু ভয় করে।"

"কিসের ভয়! তুমি আমার ঘটক ধরেছ। যা ঘটে আমি শুধু তারই ঘটক।"

আয়না আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আচমকা বলল, "দিদি আপনাকে কিন্তু বেশ ভয় করে," বলে হেসে ফেলল।

আমি হেসে বললাম, "আমি যে ভয়ংকর।"

আয়না আর কিছু বলল না, বসে-বসে চা খেতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে আয়না হঠাৎ কেমন হেসে ফেলেই আবার চুপ করে গেল।

আমি বললাম, "হাসলে যে!"

আয়না লাজুক মুখ তুলে বলল, "একটা কথা মনে পড়ে গেল!"

"বলে ফেল!"

"বলব! যাঃ!"

"বলেই ফেল। কেউ তো শুনছে না।"

আয়না, বলব কি বলব-না করে দ্বিধার মধ্যে থাকল একটু, তারপর বলল,

"আমি যে তপুকে তুই বলি, অবিনদা—!"

আমি ডাক ছেড়ে হেসে উঠলাম। আমার সেই অট্টহাসির মধ্যে আয়নাও কখন ছেলেমানুষের মতন গলা মিশিয়ে হাসতে লাগল।

হাসি থামলে আমি বললাম, "এবারে ফিরে গিয়ে খাতির করে আপনি বলো।"

আয়না মজার গলায় বলল, "বয়ে গেছে আমার। তেলঅলাকে আবার আপনি...!"

আরও খানিকটা সময় গল্পগুজব, হাসি ঠাট্টা করার পর সুহাস এল। এসে বলল, "অবিন, তোমার সঙ্গে জরুরী দরকার।"

"বসো।"

"এখন আর বসব না। তুমি হাসপাতালে যাচ্ছ আজ?"

"যেতে পারি।"

"হাসপাতালেই এস। সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি গিয়ে কথা হবে। জ্যাঠা-মশাই থাকবেন।"

"তা না হয় হবে। কিন্তু তুমি ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এসেছ যেন!"

"আমার তাড়া আছে। আয়নাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আরেক জায়গায় যাব। তারপর বাড়ি ফিরব। বেলা হয়ে যাচ্ছে।"

সুহাস আর বসল না; আয়নাকে নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে আয়না আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

দুপুরে আজ গরম খানিকটা কম ছিল। কাগজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছি, ঘুম ভাঙলে দেখি বিকেল হয়-হয়। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে চোখ-মুখ ধুয়ে হাসপাতালে যাবার জন্যে তৈরী হলাম।

হাসপাতালে পৌঁছতে-পৌঁছতে পাঁচটা বেজে গেল। সুহাস ছিল। জ্যাঠা-মশাই কয়েকদিন আসতে পারছেন না। আজও আসেন নি।

শচিপতিকে দেখলে ভালমন্দর তারতম্য বোঝা যায় না। কথাবার্তাও বলতে চান না আজকাল। আমরা কথা বলি, উনি শুধু তাকিয়ে থাকেন। কখনও-কখনও মনে হয়, শচিপতি চোখের পাতা খুলেই যেন ঘুমিয়ে আছেন—এত নিঃসাড় থাকেন। বেশীক্ষণ বসে থাকা যায় না। অস্বস্তি হয়।

এই ক'দিনের মধ্যে শচিপতিকে আজ একটু অস্থির মনে হল। শরীরের অস্বস্তির জন্যে হয়ত।

আজ খানিকটা আগে আগেই আমরা উঠে পড়লাম।

বাইরে এসে সুহাস বলল, "অবিন, জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আমার ক'দিন ধরেই কথা হচ্ছে। তোমায় সেদিন বলছিলাম—।"

"কী?"

"শচিদার যা অবস্থা তাতে মেজর অপারেশন খুব রিস্কি। ইন্দু বলছিলেন, ডাক্তাররা এতদিন অবজারভেশনে রাখার পরও কোনো ডিসিসান নিতে ভয়

পাচ্ছেন। আমি দুপুরে দত্তসাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। যেতে বলেছিলেন। তিনি বলছেন, অপারেশানটা ইউজলেস। শচিদা স্ট্যান্ড করতে পারবে বলে মনে হয় না। যদি বা পারেও পোস্ট অপারেটিভ স্টেজে কী হয়, কিছুই বলা যায় না। অকারণ মানুষটাকে ছেঁড়াছিঁড়ি করে কী লাভ!"

আমি চুপ করে রাস্তা হাঁটছিলাম। শচিপতি যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন আমার আশা ছিল, মানুষটি নিশ্চয় সুস্থ হতে পারবেন। অন্তত মোটামুটি। সে-আশা আর আমার নেই। বরং যত দিন যাচ্ছে, হাসপাতালে পড়ে থাকতে-থাকতে শচিপতি আরও অসুস্থই হয়ে পড়ছেন।

সুহাস একটা ফাঁকা ট্যাক্সি পেয়ে ডাকল।

ট্যাক্সিতে উঠে সিগারেট ধরাল সুহাস; আমিও সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

"ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে দাঁড়াচ্ছে—" সুহাস বলল, বিষণ্ণ গলায়; "মোটামুটি কেন, মিনিমাম চান্সও যদি না থাকে তবে মানুষটাকে ফরনাথিং এই ট্রাবল দিয়ে কী লাভ। যে ক'দিন বাঁচে, আয়ুর জোর যতটুকু আছে, এমনই বেঁচে থাক। কিছু করার যখন নেই—তখন। কী, কথা বলছ না যে!"

"কী বলব! আমিও তোমার মতন—"

"বাঃ, তুমিই শচিদাকে কলকাতায় টেনে এনেছিলে। আমি বারণ করেছিলাম।"

"তা হয়ত ঠিক। কিন্তু সুহাস, আমি তখন ভাবতাম, ভদ্রলোকের ব্যাধিটা কী আমরা তো জানি না। কী হয়েছে না জেনেশুনেই একটা মানুষকে মরতে দেওয়া উচিত নয়। এখন দেখছি, সবই অন্যরকম হয়ে গেল।"

"একেবারে অন্যরকম। কলকাতায় আনাটাই খারাপ হল। এখানে এসে পর্যন্ত মন ভেঙে গেল, এত পঞ্চাশ রকম ডাক্তারীতে নার্ভ গেল নষ্ট হয়ে, হাসপাতাল-টাসপাতাল আরও ডিপ্রেসড্ করে দিল। ওখানে থাকলে এত তাড়াতাড়ি হয়ত এইভাবে ভেঙে পড়ত না। এনিওয়ে, ভালোর জন্যেই আনা হয়েছিল বুঝলাম, কিন্তু ভাল হল না। কপাল।"

"জ্যাঠামশাই কী বলছেন?"

"তাঁরও ওই মত। তুমি তো যাচ্ছ বাড়িতে, জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারবে।"

ট্যাক্সিটা মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সিগারেটের টুকরোটা জানলা দিয়ে ফেলে দিলাম। "তুমি শচিবাবুকে কিছু বলেছ?"

"না, না। বলি নি। শুধু বলেছি, তোমার অপারেশনটা বোধ হয় এখন হচ্ছে না।"

"ওখানে ফিরে গেলে তো বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে।"

"এর আর আলাদা চিকিৎসা কী! যেভাবে চলছে, চলবে। যে ক'দিন বেঁচে আছে শচিদা। তেমন কিছু হলে ডিমরির হাসপাতাল তো আছেই। মানুষটাকে মনের যতটুকু শান্তি দেওয়া যায় তাই দেওয়াই এখন ভাল।"

ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করেছিল। মস্ত বড় একটা তেলের গাড়ি আমাদের সামনেটা আড়াল করে চলেছে, রাস্তার খানিকটা জঞ্জাল বাতাসের দমকায় ঘূর্ণির মতন উড়ে গেল, অন্ধকার হয়ে আসছে, বাতি জ্বলে উঠেছিল রাস্তায়। সুহাস জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকল।

আমারও এখন মনে হয়, শচিপতি তাঁর নিজের জায়গাতেই তবু ভাল ছিলেন। কিছুই যখন হল না তখন অকারণ আর কলকাতা কেন।

হোটেলে নিজের ঘরে ফিরে আসতে-আসতে আটটা বাজল। আজ গরমটা কম, স্নানের পর আরাম লাগছিল। দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে কি না বোঝা যায় না, থেমে-থেমে বাতাস দিচ্ছিল। আকাশে আশে-পাশে কোথাও মেঘ নেই, একদিকে এক ফালি চাঁদ উঠে আছে, অন্যদিকে তারা চিকচিক করছে। ছাদে সামান্য দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘরে এসে বসলাম।

শচিপতিকে নিয়ে আমার আর কোনো চিন্তা হচ্ছিল না। জ্যাঠামশাই বোধ হয় ঠিকই বলেছেন, নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারলে শচিপতি মনের দিক থেকে একটা তৃপ্তি পাবেন। সংসারের সকলকেই যেখানে হারাতে হয়েছে সেখানে হয়ত তাঁর কোনো মায়া জড়িয়ে আছে। সেই মায়াই তাঁর পক্ষে এখন শান্তির।

ইজিচেয়ারে বসে বসে খানিকটা সময় কাটল, তারপর হাত পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। বাতিটাই বা অকারণে কেন জ্বলে? বাতি নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

নিজেকে নিয়ে ভাববার অভ্যেসটা আমি অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। আজ আবার একবার ভাবতে হল।

নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসলে আমার মনে হয়, সুহাসরা আমায় যতটা বিচিত্র করে দেখে আমি, ততটা বিচিত্র নয়। জগতটাকে ওরা যতরকমে সম্ভব জটিল করে দেখেছে, আমি দেখতে চেয়েছি সরল করে, ফলে লাভ হয়েছে এই—আমার সহজ কথাটা ওরা সহজ করে ভাবতে পারে না। ওদের অনেক দাসত্ব আছে, আমার নেই।

মোহিনী আমায় শেষ যে-চিঠিটি দিয়েছেন, গত কাল সেটি আমার হাতে এসেছে। তিনি আমায় বারবার করে বোঝাতে চেয়েছেন, তাঁর মনের শান্তিটুকু আমি যে কেন নষ্ট করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি এটা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। মেয়েদের কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি, কোথায় তাদের মান-মর্যাদা সম্মান—এ-নিয়ে তাঁর পুরনো কথাগুলো নতুন করে আবার আমায় মনে করিয়ে দিয়েছেন। লিখেছেন, মেয়েরা সর্বনাশী হতে চাইলে সংসার রসাতলে যায়, তিনি তো সংসার ভাঙতে আসেন নি।

তিনি যে সংসার বেঁধে রাখতেও আসেন নি, এটা তাঁকে বোঝানো গেল

না। কে তাঁকে বলবে যে তাঁর জন্যে আয়নার এতকাল নিজের কিছু হল না। তিনি হয়ত এটাও বুঝতে পারেন না, সুহাস তার দিদির সান্ত্বনার জন্যে নিজের সুখ বা ইচ্ছেটুকু নষ্ট করতে রাজী হয়েছে। মোহিনী যাকে বেঁধে রাখা বলেন সেটা হল বাধা। তিনি না চাইলেও ভাগ্যের দোষে আজ তিনি তাঁদের সংসারে এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি ভেবে দেখেছি, মানুষ যখন মিথ্যের সংগে জড়িয়ে পড়ে তখন সত্যটা তার কাছে স্পর্ধার মতন মনে হয়। মোহিনী ভাবছেন, আমি যা বলতে চাই সেটা আমার স্পর্ধা।

মোহিনীকে আমি রুক্ষ করেও এসব কথা লিখতে চাই না। সেটা অবিনের কলমে বাধবে।

তবু, আমি তাঁকে বলতে পারি : আপনি যে-সংসারের কথা অত করে লিখেছেন একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখুন। চোখ থাকলে দেখতে পাবেন, আপনি সত্যটাকে অস্বীকার করছেন। আপনি বুঝতে পারছেন না, মানুষের জীবনটা শুধু তার শৈশব নিয়ে নয়, নিতান্ত তার অপরিণতি নিয়েও নয়। সাধারণ কথাটা আবার আপনাকে বলি : গাছ যখন নিতান্তই চারা থাকে— তখন সামান্য মাটিতে পাশাপাশি অনেকের জায়গা হতে পারে। গাছের যেটা স্বাভাবিক বাড়—সেই বাড় যখন তার মধ্যে দেখা দেয় তখন তাকে মাটিনাড়া না করলে তার শেকড় ছড়াতে পারে না, মাথা ওঠে না খাড়া হয়ে, ডালপালা ঠিক মতন ছড়ায় না। সেটা গাছের বিকৃতি। মানুষের বেলায়ও এটা খাঁটি কথা। একটা বয়স পর্যন্ত সে এজমালি, তার নিজস্ব বলে কিছু নেই, পাঁচজনের ভিড়ে মিশে থাকতে তার বাধে না। তারপর তার নিজের বোধ, নিজের জীবন। এটা হল তার সত্তা, নিজের অস্তিত্ব। তার পরিণত ব্যক্তিত্বের সেটাই হল লক্ষণ। ছেলেবেলায় সুহাস যা ছিল, আয়না যেমন ছিল, আজও কি সেই রকমটি থাকবে ? এটা কেউ আশা করে না। তাদের যে নিজের নিজের সুখ দুঃখ, ইচ্ছে অনিচ্ছে, ভালমন্দ লাগার জগৎ হয়েছে। তারা নিজের মতন আশা করতে পারে, নিজের মতন করে বেঁচে থাকতে চায়। আপনি যদি ভেবে দেখেন, দেখতে পাবেন, আপনার জগতের সংগে ওদের জগতের মিলটা বেশী নয়। বরং বিরোধ। তবু আজ যখন তারা আপনার জন্যে মুখ বুজে থাকে তখন তাদের বাহবা দিলেও ওদের দুঃখটা মিথ্যে হয়ে যায় না। আমি সুহাসের সংগে কথা বলে বুঝেছি, তার নিজের ইচ্ছে যাই থাক আপনার জন্যে সে চুপ করে থাকাই ভাল বলে মনে করেছে। সুহাসের পক্ষে একটা স্বার্থত্যাগ। আমি তাকে বলেছি, বেশ তো স্বীকার করছি তুমি এই ত্যাগটা করলে। কিন্তু এই ত্যাগের দুঃখ যে তোমার মনে কোথাও কাঁটা হয়ে ফুটছে না এটা তো ভাই সত্যি কথা নয়। চিরটাকাল তুমি ত্যাগের গৌরবে সুখী থাকতে পারবে তাও আমার মনে হয় না। তোমার দিদির ভবিষ্যতের নিঃসঙ্গ অবস্থাটির কথা ভেবে তুমি না হয় আজ স্বর্থত্যাগ করলে। কিন্তু যে মেয়েটিকে তুমি

ভালবেসেছ তার উপায় কী? তাকে ভাসিয়ে দিয়ে তোমার কোন্ পৌরুষ বাঁচবে? তুমি দেখছ, তোমার ত্যাগটা গুণ। ত্যাগ যদি গুণ হয় মানুষের, তবে ভালবাসাটা কি গুণ নয়? একটাকে অত বেশী করে মূল্য ধরে দেওয়া কেন?

হঠাৎ দেখি মোহিনী আমার মনের পটে হাজির হয়েছেন। ক্ষুব্ধ; বিরক্ত। মোহিনী আমায় অভিযোগের দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বললেন, কে বলেছে সুহাসকে ত্যাগ করতে? আমি বলি নি। আমি বরং চেয়েছি—সুহাস বুলাকে বিয়ে-থা করুক; আমি খুশী হব।

আমি বললাম, সুহাস যে সেটা ভাবছে না। সে ভাবছে—সংসারে সবাই যদি নিজের সুখশান্তি খুঁজে নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় তাহলে আপনি কী করবেন?

আমার কি কিছুই করার নেই?

কী আছে! জ্যাঠামশাই আর দু-এক বছর, আয়না যাবে তার নিজের সংসারে। সুহাসও যদি ওখানকার পাট চুকিয়ে দিয়ে কলকাতায় তার সংসার গুছিয়ে বসে আপনি কী নিয়ে থাকবেন? তিন পুরুষের বাড়ি আগলে, যক্ষের মতন বসে থাকাটা আপনার কতকাল সহ্য হবে?

মোহিনী কথা বলছিলেন না। তাঁর চোখ বলছিল, তিনি যেন সেই দূরের দিনটি দেখতে পান না এমন নয়।

আমি বললাম, সুহাসের কথা থাক, আপনার কথা বলুন।

উনি বললেন, আমার কোনো কথা নেই।

আমি বললাম, তাহলে আমার কথাটা আপনাকে বলি, শুনুন।

মাথা নেড়ে মোহিনী না না করছিলেন।

আমি হেসে বললাম, আপনার এই নিষেধটুকু আমি আগাগোড়াই অমান্য করেছি। আজও মান্য করলাম না।

মোহিনী বিরক্ত হয়ে বললেন, আমার যা বলার আমি বলেছি। আর কেন?

আপনার কথা আমি শুনেছি। আমার আরও একটু বলার আছে।

মোহিনী আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

আমি বললাম, মেয়ে-পুরুষের যে তফাতটা জীবজগতে আগেই ঘটে গেছে তাকে আমি বিধাতার ষড়যন্ত্র বলে মনে করি না। ওটা নিতান্ত চুম্বকের আকর্ষণ নয়। কিন্তু আপনি যখন ভাবেন ওই আকর্ষণটা সর্বনেশে তখন আমি বলি ওটাকে ছোট চোখে দেখলে সর্বনেশে, নয়ত তার সর্বনাশ কোথায়।

মোহিনী আপত্তি করে বললেন, মেয়েদের কাছে এর চেয়ে বেশী সর্বনাশ আর কী আছে!

আমি বললাম, ওটা আপনার ভয়। আপনার সর্বনাশ করব এমন কুবুদ্ধি নিয়ে আমি আসি নি। আমি আপনার দরজায় ঝোলানো আদ্যিকালের তালাটাকে ভাঙতে চাই। ওই তালাটা যে মরচে ধরা এ কি আপনার নজরে আসে না? যার সাহস নেই সে ওই তালা দেখে থেমে থাকুক। আপনি কেন?

মোহিনী নীরবে আমায় লক্ষ্য করলেন। যেন বোঝাতে চাইলেন, আমি

নিতান্তই বোধহীন।

আপনাকে সত্যি করে একটা কথা বলি। আমি হলাম সোজা পথের মানুষ, বেঁকা রাস্তায় চলতে পারি না। আপনাকে নিয়ে আমার মনে দ্বিধা নেই। আপনি নিতান্ত মোহিনী হলে আমার মন আমায় বলে দিত ওটা জোয়ারের টান, জোয়ার কেটে গেলে ভাটা আসবে। কিন্তু দেবী, আমায় মুখ ফুটে আবার আপনাকে বলতে হচ্ছে, আপনি যে মনোমোহিনী, জোয়ার ভাটার বাইরেও আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাকে তুচ্ছ করতে পারি না।

মোহিনী আমার মুখের হাসি লক্ষ্য করতে করতে বললেন, কার কী আছে আমার জেনে কী লাভ? আমার কিছু নেই।

আমি বললাম, ওটা আপনার মনের কথা নয়। যার থাকে না সে নির্ভয় হয়। আপনার আছে বলেই এত ভয়।

মোহিনী যেন কী বলবেন বুঝতে না পেরে কাতর চোখে আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, আমি তো কিছু ভাঙতে চাই না। যেখানে আছি তার বাইরে যেতে চাই না।

আমি বললাম, ধরে থাকাটা নিয়ম নয়। অন্তত বড় নিয়মে যাতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চলে তাতে ভাঙন আছে তা কি আপনার চোখে পড়ে না? এই জগতটা যদি কোনো কালে সূর্যের কোল থেকে ছিটকে না আসত তার জন্মের ইতিহাস থাকত না। মেয়েরা যদি না ভাঙে তবে সৃষ্টি কোথায়?

মোহিনী বললেন, এ-হল অনাসৃষ্টি। আমার ধ্যানধারণার বাইরে।

আমি বললাম, আপনার ধ্যান হল আত্মনিগ্রহের। ওটা ভীরুর ধ্যান। আপনি তো অতটা ভীরু নন।

মোহিনী বললেন, পুরুষ মানুষের নেশা আমার অদেখা নয়। সে বড় নোংরা, কুচ্ছিত। তবু সে তার খুশীর নেশা করতে পারে, মেয়েদের ওটা করতে নেই।

পুরুষ মানুষের পক্ষে যে-নেশাটা খারাপ আপনি শুধু সেইটেই দেখেছেন। তার অন্য নেশাও আছে।

মোহিনী হয়ত জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, সেই নেশাটা কী? তারপর যেন বুঝতে পারলেন, ওটা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমি কোন্ নেশার কথা বলছি।

নীরবে মোহিনী দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর যেন আর সাহস হচ্ছিল না, নতুন করে কিছু বলেন।

তারপর দেখি মোহিনী চলে গেছেন।

মোহিনী

শেষ রাতেই ঘুম ভেঙে গেল। রাত শেষ হয়ে আসার কোনো লক্ষণ তখনও নেই, চারপাশ নিঃসাড়, আমার বিছানার পায়ের দিকে জানলায় সারা রাত পূর্ণিমার আলো ছিল, সেই আলোও যেন চোখে পড়ে। গাছপাতা কাঁপছে না, ঘুম ভেঙে কোনো পাখিও ডেকে উঠল না একবারও, তবু আমার মনে হল, ভোর হয়ে আসার আর দেরী নেই। শেষ রাতে কাশীর গাড়িটা কলকাতার দিকে চলে যায়। সেই গাড়িটা যখন আসছে, আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। শুয়ে-শুয়ে শুনেছি, মোটা ভোঁ বাজিয়ে, সাঁকো দিয়ে গুড়গুড় শব্দ তুলে গাড়িটা এসে চলে গেছে। কাশীর গাড়ি চলে যাবার আগে আগেই কলকাতার গাড়িটা এখানে পেঁাছে যায়। আমার মনে হল, জ্যাঠামশাইরা এতক্ষণে পেঁাছে গেছেন; স্টেশনে বসে আছেন; বসে-বসে সকাল হবার অপেক্ষা করছেন। কার্তিক বাড়িতে নেই; জ্যাঠামশাইরা আসছেন বলে কাল রাত থেকেই স্টেশনে গিয়ে বসে আছে; সে না থাকলে বড়বাবুর গাড়ি থেকে মোটঘাট নিয়ে নামতে নাকি অসুবিধে হবে। কার্তিক ওই রকমই।

আর খানিকটা পরেও ঘুম ভাঙলে ক্ষতি ছিল না, এখন যে ভাঙল তাতেও আমার অশান্তি হল না। সারাটা রাতই কাল ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুম হয়েছে এই একটু করে ঘুমোই তো আবার জেগে যাই। জেগে গিয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছি তো আছি, আকাশ পাতাল ভাবছি, আর বার বার মনে হচ্ছে—জ্যাঠামশাইরা এতক্ষণ কোথায়, কতটা কাছাকাছি এসে পেঁাছলেন।

জ্যাঠামশাইরা ফিরে আসছেন এই চিন্তাতেই আমার সারাটা দিন কেটে গিয়েছে। ছেলেমানুষের মতন ছটফট করে মরেছি। সকাল থেকেই কার্তিক আর কমলাকে কত হাঁক-ডাক : এটা করো ওটা করো; কার্তিক তুমি একবার বাজারে যাবে, জ্যাঠামশাইয়ের মাজন নষ্ট হয়ে গিয়েছে, মাজন আনবে; বড়-বাবুর বিস্কুট, মাথার তেল আনবে। কমলাকে নিলাম ঘরদোরের কাজে। গিরির মা দুপুরে বাড়ি গেল না বারান্দাটারান্দা ধোয়া মোছা করল। আমি বসলাম জ্যাঠামশাইয়ের ঘর নিয়ে। ধোয়া-মোছা সেরে গেলাম ঠাকুরঘরে। ঠাকুরঘরে আমার আসা-যাওয়া কম। নানা রকম জঞ্জাল জমেছিল। জ্যাঠামশাই এসে এই অযত্ন দেখলে অখুশী হবেন। নিজেই সোডা ছড়িয়ে ঘর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করলাম, ঠাকুর-দেবতার পট মুছলাম যত্ন করে। জানলার কাচগুলো ধবধব করতে লাগল। কমলা ততক্ষণে অন্য কাজগুলো সেরে ফেলেছে। আয়নার

ঘরে বিছানা মাদুর পালটে দিচ্ছি, বুলা এল।

আমার শাড়ির আধখানা ভেজা, মাথার চুল ধুলোর রুক্ষ, হাতে পায়ে ময়লা। বুলা অবাক হবার আগেই আমি ওকে জ্যাঠামশাইদের ফিরে আসার খবরটা দিলুম।

বুলা হেসে বলল, "তোমায় দেখেই সেটা বুঝেছি, মানুদি।"

আমিও হেসে বললাম, "কেউ ছিল না বলে আমারও আর গা ছিল না, বুঝলি।"

"আজ সব উসুল করে নিচ্ছ বুঝি?" বুলা হাসল।

"হ্যাঁ। নে, একটু হাত দে।"

বুলা আমার কাজের ফাই-ফরমাস খাটতে লাগল। তাদের বাড়িতে আজ সকালে কাকিমা পূর্ণিমায় কোন্ পুজো করেছেন, তার প্রসাদ দিতে এসেছিল। বেলাও হয়ে যাচ্ছিল দেখতে-দেখতে। কাজের ফাঁকে দু-জনে কথা বলছিলাম। কমলা একবার চা খাইয়ে গেল।

কথায়-কথায় বুলাকে বললাম, "শচিদাও ফিরে আসছে, জানিস?"

"শচিদাও?"

"তাই তো লিখেছেন জ্যাঠামশাই। সুহাসও লিখেছে।"

বুলা অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। সে বুঝতে পারছিল না, শচিদা কেমন করে ফিরে আসছে।

আমি বললাম, "শচিদাকে আর কলকাতায় হাসপাতালে রাখতে পারা গেল না বোধ হয়।"

"অসুখটা কি কমের দিকে?"

"কই না, তেমন কিছু তো লেখে নি।"

"তবে?"

"জ্যাঠামশাই না ফিরলে ঠিক বুঝতে পারছি না। চিঠি পড়ে মনে হল, শচিদা ওখানে থাকতে চাইছিল না।, থেকেও কোনো লাভ হত না।"

বুলা চুপ করে থাকল। খানিকক্ষণ পরে বলল, "শচিদা কি তোমাদের এখানে থাকবে?"

"জানি না। কিছু তো লেখে নি। তবে আমিও ভাবছিলাম কথাটা। অসুখের শরীর, নিজের বাড়িতে থাকবেই বা কী করে! এখানেও থাকতে পারে। জ্যাঠামশাই হয়ত এখানেই নিয়ে আসবেন। একটা ঘর ভাবছি রেখে দেব।"

বুলা শুনল, কথা বলল না।

বেলা বেড়ে গিয়ে রোদ যখন খর হয়ে উঠেছে বুলা বলল, "মানুদি, আমি বরং এখন যাই; বলো তো বিকেলে আসতে পারি।"

"না বাপু, আবার তোকে একটা পথ ঠেঙিয়ে আসতে হবে না। বেলা হয়ে যাচ্ছে, তুই আয়। ছাতা এনেছিস?"

"না।"

"ওমা, ভাদ্দরের এই রোদ, আলগা মাথায় বেরিয়েছিস। একটা ছাতা নিয়ে যা কমলার কাছ থেকে।"

বুলা যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে হঠাৎ বলল, "মানুদি, শচিদার বাড়িতে আমি একটা খবর নেব, কী বলো?"

"তা বরং নিস।"

বুলা চলে গেল। বেলাও দেখি বেশ বাড়ছে। ভাদ্র মাসের রোদ চড়ে উঠে তামার মতন রঙ ধরল। বুলা চলে যাবার পরও কিছু কাজকর্ম থাকল। সব সেরে স্নান করতে যেতে দুপুর হয়ে গেল আমার।

শেষ দুপুরে বিছানায় শুয়ে দু-দণ্ড গড়িয়ে নিচ্ছি, আলস্য লাগছিল বড়। খেয়াল হল আমার চোখের পাতা থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে। কোন্‌টা সুলক্ষণ কোন্‌টা কুলক্ষণ আমি জানি না, চোখের এই পাতা কাঁপাটা আমার ভাল লাগল না। আজ জ্যাঠামশাইদের যাত্রা করার কথা, এত চোখের পাতা না কাঁপলেও পারত। কী জানি, সারা সকাল যত ধুলো ময়লা ঘেঁটেছি চোখে কিছু উড়ে এসে পড়েছে কিনা!

বিকেলের গোড়ায় কখন একটু তন্দ্রা এসেছিল, তন্দ্রার মধ্যে দেখি, শচিদা এসেছে। চেহারা দেখে আঁতকে উঠি। তন্দ্রাটা কেটে গেল। চুপ করে শুয়ে। গুমট গরমটা নেই আজ, তবু কপালে ঘাম জমেছে। আয়নার কুকুর সারা বাড়ি ছুটে বেড়াচ্ছে। কী তার ডাক! কেমন করে যেন সেও বুঝতে পেরেছে, তার মনিব ফিরে আসছে।

বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় বুঝতে পারলাম, আমার মাথাটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছে, গায়েগতরে খানিকটা ব্যথা। সকালে অত খাটাখাটুনি, জল ঘাঁটা—শরীর একটু-আধটু খারাপ হতেই পারে। তা হোক। জ্যাঠামশাই ফিরে আসছেন এই আনন্দে আমি মরছি, একটু-আধটু মাথা যদি ধরে—ধরুক।

জ্যাঠামশাইরা আজ দেড় মাসের বেশী বাড়ি ছাড়া। আমি তো মনেই করতে পারি না আমাদের এই বাড়ি কখনও এভাবে ফাঁকা থেকেছে। জন্মকাল থেকে আমি এ-বাড়িতে, এমন ফাঁকা কখনও দেখি নি। মার যখন খুব অসুখ-বিসুখ, হাওয়া বদলাবার দরকার হল মার, তখন বাবা মাকে নিয়ে বাইরে গিয়েছিল আমরা কিন্তু এখানেই ছিলাম। পুরোপুরি ফাঁকা এ-বাড়ি কখনও হয় নি। জ্যাঠামশাই আর আয়না কলকাতা যাবার পর দেখলাম ফাঁকা কাকে বলে, সমস্ত বাড়িটা চুপ, কোনো রকম সাড়া নেই, জ্যাঠামশাইয়ের কাশির শব্দ, আয়নার হঠাৎ হঠাৎ গুনগুন করে গান গেয়ে ওঠা—কিছু আর কানে পড়ে না। বারান্দাটা সারাদিন ফাঁকা পড়ে থাকে, ঘরের দরজা জানলা খোলা রয়েছে, অথচ কোথাও কোনো সাড়া নেই মানুষের। এক একদিন অসহ্য লেগেছে, মনে হয়েছে—এ-বাড়িতে আমি যেন চিরকালের মতন বন্দী হয়ে গিয়েছি। কখনও মনে হত, হারিয়ে গিয়েছি কোথাও। কোনো-কোনো দিন ভয়ও পেয়েছি। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় কী কাজে যেন বসার ঘরে গিয়েছিলাম হঠাৎ কমলাকে ডাকলাম,

আমার গলার স্বর কমলার কাছে পৌঁছলো না, অথচ ফাঁকা নিস্তব্ধ বাড়িতে নিজের গলার স্বর এমন অদ্ভুতভাবে কেঁপে-কেঁপে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে গেল যে আমি কেমন চমকে উঠলাম। মনে হল, আমি যে কত একা এটা বোঝাবার জন্যে কেউ আমার গলা নকল করে ডাকল। মনে চিন্তা এলেই আমার নানা-রকম ভয় করে। অনেক দিন সন্ধ্যেরাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেও আমার গা ছমছম করে উঠেছে।

জ্যাঠামশাই আর আয়না ছিল না—আমি একলা এই পুরীতে ছিলাম, এতেই আমি বুঝতে পারছি, এমন করে থাকা যায় না। এ বড় কষ্টের। আমার সমস্ত বুক ফাঁকা হয়ে যায়, মনে হয়, কোথাও একটু বাতাস্ নেই, কী যে যন্ত্রণা হয় তখন! মাঝে-মাঝে ভাবি, এ-বাড়ির যেখানে যা আছে আজ, চিরদিন তো থাকবে না, তখন আমার কী হবে।

আমার কী হবে আমি জানি না। ভাবতে গেলে কূল পাই না, হাজার রকমের দুশ্চিন্তা আর দুঃখ আসে। মনকে বোঝাই, যা হবে পরে হবে, যখন হবে তখন দেখব, এখন কেন কেঁদে মরি। মনকে প্রবোধ দেওয়া ছাড়া আর আমার করার কী আছে!

বিছানায় শুয়ে থাকতে-থাকতে মনে হল, এবার যেন ভোর হয়ে আসার সময় হয়েছে। জামগাছের আড়ালে কোথাও ঘুমভাঙা পাখির গলায় সাড়া উঠল। শেষ রাতের ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। পায়ের দিকের জানলায় জ্যোৎস্না দেখি বেশ ফিকে হয়ে এসেছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ার ইচ্ছে হল। উঠে পড়ে কী করব যে তা আর মাথায় এল না। কমলাকে ডাকব। কী হবে ডেকে? কাল সারাদিন বেচারীর খাটুনি গিয়েছে। ও আবার একটু ঘুমকাতুরে। জ্যাঠামশাইরা যখন থেকে নেই তখন থেকে ও পাশের ঘরে শুচ্ছে। বেচারাকে এখন থেকে ডাকাডাকি করে লাভ নেই। অকারণ জেগে উঠে কীবা করবে। জ্যাঠামশাইদের বাড়ি আসতে-আসতে সকাল হয়ে যাবে। হয়ত তখন সূর্য উঠে যাবে।

শচিদার কথা আবার আমার মনে এল। শচিদা এ-বাড়িতে এসে উঠবে, না তার বাড়িতেই যাবে—আমি জানি না। জ্যাঠামশাই হয়ত চাইবে, শচিদা এখানে এসে উঠুক। শচিদা কি তাতে রাজী হবে? জানি না।

এখন আমার মনে হয় শচিদাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার এত আয়োজন করে লাভ হয় নি। মিছিমিছি মানুষটাকে ওরা টানাটানি করল। এর জন্যে অবিনই বেশী দায়ী।

অবিনের যতটা আমি দেখলাম তাতে বুঝতে পারছি—সংসারে ওর মতন করে সবাই ভাবুক এটাই ও চায়। শচিদাকে কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্যে সে পাগল হয়ে গিয়েছিল বলে আমি যে একথা বলছি তা নয়। সে চেয়েছিল, মানুষটা বাঁচুক। আমি ওর দোষ ধরছি না। কিন্তু আমি যা দেখলাম অবিনকে তাতে আমার বিশ্বাস হয়েছে, নিজের মনটাকেই সে খাঁটি বলে মনে করে।

অবিন ভাবে, তার মতটাই সংসারে সত্যি, বাকি যা তা মিথ্যে। সে বোঝে না, তার সত্যিটা তাকেই মানায়, অন্যকে নয়।

এই যে আমায় চিঠি লিখেছে সেদিন তাতে তার দাবিটা বড় বেশী করে স্পষ্ট করে তুলেছে। সংসারে মেয়েপুরুষের সম্পর্কের যেটা সহজ দিক আমি সে-কথাটা তাকে মনে করিয়ে দিয়ে যেন মস্ত বড় দোষ করেছি এমন একটা ভাব তার। সে নাকি ওসব গ্রাহ্য করে না।

ও যে কী গ্রাহ্য করে আর না করে আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। ও যে কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না আমার এই বন্ধন বড় শক্ত, আমার ছত্রিশ বছরের জীবনের সঙ্গে এর কত রকমের গিঁট পরানো, কোথাও-কোথাও তা এমন করে জট পাকিয়ে গিয়েছে যে তাকে ছিঁড়তে চাইলেও ছেঁড়া যাবে না।

আমি তাকে বলি, তুমিই তো আমায় নতুন করে বাঁধতে চাইছ! কেন চাইছ? আমি যা ছিলাম তেমন করে আমায় থাকতে দাও।

অবিন বলে, ওই থাকাটা কোনো থাকা নয়, ও হল নিজেকে ভুলিয়ে রাখা।

আমি বলি, বেশ তাই হল। আমি নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চাই।

অবিন শুধু মাথা নাড়ে।

ওর এই মাথা নাড়া আমি আর বন্ধ করতে পারলাম না। পারলাম না বলেই আমার ভয়। যখন থেকে ওকে দেখেছি তখন থেকেই আমি বোধ হয় সেই ভয়ে মরেছি। মনে-মনে আমি বুঝেছি, মেয়েদের সমস্ত বুদ্ধি বিবেচনা এক-এক সময় হঠাৎ যেন হারিয়ে যায়, তখন তার খেয়াল থাকে না সে কোন্ হঠকারিতা করে ফেলবে। ওই মুহূর্তটি বড় সর্বনেশে, তখন যে কী হয়, কোন ভাঙন এসে অন্তর থেকে ধাক্কা মারে, মনে হয় যা আমার চারপাশে ছিল সব যেন ভেঙেচুরে ছিটকে গিয়েছে, তার মাঝখানে আমার সেই নারীত্ব দাঁড়িয়ে আছে যার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সেই মুহূর্তটা হল ভয়ংকর।

তেমন মুহূর্ত আমার আসে নি। কিন্তু আসতে পারে এই ভয়ে আমি মরেছি। অবিনকে আমি কতটা বাধা দিতে পারতাম তাই-বা কেমন করে বলব।

ভগবান আমায় বাঁচিয়েছেন। জ্যাঠামশাইরা ফিরে আসছেন। আবার আমি আমার মতন করে থাকতে পারব। কলকাতার সঙ্গে আমার যোগাযোগ কমে আসবে। সুহাসকে মাঝে মধ্যে চিঠি লিখে খোঁজখবর নেওয়া ছাড়া আমার কিছু করার থাকবে না। অবিন হয়ত আরও কিছুদিন জ্বালাবে। আমি তার চিঠির জবাব দেব না, চুপ করে থাকব। অবিন শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় থেমে যাবে। এছাড়া তার করার কিই বা আর আছে।

মনে-মনে আজ আমি অবিনকে বলি, তুমি আমায় ভুলোতে চেয়েছ এ-কথা আমি বলি না। তোমার সে দুর্মতি হয় নি। তেমন স্বভাবের মানুষ তুমি নও। আমার চোখ তাহলে চিনতে পারত। কিন্তু তোমার যাই থাক, আমার

যে উপায় নেই, সাধ্য নেই; যখন আমার বেলা ছিল তুমি তো আস নি। এই অসময়ে তুমি আমার কাছে কিছু চেয়ো না। আমি এখন এই বাড়ির তিন পুরুষের ইট-পাথর-মাটির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছি। আমি আর মানুষ নয়, নিতান্ত পাথর। এ আমার ভাগ্য। জন্মান্তরে যদি আমার চাওয়ার থাকে, তোমাকে চাইব। এ-জন্মে তুমি আমার পাওয়ার ধন নও।

ভোরবেলার প্রথম কাকটি ডেকে উঠল। ঠাণ্ডা সিরসিরে বাতাস আসছিল জানলা দিয়ে, গায়ে যেন সামান্য কাঁপুনি দিল। গাছের হালকা ডাল কেঁপে পাতার শব্দ হল সামান্য। পাখি ডাকছে দু-একটি করে। ভাবলাম এবার উঠি। কমলাকে ডাকি। কলঘরে গিয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে আসি। কমলা উঠে জ্যাঠামশাইদের ঘরের দরজা-জানলা খুলে দিক, সকালের আলো-বাতাস আসুক।

উঠি-উঠি করেও ওঠা হচ্ছিল না। ঘরের মধ্যে এখনও ঝাপসা অন্ধকার। জানলার গা দিয়ে জ্যোৎস্না কখন চলে গেছে বাইরে কোথায় যেন টিপটিপ করে মৃদু শব্দ হচ্ছে, কিসের শব্দ জানি না, ভোরের বাতাসে শুকনো পাতা বোধ হয় খসে যাচ্ছে। হাই উঠছিল।

গলার হারটা ঘাড়ের দিকে খোঁপার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। আস্তে করে জটটা ছাড়ালাম। জামার টিপ্‌কল আলগা, নিজের বুকে দু-দণ্ড হাত দিয়ে শুয়ে থাকলাম, বুকে হাত রাখলেই সেই ধকধক কাঁপুনিটা আমার হাতে লাগে। মার মতন আমারও কোনো বুকের অসুখ হবে কিনা কে জানে! হতে পারে।

বিছানায় উঠে বসে এলো আঁচলটা গায়ে জড়াচ্ছি, ভোরবেলার কাক পাখি ডাকতে লাগল। তাদের ওড়াউড়ির শব্দ আসতে লাগল জানলা দিয়ে। ভোর হয়ে এল। আয়নার কুকুরটা দেখি ঘুম ভেঙে হঠাৎ চেঁচাতে লাগল।

বিছানা ছেড়ে উঠলাম। কাপড়টা গুছিয়ে নিচ্ছি, টোপর তখনও চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে।

আধ-ফরসা আলোর মধ্যে ঘরের দরজা খুলে বাইরে আসতেই মনে হল, টোপর বারান্দা দিয়ে ছুটে বাগানে চলে গেল, তারপর সোজা ফটকের দিকে।

জ্যাঠামশাইরা কী এসে গেলেন?

ও কমলা, কমলা, শীঘ্রি ওঠো।

কার্তিক বাড়িতে নেই। ফটকে তালা। চাবি আমার কাছে তাড়াতাড়ি ঘরে এসে হাতড়ে চাবিটা মুঠোয় নিলাম।

বাইরে সবে অন্ধকার কেটে ফরসা হচ্ছে। আকাশে শুকতারা। তখনও পাতলা একটু অন্ধকার জড়ানো। গাছপালার মাথা কালচে হয়ে আছে। সকালের ঠাণ্ডা বাতাস আসছে জঙ্গলের দিক থেকে।

জ্যাঠামশাইরা ফিরলেন। আমার হাত-পা যেন কিসের আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল।

বাগান দিয়ে তরতর করে হেঁটে চললাম। ভোরবেলার বাতাস কী সুন্দর

গন্ধে ভরা, কদমগাছের মাথার ওপর শুকতারাটা চেয়ে আছে, এক জোড়া পাখি এইমাত্র শূন্যে ঝাঁপ দিল।

ফটকের কাছাকাছি আসা পর্যন্ত চোখে কিছু পড়ছিল না। কাছাকাছি আসতে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার পা পাথর হয়ে গেল। ফটকের সামনে অবিন।

জ্যাঠামশাই কোথায়? আয়না কই? শচিদা কোথায়?

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। পা নাড়াতে পারি না। হঠাৎ কেমন এক ভয় এসে আমার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপিয়ে দিল।

আয়নার কুকুরটা ফটকের সামনে লাফ-ঝাঁপ করছে, চেঁচাচ্ছে।

কেমন যেন ঘোরের মধ্যে ফটকের কাছে এসে অবিনকে দেখলাম। রাতজাগা চেহারা উস্কোখুস্কো চুল, হাত খালি।

"জ্যাঠামশাই কোথায়?" আমি উৎকণ্ঠায় মরে যাচ্ছিলাম।

"স্টেশনে।"

"ভাল আছেন?"

"ভাল।।"

"আয়না আসে নি?"

"স্টেশনে রয়েছে।"

ফটকের তালাটা খুলে দিলাম কখন। টোপর অবিনের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

খোলা ফটকের পাট সরিয়ে অবিন ভেতরে এল।

"শচিদা এসেছে?"

"এসেছে। আর একটু সকাল পর্যন্ত সব অপেক্ষা করছেন স্টেশনে।" অবিন আমার দিকে তাকাল, তার চোখ যেন হাসছে।

"শচিদা এখানে আসছে?"

"না, বাড়ি যাবেন। কার্তিক শচিবাবুকে পেঁছে দিয়ে আসবে।"

আমি দাঁড়িয়ে। আর আমার প্রশ্ন নেই। জ্যাঠামশাই ফিরে এসেছেন, আয়না এসেছে, শচিদা এসেছে।

কিন্তু অবিন? সে কেন এসেছে? কে তাকে এনেছে? আমি তো তাকে আসতে বলি নি।

অবিন তার বাঁ হাতের আঙুল মাথার চুলের ওপর বুলিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে তাকাল একবার, তারপর আমাদের বাড়িটার দিকে।

আমি তাড়াতাড়ি চোখ নীচু করে নিলাম। মনে হল এবার ও আমার দিকে তাকাবে।

আমি এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ফটকের কাছাকাছি, আমায় পাশ না কাটিয়ে অবিনের যাবার উপায় ছিল না।

সে দাঁড়িয়ে। আমি দাঁড়িয়ে। এ-বাড়িতে ঢোকার রাস্তা বন্ধ করে আমি

দাঁড়িয়ে। অবিন পা বাড়িয়েও দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

আজ এই ভোরের মুহূর্তে আমি আর অবিন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তার বাসী মুখ, একমাথা উস্কোখুস্কো চুল; আমার চোখে এখনও ঘুমের রেশ জড়িয়ে আছে, সারা রাতের শাড়ির গন্ধ আমার গায়ে। আকাশ একেবারে নির্মল। যেটুকু অন্ধকার জড়িয়ে ছিল তাও কখন সরে এল।

এমন মুহূর্ত আমার জীবনে আর আসে নি। এই এক পরম মুহূর্ত যেন ভগবান আমার জন্যে সাজিয়ে রেখেছিলেন। দেখতে চাইছিলেন, মোহিনী মরে, না বাঁচে! এ-আমার মরা-বাঁচার সন্ধিক্ষণ।

মনে হল অবিনকে আজ স্পষ্ট করে এই কথাটা বলি, তুমি এস না। তোমায় আমি আসতে বলি নি। তুমি ফিরে যাও। ফিরে যাও।

অবিন আমায় পাশ কাটিয়ে পা বাড়াচ্ছিল। হঠাৎ আমি বুঝি নড়ে উঠলাম। অবিন দাঁড়াল।

অবিনের মুখের দিকে তাকিয়ে আচমকা আমার কী যেন এক আক্রোশ জাগল। এমন আক্রোশ আমার আর কখনও হয় নি। এই মানুষটা আমার সর্বস্ব নিতে এসেছে। মোহিনীর যা-কিছু রাখা আছে ওর পায়ের ঠোক্করে সব যেন ছত্রাকার হয়ে যাবে। ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলি, তুমি যাও তুমি চলে যাও, আমি তোমায় ডাকি নি।

আমি কিছু বলার আগেই অবিন আমার পাশ কাটিয়ে পা বাড়াল। অস্পষ্ট করে আমি বাধা দিয়ে যেন কিছু বললাম। অবিন দাঁড়াল, মুখ ফেরাল। তারপর বলল, "এই সকালটুকুকে আমি তোমার হাতে জিম্মা করে দিলুম।"

অবিন দেখি বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে। আমার গলা বন্ধ হয়ে কান্না এল। বলতে গেলাম, যেয়ো না, যেয়ো না।

কাকে আমি বাধা দেব, কাকে বলব যেয়ো না। ও যে অবিন আমার সর্বনেশে পুরুষ। ওর শ্রাবণ আকাশের মেঘের মতন গায়ের রঙ, বিদ্যুতের মতন তীক্ষ্ম চেহারা, উ'চু মাথা সোজা করে হে'টে যাওয়া আমি শুধু দেখলুম। চোখ ভরে আমার জল নামল। বুকের যেখানে দুঃখের পাথর জমে ছিল, হঠাৎ দেখি তার কোথাও ফাটল ধরেছে। এ কি আমার মুক্তি? এ কি আমার আনন্দ? চোখের পাতা কাঁপছিল, পা কাঁপছিল, বুক কাঁপছিল।

অবিন বুঝি সি'ড়ি পর্যন্ত চলে গেল। চোখের জলে আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না।